কিশোর মহাভারত

মকবুলা মনজুর

সেবা প্রকাশনী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮৭
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
৩৩, নর্থব্রুক হল রোড,
ঢাকা ১১০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি পি ও বক্স নং ৮৫০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KISHORE MAHABHARAT
By : MAKBULA MANZOOR

কিশোর মহাভারত

মকবুলা মনজুর

সূচীপত্র

আদি পর্ব···	···	···	···	৯
সভা পর্ব···	···	···		৭০
বন পর্ব···	···	···	···	১০৩
বিরাট পর্ব···	···	···	···	১ ৪
উদযোগ পর্ব···	···	···	···	১৭
ভীষ্ম পর্ব···	···		···	২১২
দ্রোণ পর্ব···	···	···	···	২৪২
কর্ণ পর্ব···	···	···	···	২৭৫
শল্য পর্ব···	···	···	···	২৯২
সৌপ্তিক পর্ব···	···		···	৩০৮
স্ত্রী পর্ব···	···	···	···	৩১৭
শান্তি পর্ব···	···	···	···	৩২৪
অনুশাসন পর্ব···	···	···	···	৩২৮
অশ্বমেধিক পর্ব···	···	···	···	৩৩১
আশ্রম বাসিক পর্ব·····		···	···	৩৪৬
মৌষল পর্ব···	···	···	···	৩৬৩
মহাপ্রস্থানিক পর্ব···	···	···	···	৩৭২
স্বর্গারোহণ পর্ব···	···	···	···	৩৭৯

উৎসর্গ

আব্বা ও মা'র পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

মহাভারত রচনা করেছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। মহাভারত একটি ধর্মগ্রন্থ এবং পৌরাণিক কাহিনী হিসাবে বিখ্যাত হলেও এটি শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, একে একটি জাতির ইতিহাস বলে অভিহিত করা চলে। এই অসাধারণ গ্রন্থের রচয়িতা ব্যাসদেবকে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, বাল্মিকী প্রভৃতি চিরায়ত সাহিত্য রচয়িতাদের সমতুল্য বলে মর্যাদা দান করা হয়েছে।

অষ্টাদশ পর্বে গাঁথা মহাভারত একটি বিশাল গ্রন্থ। ব্যাস রচিত মহাভারতের অনুবাদের অতি সংক্ষিপ্তসার আমি কিশোরদের উপযোগী করে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। কিশোরেরা যদি এই 'কিশোর মহাভারত' ভালোবেসে গ্রহণ করে তাহলেই আমার চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

—লেখক

আদি পর্ব

হস্তিনাপুর কথা

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে হস্তিনাপুর নামে একটি নগর ছিলো। এখন আমরা যাকে দিল্লী বলি তারই কাছাকাছি ছিলো এই সমৃদ্ধ নগর।

হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্র বীর্যের দুই ছেলে। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। বড় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনের উত্তরাধিকার পেলেন না। কারণ তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। ফলে বিচিত্র বীর্যের মৃত্যুর পর ছোট ছেলে পাণ্ডুই হলেন হস্তিনাপুরের রাজা।

জন্মান্ধতার জন্য হতাশা তো আছেই, তার ওপর রাজা হতে না পারার দুঃখ, এই সব কারণে ধৃতরাষ্ট্র খুবই মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। তবু তাঁর মনের কোণে ক্ষীণ আশা ছিলো যেহেতু তিনি বিচিত্র বীর্যের বড় ছেলে সেজন্য তাঁরই বড় ছেলে একদিন হস্তিনাপুরের যুবরাজ হবে ও পাণ্ডুর মৃত্যুর পর হবে হস্তিনাপুরের রাজা।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সে আশাও পূর্ণ হলো না। তিনি সন্তান লাভ করার আগেই ছোট ভাই পাণ্ডুরাজ পুত্র সন্তান লাভ করলেন।

রাজা পাণ্ডুর হলো পর পর পাঁচ ছেলে। সবার বড় যুধিষ্ঠির, তারপর ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। রাজা পাণ্ডুর দুই রাণী। কুন্তী ও মাদ্রী। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন কুন্তীর ছেলে। মাদ্রীর যমজ ছেলে নকুল ও সহদেব। এই পাঁচ ভাই পরবর্তী যুগে পঞ্চপাণ্ডব অর্থাৎ পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে এই নামে জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন। পাঁচ ভাই-য়ের মধ্যে এমন ভাব ভালোবাসা ছিলো যে দেখে বোঝাই যেতো না এরা কেউ কারুর সৎ ভাই।

রাজা পাণ্ডু ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তাঁর ওপর তুষ্ট হয়ে পাঁচজন দেবতা তাঁকে পাঁচটি পুত্র দান করেছিলেন। স্বয়ং ধর্ম দিয়েছিলেন বড় ছেলে যুধিষ্ঠিরকে, পবনদেব দিয়েছিলেন ভীম সেনকে, দেবরাজ ইন্দ্র দিয়েছিলেন অর্জুনকে। আর অশ্বিনী কুমার নামে দুইজন দেবতা (তাঁরাও দুই ভাই) দান করেছিলেন নকুল ও সহদেবকে। এই পাঁচ রাজকুমার দেবতাদের আশিস মাথায় নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

ওদিকে ধৃতরাষ্ট্রের ছিলো একশোটি ছেলে এবং এক মেয়ে। ছেলে-দের মধ্যে সবার বড় দুর্যোধন, মেজ কুমারের নাম দুঃশাসন। মেয়েটির নাম হলো দুঃশলা।

দেবতাদের আশীর্বাদে পাওয়া পাণ্ডুরাজের পাঁচ ছেলে দিনে দিনে রূপে গুণে, শক্তি-সাহসে রাজ্যের সবার প্রিয় হয়ে উঠলেন। তবে দুর্ভাগ্য এই যে তাঁরা কিশোর বয়স না পেরোতেই তাঁদের পিতা পাণ্ডুরাজ আকস্মিক ভাবে মারা গেলেন।

পাণ্ডুরাজের ছোট রাণী মাদ্রী স্বামীর শোকে অধীর হয়ে বড়রাণী কুন্তীর হাতে তাঁর দুই ছেলে নকুল ও সহদেবকে সঁপে দিয়ে স্বামীর চিতার আগুণে প্রাণ দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে তাঁর আর এক ভাই বিদুর পাণ্ডু ও মাদ্রীর

পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করলেন।

এখানে বিদুর সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বিদুর ছিলেন রাজা বিচিত্র বীর্যেরই ছেলে। তবে বিদুরের মা শূদ্রা রমণী ছিলেন বলে তাঁর রাজা হবার যোগ্যতা ছিলো না। তবে সেজন্য বিদুরের মনে কোন দুঃখই ছিলো না। কারণ তিনি ছিলেন যেমন উদার তেমনি ধার্মিক।

পাণ্ডুরাজের মৃত্যুর পর পঞ্চপাণ্ডব হস্তিনাপুরের রাজবাড়ীতে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সাথে একই সাথে বেড়ে উঠতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে মেজ ভাই ভীম যেমন শক্তিশালী তেমনি চঞ্চল। প্রায়ই তিনি ছেলেমানুষী করে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের, বিশেষ করে বড় কুমার দুর্যোধনকে নানাভাবে নাকাল করতেন।

দুর্যোধন ও ভীম একই দিনে জন্মেছিলেন। তবে দুর্যোধন কখনই ভীমকে পছন্দ করতেন না। আসলে দুর্যোধনের স্বভাবটাই ছিলো কুটিল, নিষ্ঠুর আর হিংসুটে। যে লগ্নে দুর্যোধন ভূমিষ্ঠ হন তখন রাজ্যে নানারকম ভীতিজনক অলক্ষণ দেখা দিয়েছিলো। সেজন্য রাজ্যের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ও ধর্মমতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন শিশু দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে, তা নইলে ভবিষ্যতে এই শিশু কৌরব বংশের (কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশ) ধ্বংসের কারণ হবে। কিন্তু পুত্র স্নেহে দুর্বল ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের কথা শুনলেন না। তবে এজন্য তাঁকে একদিন চরম মূল্য দিতে হয়েছিলো।

পঞ্চপাণ্ডব যখন পিতৃহীন হন তখন যুধিষ্ঠিরের বয়স ছিলো ষোল, ভীমের পনেরো, অর্জুনের চোদ্দ এবং নকুল-সহদেবের তেরো।

এদের মধ্যে ভীমের ওপরই দুর্যোধনের ছিলো ভীষণ আক্রোশ। শারিরীক কসরৎ, দৌড়, কুস্তি ইত্যাদিতে ভীমের কাছে বারবার হেরে গিয়ে দুর্যোধন প্রতিশোধ নেবার জন্য এক ভয়ংকর ফন্দি আঁটলেন।

গঙ্গানদীর তীরে প্রমান কোটি নামে নির্জন জায়গায় দুর্যোধন 'উদক ক্রীড়ন' নাম দিয়ে খুব চমৎকার একটি বাগান বাড়ী তৈরী করে সেখানে সব রাজপুত্রদের নিয়ে আমোদ প্রমোদের আয়োজন করলেন।

আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সুখাদ্যেরও প্রচুর আয়োজন করা হয়েছিলো। ভীম এমনিতেই পেটুক মানুষ, তার ওপর এমন সব খাবার দাবার দেখে তিনি তো মহাউৎসাহে খাওয়ার প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিলেন। দুর্যোধনও দেখলেন এই-ই সুযোগ। তিনি কালকূট বিষ মেশানো মিষ্টি ভীমের মুখে তুলে তুলে খাওয়াতে লাগলেন। কালকূট এমন এক বিষ যা খাওয়ার সাথে সাথে কোন প্রতিক্রিয়া না হলেও, এতে মৃত্যু হবেই।

খাওয়াদাওয়ার পর রাজকুমারেরা অনেকক্ষণ নদীর বুকে জল ক্রীড়ায় মেতে রইলেন, তারপর বাগানবাড়ীতে বিশ্রাম করতে গেলেন।

এদিকে কালকূট বিষের প্রভাবে ভীম নদী তীরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন। তাঁর ভাইরা আমোদ প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেদিকে খেয়ালই করলেন না। দুর্যোধন এই সুযোগে ভীমকে লতা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দিলেন।

সংজ্ঞাহীন ভীম জলে তলিয়ে নাগলোকে উপস্থিত হলেন। ভীষণ ভীষণ সব বিষধর সাপেরা মানুষের সন্তান দেখে ভয়ংকর গর্জন করে তাকে ছোবল দিতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে ভীম যে কালকূট বিষ খেয়ে ছিলেন সাপের বিষে সেই বিষের প্রভাব কেটে গেলো। অর্থাৎ কিনা বিষে বিষক্ষয় ঘটে গেলো।

ভীমের নাগলোক দর্শন

চেতনা ফিরে পেয়ে ভীম তাঁর শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে বীর বিক্রমে সাপদের আক্রমণ করলেন। মানুষের ছেলের এই ভয়ংকর তেজ দেখে ভয় পেয়ে সাপেরা নাগরাজ বাসুকিকে গিয়ে খবর দিলো। বাসুকি এই শক্তিমান মানুষটিকে দেখতে এসে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। এ যে কুন্তীর ছেলে ভীম। তাঁর দৌহিত্রের দৌহিত্র অর্থাৎ নাতির নাতি।

বাসুকি পরম আদরে ভীমকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন এবং তাঁর অনুচর নাগদের নির্দেশ দিলেন ভীমকে রাজপুত্রের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিতে। নাগেরা তাঁর আদেশ পালন করলো এবং একজন নাগ প্রস্তাব করলো, 'মহারাজ, শুধু ধনরত্নই যথেষ্ট নয়, আপনার এই প্রিয় আত্মীয়কে রসায়ন (অমৃত) পান করিয়ে ধন্য করুন।'

বাসুকির নির্দেশে কয়েকজন সাপ ভীমকে সুগন্ধি জলে স্নান করিয়ে রসায়ন কুণ্ডের কাছে নিয়ে পূর্বদিকে মুখ করে বসালো। ভীম এক নিঃশ্বাসে এক একটি অমৃত কুণ্ডের রস পান করে আটটি কুণ্ড খালি করে ফেললেন। এরপর রাজশয্যায় শুয়ে পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে বিশ্রাম শেষে কৌরব (ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত) ও পাণ্ডব কুমারেরা ভীমকে না দেখে ভাবলেন ভীম হয়তো খামখেয়ালের বশে

একাই রাজপুরীতে ফিরে গিয়েছেন। তাঁরা তখন রথ, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদিতে চড়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

রাজপুরীতে ফিরে ভীমকে না দেখে তাঁর ভাইরা উদ্বিগ্ন হলেন। কুন্তী দেবী চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। বিদুর চারদিকে লোকজন পাঠিয়ে ভীমকে খোঁজার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সবাই হতাশ হয়ে ফিরে এলো, ভীমের কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। কুন্তী দেবী এই চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন যে, নিষ্ঠুর দুর্যোধন নিশ্চয়ই ভীমকে হত্যা করেছে। দুর্যোধন যে ভীমকে হিংসে করেন একথা কারুরই অজানা ছিলো না। কুন্তী দেবী বিদুরের কাছে তাঁর এই আশংকার কথা প্রকাশ করলে বিদুর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এমন হতেই পারে না। কারণ মহামুনি ব্যাসদেব বলেছেন, আপনার ছেলেরা দীর্ঘায়ু হবে এবং তারা পৃথিবীতে অনেক কল্যাণজনক কাজ করবে।'

নাগলোকে আট দিন পর ভীমের ঘুম ভাঙ্গলো। নাগেরা তাঁকে জানালো, রসায়ন পান করে ভীমের শরীরে এখন অযুত হাতীর সমান বল হয়েছে। তারা ভীমকে রাজকীয় বেশভূষায় সাজিয়ে, অনেক সুখাদ্য খাইয়ে গঙ্গাতীরে পৌঁছে দিলো।

অপূর্ব পোষাক ও অলংকারে সজ্জিত ভীমকে ফিরে পেয়ে তাঁর মা ও ভাইরা খুশীতে আত্মহারা হলেন, ভীমের মুখে সব কিছু শুনে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, 'এ বিষয় নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা কোর না, এখন থেকে আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

ভীমকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে দুর্যোধন আরও হিংস্র হয়ে উঠলেন। তাঁর ঈর্ষা ও ক্রোধে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন তাঁদেরই এক কুটিল স্বভাব মামা শকুনি।

রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র গৌতম গোত্রজ

কৃপাচার্য নামে একজন অস্ত্র গুরুকে নিযুক্ত করলেন। কৌরব ও পাণ্ডব কুমারেরা তাঁর কাছে অস্ত্র বিদ্যা সহ নানারকম সুশিক্ষা লাভ করতে লাগলেন।

দ্রোণাচার্যের আগমন

একদিন রাজকুমারেরা নগরের বাইরে এসে একটা লোহার গোলা নিয়ে খেলছিলেন। হঠাৎ করে তাঁদের গোলাটা একটা শুকনো কুঁয়োর মধ্যে পড়ে গেলো। কুমারেরা সবাই মিলে অনেক চেষ্টা করেও গোলাটা তুলতে পারলেন না।

কাছেই বসে একজন শীর্ণদেহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হোম (পূজা) করছিলেন। এঁর নাম হলো দ্রোণ বা দ্রোণাচার্য। দ্রোণ রাজকুমারদের কাছে এসে বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, 'তোমরা ক্ষত্রিয়ের সন্তান হয়েও এই সামান্য কাজটা পারলে না? ধিক তোমাদের ক্ষত্রবল আর অস্ত্র শিক্ষা! অথচ দেখো, ইচ্ছে করলে আমি তোমাদের ঐ গোলাটা তুলে দিতে পারি। এমন কি আমার হাতের এই আংটিটিকেও কুঁয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে আবার তুলে আনতে পারি। তবে তার বদলে আমাকে কিন্তু খাওয়াতে হবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মহাশয়, আপনি যদি এই কাজ পারেন তাহলে অবশ্যই প্রতিদিন রাজবাড়ী থেকে খাবার পাবেন।'

দ্রোণাচার্য সেই শুকনো কুঁয়োর ভেতর তাঁর হাতের আংটিটি ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর একটি ঈষিকা (কাশতৃণ)কুঁয়োর মধ্যে ফেলে

গোলাটিকে বিঁধলেন, তারপর আর একটি ঈষিকা বা কাশতৃণ দিয়ে প্রথম ঈষিকাটিকে বিঁধলেন। এই ভাবে পর পর ঈষিকা ফেলে গোলাটিকে আটকে টেনে তুলে ফেললেন।

রাজপুত্রেরা এই ব্যাপার দেখে ভীষণ অবাক হয়ে বললেন, 'বিপ্রর্ষি, এবার আপনার আংটিটিও তুলুন দেখি।'

দ্রোণ তাঁর ধনুক থেকে একটি শর কুঁয়োর মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন, তারপর শর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঠিক গোলাটির মত করে আংটিটিও তুলে আনলেন।

রাজকুমারেরা মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'তোমরা আমার রূপগুণ যেমন দেখলে তা তোমাদের পিতামহ ভীষ্মকে গিয়ে জানাও। তিনি ঠিক আমাকে চিনতে পারবেন।'

ভীষ্ম ও দ্রোণ কথা

কুমারদের মুখে বিবরণ শুনে ভীষ্ম বুঝলেন এই ব্রাহ্মণই হলেন দ্রোণাচার্য এবং তিনিই রাজপুত্রদের অস্ত্রগুরু হবার যোগ্য। তখন ভীষ্ম দ্রোণকে খুব সম্মানের সঙ্গে রাজপুরীতে নিয়ে এলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ তাত (জ্যোঠা) ভীষ্ম এবং মহা ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য এঁরা দু'জনেই ছিলেন মহৎ লোক। আর এঁদের দু'জনের জন্ম বৃত্তান্তও বেশ বিচিত্র। আমরা এখন সেই বিচিত্র অতীত কাহিনীতে ফিরে যাই।

দেবতাদের মধ্যে আটজনকে বলা হয়ে থাকে 'বসু'। এঁরা 'অষ্ট-বসু' নামে খ্যাত। একবার এই বসুরা তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে সুমেরু পর্বতের কাছে এক তপোবনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই বনে ছিলো ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রম। বশিষ্ঠের একটি কামধেনু ছিলো। কামধেনু হচ্ছে এমন এক গাভী যার দুধ কখনও শেষ হয় না এবং এই দুধ পান করলে মানুষ দশ হাজার বছর সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারে। বশিষ্ঠ তাঁর এই কামধেনুটির নাম দিয়েছিলেন নন্দিনী।

বসুদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো দ্যু। নন্দিনীকে দেখে দ্যুর স্ত্রীর খুব লোভ হলো। তিনি তাঁর এক মানবী সখীকে এর দুধ খাইয়ে দশ হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখবেন এই ইচ্ছায় স্বামীকে বললেন, 'চল আমরা কামধেনুটি নিয়ে পালিয়ে যাই।'

ঋষি বশিষ্ঠও তখন আশ্রমে ছিলেন না। ফলমূল সংগ্রহের জন্য বনে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে বসুরা নন্দিনীকে চুরি করে পালিয়ে গেলেন।

আশ্রমে ফিরে বশিষ্ঠ তাঁর প্রিয় কামধেনুকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হলেন। তবে তপোবলে চোর খুঁজে পেতেও তাঁর দেরী হলো না। তিনি ভয়ংকর রাগে বসুদের অভিশাপ দিলেন যে, 'দেবতা হয়েও তোমরা যখন মানুষের মত হীন লোভের কাজ করলে তখন তোমরা পৃথিবীতে মানুষ হয়েই জন্মাবে।'

ঋষি আরও বললেন, 'বসুদের মধ্যে যেহেতু দ্যুর অপরাধই সব-চেয়ে বেশী সেহেতু তাকে জন্মের পর থেকে আমৃত্যু মানুষের জীবনই কাটাতে হবে। আর অন্য বসুরা জন্মের পর দেবলোকে ফিরে ফিরে যাবেন।'

অষ্ট বসু মহা বিপদে পড়ে গঙ্গাদেবীর পায়ে লুটিয়ে মিনতি

জানিয়ে বললেন, 'মা গো, মানুষ হয়েই যদি জন্মাতে হয় তাহলে যেন তোমার কোলেই জন্মাতে পারি। আর এজন্য তোমাকেও নারী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে হবে। তোমার কাছে আমাদের এই ভিক্ষা যে, আমাদের জন্মের পরেই তুমি আমাদের নদীতে ফেলে দেবে।'

গঙ্গাদেবী তখন বসুদের কাছে জানতে চাইলেন তারা কোন পিতার সন্তান হিসাবে পৃথিবীতে আসতে চায়।

অষ্টবসু জানালেন, 'হস্তিনার রাজা প্রতীপের শান্তনু নামে এক পরম ধার্মিক ছেলে জন্মাবে আমরা তারই সন্তান হয়ে পৃথিবীতে জন্মাতে চাই।

গঙ্গাদেবী বললেন, 'তথাস্তু' (তাই হবে)।

রাজাপ্রতীপের ছেলে জন্মালে তার নামকরণ করা হলো শান্তনু। ছেলেবেলা থেকেই শান্তনু রূপে গুণে ধর্মে বিদ্যায় অসাধারণ হয়ে উঠতে লাগলেন।

একদিন রাজা প্রতীপ গঙ্গানদীর তীরে বসে চোখ মুদে ধর্ম চিন্তা করছিলেন। এমন সময় গঙ্গাদেবী এক পরমা সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে তাঁর কোলে এসে বসলেন। মেয়েটিকে দেখে রাজা প্রতীপের খুব মায়া হলো। তিনি বললেন, 'কে মা তুমি আমার কোলে এসে বসলে? তোমাকে পুত্রবধূ করতে পারলে আমি বড় সুখী হব।'

গঙ্গা উত্তর দিলেন, 'আমি দেব কন্যা। আপনার ছেলের সাথে আমি এই শর্তে বিয়েতে রাজী হতে পারি যে, আমার কোন কাজে কখনও তিনি বাধা দিতে পারবেন না।'

রাজপুরীতে ফিরে রাজা প্রতীপ শান্তনুর হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে তপস্যা করার জন্য বনে চলে গেলেন। যাবার আগে পুত্রকে বলে গেলেন, 'এক দেব কন্যার সাথে আমি তোমাকে বিয়ে দেব বলে কথা

দিয়েছি। যদি কখনও তার দেখা পাও তাকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কোর। তবে কখনও তার কোন কাজে বাধা দিও না।'

কিছু কাল পর একদিন রাজা শান্তনু গঙ্গা নদীর তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এমন সময় অপ্সরার মত এক অপূর্ব রূপসী মেয়ের রূপ ধরে গঙ্গা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। শান্তনু তাঁর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

গঙ্গা বললেন, 'রাজা আমি তোমার মহিষী (রাণী) হবো। তবে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমি ভালো মন্দ যাই করি তুমি তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারবে না এবং বাধা দিতে পারবে না। যদি প্রতিজ্ঞা ঠিক না রাখো তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো।

গঙ্গার রূপে মুগ্ধ রাজা তাঁর শর্তেই রাজী হয়ে গেলেন।

রূপসী ও গুণবতী রাণীকে নিয়ে রাজা শান্তনুর সুখেই দিন কাটছিলো। কিন্তু শীগগিরই তাঁর জীবনে দুঃখের ছায়া নেমে এলো। রাণীর পর পর সাতটি দেবশিশুর মত সুন্দর ছেলে জন্মালো। রাণী প্রত্যেকটি ছেলেকেই হাসিমুখে গঙ্গানদীর বুকে ফেলে দিয়ে বললেন, 'বৎস, এই তোমার প্রিয় কাজ করলাম।'

রাণীর এই নিষ্ঠুরতায় দুঃখ পেলেও প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করে রাজা শান্তনু তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না।

কিন্তু অষ্টম ছেলে জন্মাবার পর গঙ্গা হাসিমুখে ছেলেকে নিয়ে নদীর দিকে চলেছেন দেখে শান্তনু রাগে দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'রাণী তুমি এই ছেলেকে হত্যা করতে পারবে না।'

গঙ্গা বললেন, 'রাজা, তুমি কি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেছো?'

শান্তনু উত্তর দিলেন, 'ভুলিনি। কিন্তু কে তুমি? কেন এই মহা-

পাপ করছো ? দয়া করে আমার এই ছেলেকে বাঁচতে দাও।'

গঙ্গা বললেন, 'রাজা তুমি পুত্র চাও ? ঠিক আছে একে আমি হত্যা করবো না। কিন্তু তোমার কাছে থাকাও আমার শেষ হলো।'

এরপর গঙ্গা নিজের আসল পরিচয় দিয়ে অষ্টবসুর সব ঘটনা রাজাকে শোনালেন এবং বললেন, 'মহারাজ, ঋষির শাপগ্রস্ত বসুদের মধ্যে দ্যু হচ্ছেন এই শিশু, যিনি মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে বহুকাল বেঁচে রইবেন। তুমি একে খুব যত্ন করে পালন করো।'

এই বলে গঙ্গা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজা শান্তনু ছেলের নামকরণ করলেন দেবব্রত। গঙ্গার ছেলে বলে তাঁর আর এক নাম হলো গাঙ্গেয়।

দেবব্রত যখন বালক তখন শান্তনু একদিন রাজ সিংহাসন ছেড়ে বনে চলে গেলেন তপস্যা করতে। গঙ্গাতীরেই সেই বন। শান্তনু বেশ কয়েক বছর সেখানে তপস্যা করে কাটিয়ে দিলেন। ততদিনে দেবব্রতও বড় হয়ে উঠেছেন। রূপে গুণে তার সমান কেউ নেই। দেবব্রতের বাবা বনে তপস্যা করছেন দেখে গঙ্গাদেবী নিজেই ছেলেকে অসাধারণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন।

একদিন রাজা শান্তনু দেখলেন বনের একটি হরিণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। রাজা সেই হরিণের পেছনে পেছনে গঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, দেবদূতের মত সুন্দর এক কিশোর মৃগয়া করতে এসে তীর বর্ষণ করে চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। রাজাকে দেখেই সেই কিশোর লুকিয়ে পড়লো। ওদিকে রাজা কিন্তু দেখা মাত্রই নিজের ছেলেকে চিনতে পেরেছেন। তিনি গঙ্গানদীর কাছে হাতজোড় করে অনুনয় করে বললেন, 'দেবী, দয়া করে আমার ছেলেকে দেখাও।'

তখন গঙ্গাদেবী যুঁই ফুলের মত সাদা পোষাক ও নানারকম মনি-

মুক্তার অলংকারে সেজে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ের রূপে দেবব্রতের হাত ধরে রাজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে মধুর কণ্ঠে বললেন, 'রাজা, এই তোমার ছেলে দেবব্রত। এতদিন আমি নিজে একে পালন করে বড় করেছি। গাঙ্গেয় ঋষি বশিষ্ঠের কাছে বেদ পাঠ করেছে, দেবগুরু শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতি যত শাস্ত্র জানেন, মহামুনি জামদগ্ন যত রকমের অস্ত্রবিদ্যা জানেন দেবব্রত সমস্তই শিক্ষা করেছে। এই মহাবীর ছেলেকে নিয়ে তুমি এখন প্রাসাদে ফিরে যাও, একে রাজধর্ম শেখাও, যাতে সে আদর্শ রাজা হতে পারে।'

রাজা শান্তনু তখন দেবব্রতকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং তাঁকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করলেন।

কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন রাজা শান্তনু যমুনা নদীর তীরে এক বনে বেড়াতে গেছেন। তিনি হঠাৎ অপূর্ব এক সৌরভ অনুভব করলেন। যেদিক থেকে সেই সৌরভ ভেসে আসছে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন অপরূপ সুন্দর এক মেয়ে, যার সৌন্দর্য দেবকন্যাদেরও হার মানায়। তারই দেহ অপূর্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বন সুরভিত হয়ে উঠেছে।

রাজা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে কন্যা বললেন, 'তাঁর নাম সত্যবতী। তিনি এক জেলের মেয়ে।'

সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁর বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

কিন্তু সত্যবতীর বাবা বললেন, 'মহারাজ, আপনি আমার মেয়েকে পছন্দ করেছেন এ আমার মহা সৌভাগ্য। কিন্তু আমি এক শর্তে তাকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি, তা হচ্ছে এই যে, আমার মেয়ের যে ছেলে জন্মাবে আপনার মৃত্যুর পর সেই হবে হস্তিনাপুরের

রাজা।'

রাজা শান্তনু দেবব্রতকে প্রাণের চেয়েও ভালো বাসেন। কাজেই তিনি সত্যবতীর বাবার শর্তে রাজী না হয়ে দুঃখিত মনে রাজ্যে ফিরে এলেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি জেলের মেয়ে রূপবতী সত্যবতীকে ভুলতে পারেন না। দিনরাত্রি ঐ একই চিন্তায় তাঁর আহার নিদ্রা নষ্ট হলো, সর্বক্ষণ বিষণ্ণ থেকে তাঁর শরীরও ভেঙ্গে যেতে লাগলো।

বাবার বিষণ্ণ মুখ দেখে দেবব্রত চিন্তিত হলেন। কৌশলে তাঁর মনোকষ্টের কারণ জেনে নিয়ে দেবব্রত নিজেই একদিন যমুনা তীরের সেই জেলের বাড়ীতে যাত্রা করলেন, সঙ্গে নিলেন রাজ্যের কয়েকজন জ্ঞানী পণ্ডিত ও ক্ষত্রিয় বৃদ্ধকে।

পিতৃভক্ত ছেলে দেবব্রত সত্যবতীর বাবার কাছে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে বললেন, 'আপনার মেয়েকে স্ত্রী রূপে পেলে আমার বাবা সুখী হবেন, আমিও তাঁকে মা হিসেবে পেলে ধন্য হবো।'

চতুর জেলে দেবব্রতের কথা শুনে খুশী হয়ে বললেন, 'কুমার, আপনি যে মহামূল্যবান প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তা আমার মেয়ের জন্য পরম গৌরবের বিষয়। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এই যে, যেহেতু আপনিই হস্তিনাপুরের যুবরাজ সেহেতু আমার মেয়ের যে ছেলে হবে সে কখনই সিংহাসনে বসতে পারবে না। শুধু এই কারণেই আমি সত্যবতীকে আপনার পিতার সাথে বিয়ে দিতে পারবো না।'

গাঙ্গেয় দেবব্রত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আমি আমার দেশের ক্ষত্রিয় জ্ঞানীদের সামনে এই প্রতিজ্ঞা করছি যে কখনই আমি সিংহাসন দাবী করবো না। আপনার মেয়ের গর্ভজাত ছেলেই হবে হস্তিনাপুরের রাজা।'

জেলে তখন তাঁর আর এক আশংকার কথা তুলে বললেন, 'যুবরাজ, আপনি বয়সে তরুণ। শীগগিরই আপনারও বিয়ে হবে এবং আপনার পুত্র সন্তান হবে। আপনি যদি বা সিংহাসন ত্যাগও করেন, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের ছেলেদের সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিরোধ হবে। তখন স্বাভাবিক নিয়মে আপনার বড় ছেলেই হবে হস্তিনাপুরের রাজা।'

দেবব্রত তখন ক্ষত্রিয় জ্ঞানীদের সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আজ থেকে আমি ব্রহ্মচর্যব্রত (চিরকুমার থাকার ব্রত) গ্রহণ করলাম। অতএব আমার কখনও কোন পুত্র হবে না।'

দেবব্রতের এই প্রতিজ্ঞা বাণী উচ্চারিত হবার সাথে সাথে আকাশ থেকে দেবতারা ও তাঁর পূর্ব পুরুষেরা তাঁর ওপর পুষ্প বৃষ্টি করে বললেন, 'দেবব্রত, আজ থেকে তুমি "ভীষ্ম" নামে জগৎ বিখ্যাত হলে।'

'ভীষ্ম' শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি ভীষণ দুঃসাধ্য কর্ম করেন।

ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞার পর সত্যবতীর বাবা খুবই আনন্দের সাথে তাঁর মেয়েকে রাজার হাতে তুলে দিতে রাজী হলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তুমি পবিত্র ব্রহ্মচারী, আশীর্বাদ করি যতদিন তুমি বাঁচতে চাইবে ততদিন বেঁচে থাকো, মৃত্যু তোমার ইচ্ছার অধীন হোক।'

সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দু'টি ছেলে জন্মালো। তাদের নাম হলো চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। ছোট ছেলে বিচিত্র বীর্যের জন্মের অল্পদিন পরেই রাজা শান্তনু মারা গেলেন।

ভীষ্ম সত্যবতীর ইচ্ছায় চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসালেন। চিত্রাঙ্গদ মহাবীর ছিলেন, তবে বীরত্বের জন্য তাঁর অহংকারও ছিলো খুব বেশী। এই শক্তির অহংকারেই তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদকে যুদ্ধে

আহ্বান করে বললেন, 'তোমার আর আমার একই নাম এটা আমার পছন্দ নয়। হয় তুমি নাম বদলাও, না হয় আমার সাথে যুদ্ধ করে মরো।'

স্বরস্বতী নদীর তীরে গন্ধর্বরাজ ও কুরুনন্দন চিত্রাঙ্গদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ নিহত হলেন। ভীষ্ম তখন বালক বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তার অভিভাবক হিসাবে রাজ কার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

ক্রমে বিচিত্রবীর্যের বিয়ের বয়স হলো। ভীষ্ম সংবাদ পেলেন কাশীরাজের তিন পরমা সুন্দরী মেয়ে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ংবর হবে। ভীষ্ম স্থির করলেন তিন রূপসী কন্যাকে তিনি জয় করে এনে বিচিত্র বীর্যের সাথে বিবাহ দেবেন। সেই উদ্দেশ্যে মাতা সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে তিনি বারানসীতে যাত্রা করলেন। ভীষ্ম সম্পূর্ণ একাই রথ চালিয়ে বারানসীতে উপস্থিত হলেন। নানা দেশ থেকে রাজা ও রাজপুত্রেরা এসে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়েছেন। রাজকন্যারা বরমাল্য হাতে সভায় উপস্থিত হলে তাঁদের কাছে পাণি-প্রার্থী রাজপুরুষদের পরিচয় দেওয়া শুরু হলো। রাজকন্যারা যাঁকে' যিনি পছন্দ করবেন তাঁর গলায় তিনি বরমাল্য দেবেন। ভীষ্মকে বৃদ্ধ দেখে তাঁরা কেউ তাঁর কাছেই এলেন না। কোন কোন নীচু মনের রাজা আবার তাকে পাণিপ্রার্থী ভেবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগলেন। কেউ কেউ মন্তব্য করলেন বৃদ্ধ বয়সে ভীষ্ম বুঝি তাঁর মহাপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়েছেন।

উপহাস শুনে ভীষ্ম ভয়ংকর রেগে তিনটি কন্যাকেই বলপূর্বক রথে তুলে নিলেন এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'রাজগণ, ক্ষত্রিয়দের বিবাহের বহু রকমের নিয়ম আছে। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ম হচ্ছে বিপক্ষ-

দের পরাজিত করে কন্যাকে হরণ করা। আমি এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছি, ক্ষমতা থাকে তো তোমরা বাধা দাও।'

রাজারাও ক্রুদ্ধ হয়ে অস্ত্র হাতে সদলবলে ভীষ্মের ওপর আক্রমণ চালালেন। কিন্তু সর্বশাস্ত্র বিশারদ ভীষ্মের হাতে তাঁরা পরাজিত হলেন। মহাবীর শাল্বরাজ ভীষ্মের রথের পেছনে পেছনে বহু দূর ছুটে গেলেন। ভীষ্মের শরাঘাতে শাল্বরাজের রথের সারথি ও ঘোড়ার মৃত্যু হলো। শাল্বরাজ কোনমতে প্রাণ নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তিন রাজকন্যাকে আপন মেয়ের মত যত্ন সহকারে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন এবং বিচিত্রবীর্যের সাথে তাঁদের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন।

বিয়ের উদযোগের কথা জেনে কাশীরাজের বড় মেয়ে অম্বা ভীষ্মকে বললেন, 'আমি শাল্বরাজকে ভালোবাসি, স্বয়ংবরে তাঁকেই বরমাল্য দিতাম। ধর্মাত্মা, আপনি আমাকে নারীধর্ম পালনে সাহায্য করুন, আমি শাল্বরাজকেই মনে মনে স্বামী বলে বরণ করেছি, আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন।'

ভীষ্ম তখন অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং অন্য দুই মেয়ে অম্বিকা ও অম্বালিকার সাথে বিচিত্র বীর্যের বিয়ে দিলেন।

সেই অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। আর অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু। ভীষ্ম এঁদের দু'জনের জ্যেষ্ঠ তাত বলে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনদের হলেন সম্মানিত পিতামহ বা দাদু।

এবার বলা যাক দ্রোণের অতীত কাহিনী।

মহাবীর দ্রোণাচার্য ছিলেন ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। দ্রোণ, অর্থাৎ কলসীর মধ্যে অলৌকিকভাবে জন্ম হয়েছিলো বলে তাঁর নাম দ্রোণ।

ব্রাহ্মণ সন্তান দ্রোণ অনেক কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করে-

ছিলেন। আবার বীরশ্রেষ্ঠ পরশুরামের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখে তিনি তাঁর সমস্ত রকম অস্ত্রলাভ করেছিলেন। ফলে দ্রোণের অস্ত্র কৌশলের সামনে দাঁড়াবার মত যোগ্য আর কোন বীরই সে যুগে ছিলো না।

পঞ্চাল দেশের রাজা পৃষতের ছেলে দ্রুপদ ও দ্রোণ ছেলে বেলায় মহর্ষি অগ্নিবেশ্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। ঐ সময় দরিদ্র দ্রোণ ও রাজপুত্র দ্রুপদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব হয়। দ্রুপদ একদিন দ্রোণকে বলেছিলেন, 'আমি যখন পাঞ্চাল রাজ্যের সিংহাসনে বসবো তখন আমার রাজ্য তোমার হবে, তুমি ও আমার মত রাজ সুখে থাকবে।'

যৌবনে দ্রোণ বিয়ে করলেন এবং তাঁর একটি ছেলে হল। দ্রোণের ছেলে অশ্বত্থামার মধ্যে শৈশবেই বীরত্বের নানা লক্ষণ দেখা দিল। এক-দিন শিশু অশ্বত্থামা ধনীর ছেলেদের দুধ খেতে দেখে বাবার কাছে এসে দুধ খাবার জন্য কাঁদতে লাগলো। গরীব ব্রাহ্মণ দ্রোণ ছেলের কান্নায় দিশেহারা হয়ে সৎ উপায়ে একটি দুধেল গাভী সংগ্রহের চেষ্টা করে বিফল হলেন। ওদিকে ধনী বালকেরা দুধের নাম করে শিশু অশ্বত্থামাকে পিটুলি গোলা (জল দিয়ে গোলা চালের গুঁড়ো) খেতে দিলো। অবুঝ শিশু সেই পিটুলি গোলাকে দুধ ভেবে পান করে আনন্দে নাচতে লাগলো। ছেলেরা তখন দ্রোণকে ঠাট্টা করে বলল, 'ধিক্ ধিক্ দ্রোণ এতই অক্ষম যে তার ছেলেকে দুধ খাওয়াবার মত অর্থটুকুও উপার্জন করতে পারে না।' তাদের কথা শুনে ক্ষোভে দুঃখে দ্রোণ তাঁর বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। ছেলেবেলার বন্ধুত্ব ও দ্রুপদের সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে স্ত্রী অল্পকেশী ও ছেলে অশ্বত্থামাকে নিয়ে দ্রোণ দ্রুপদ রাজার রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

রাজসভায় সোনার সিংহাসনে বসে দ্রোণের মুখের 'সখা' সম্ভা-

ষণ শুনে রাজা দ্রুপদ যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি অমার্জিত ও ধিহীন তাই আমাকে বু'সখা' সম্ভাষণ করছো। তুমি জানো না, সখ্যতা হয় সমানে সমানে। কখনও রাজার সাথে কোন পথের ভিখারীর বন্ধুত্ব হয় না। তোমাকে আমি এক রাত্রির মত খাবার দান করছি, তাই নিয়ে বিদায় হও।'

এই অপমানের পর দ্রোণ অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করে কুরু দেশে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যে ভাবেই হোক ভীষ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্রুপদের ওপর প্রতিশোধের পথ খুঁজে বের করা। এবার তাঁর উদ্দেশ্য সফল হলো। রাজকুমারদের মুখে বর্ণনা শুনে ভীষ্ম তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

কর্ণের জন্মকাহিনী ও একলব্যের সাধনা

দ্রোণাচার্য ভীষ্মের কাছে তাঁর সমস্ত কাহিনী বলে নীরব হলেন। তারপর দুঃখ ভরা সুরে বললেন, 'এই অপমানের পর আমি দ্রুপদের ওপর প্রতিশোধ নেবো বলে এই কুরুদেশে এসেছি। ভীষ্ম, আপনি বলুন আপনাকে আমি কিভাবে খুশি করতে পারি?'

ভীষ্ম বললেন, 'আমি সবচেয় সুখী হবো যদি আপনি রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ছেলেরা আপনাকে গুরু হিসাবে পেলে ধন্য হবে। আপনিও কুরুদেশে আজীবনকাল থাকুন, এখন থেকে আপনি এ রাজ্যের সকলের গুরুদেব, কৌরবেরা সবাই আপনার অধীনে থাকবে।'

কিন্তু দ্রোণাচার্য ভীষ্মের এই অনুরোধে সহজে রাজী হতে পারলেন না। কারণ রাজকুমারদের অস্ত্রগুরু কৃপাচার্য এতে দুঃখ পাবেন, তিনি আবার দ্রোণেরও খুব নিকট আত্মীয়। ভীষ্মকে দ্রোণাচার্য একথা জানালেন।

ভীষ্ম বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত হোন। কৃপাচার্য ও থাকবেন। আমরা তাকে সম্মান ও ভরণপোষণ দিয়েই রাখবো। তবে আপনিই হবেন আজ থেকে আমার পৌত্রদের প্রধান আচার্য।'

ভীষ্ম দ্রোণের জন্য একটি সুন্দর বাড়ী তৈরী করে দিলেন এবং নাতিদের শিক্ষার সব দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

দ্রোণের সুনাম শুনে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের এবং আরও অনেক দেশের রাজপুত্রেরা দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন। সূতপুত্র কর্ণও তাঁর শিষ্য হলেন। তবে সমস্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনই তাঁর চোখের মনি হয়ে উঠলেন। দ্রোণ তাঁর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ যেন অর্জুনকে উজাড় করে দিলেন।

কর্ণকে সকলে সূতপুত্র অর্থাৎ অধিরথ নামে এক রথ চালক বা সারথির ছেলে বলে জানলেও আসলে সে হচ্ছে যুধিষ্ঠির অর্জুনদের মা কুন্তীরই ছেলে। তার জন্ম কাহিনীও খুব অদ্ভুত।

কুন্তী ছিলেন ভোজ দেশের রাজকন্যা। একদিন ঋষি দুর্বাসা ভোজরাজার প্রাসাদে অতিথি হলে কুন্তী খুব ভক্তি ভরে ঋষির সেবা করেছিলেন। বালিকা কুন্তীর সেবায় খুশি হয়ে দুর্বাসা কুন্তীকে একটি মন্ত্র দান করে বলেছিলেন, 'এই মন্ত্র পড়ে তুমি যে দেবতাকেই চাইবে তার আশিসে তোমার পুত্র লাভ হবে।'

একদিন কুমারী কুন্তী কৌতূহলের বশে মন্ত্র পড়ে সূর্যদেবকে ডাকলেন। চোখের পলকে সূর্যদেব এসে বললেন, 'কাজল নয়না, তুমি

কি চাও?'

কুন্তী ভয়ে লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলেন এবং মাথা নীচু করে সূর্য-কে দুর্বাসার বরের কথা বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

সূর্য বললেন, 'ভদ্রে, তোমার ইচ্ছা বৃথা হবে না। তুমি আমার আশিসে একটি পুত্র লাভ করবে এবং কুমারীই থাকবে।'

কুন্তীর অপূর্ব সুন্দর একটি ছেলে জন্মালো। এই ছেলে মায়ের গর্ভ থেকেই কবচ কুণ্ডল (বর্ম) পরে জন্মেছিলেন।

কুমারী মা কুন্তী কলংকের ভয়ে তাঁর কচি শিশুটিকে একটি পাত্রে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। সূতবংশীয় এক সারথি (রথ চালক) অধিরথ আর তাঁর স্ত্রী রাধা সেই অসহায় শিশুকে দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁরা এর নাম দিলেন বসুষেন এবং নিজের ছেলের মত আদরে যত্নে মানুষ করতে লাগলেন। বড় হবার পর ইনি কর্ণ নামে পরিচিত হলেন।

কর্ণ দ্রোণাচার্যের কাছে খুব যত্ন নিয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিখলেন। তা-ছাড়া এমনিতেও তিনি ছিলেন খুব শক্তিমান ও বীর। প্রতিদিন তিনি অনেকক্ষণ ধরে সূর্যদেবের পূজা করতেন।

সকলেই দ্রোণাচার্যের শিষ্য কিন্তু দ্রোণ অর্জুনকেই বেশী স্নেহ করেন বলে শিষ্যদের সবার মনেই কমবেশী দুঃখ ছিলো। তবে তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে দুর্যোধনও কর্ণ এ নিয়ে বেশী ক্ষোভ ও অভিমান প্রকাশ করতেন। এর মধ্যে একদিন একটি ঘটনা ঘটে গেলো।

দ্রোণের কাছে রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যা শেখা চলার সময় নিষাদ রাজা (ব্যাধদের রাজা) হিরণ্য ধনুর ছেলে একলব্য অনেক আশা নিয়ে দ্রোণের কাছে এসে তাঁর শিষ্য হবার ইচ্ছা জানালেন। কিন্তু একলব্য ব্যাধের ছেলে, নীচ জাতি। সেজন্য দ্রোণ তাঁকে শিষ্য

হিসেবে নিতে রাজী হলেন না।

একলব্যের মনে বড় দুঃখ হলো। তিনি জলভরা চোখে দ্রোণের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে বনে চলে গেলেন।

বনের ছেলে একলব্য মাটি দিয়ে দ্রোণের একটি মূর্তি তৈরী করে তাকেই অস্ত্রগুরু কল্পনা করে নিয়ে নিজের চেষ্টায় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন।

একদিন কুরুপাণ্ডব ভাইয়েরা সবাই বনে মৃগয়ায় গেছেন। তাঁদের সাথে রয়েছে মৃগয়ার নানা উপকরণ ও একটি কুকুর। কুকুরটি ঘুরতে ঘুরতে অরণ্যের ভেতর একলব্যের কাছে উপস্থিত হল এবং তার কালো মলিন দেহ, হরিণের চামড়ার পোষাক আর মাথায় জটাজুট দেখে বিকট চীৎকার জুড়ে দিলো। একলব্য বিরক্ত হয়ে একসাথে সাতটি বাণ ছুঁড়ে কুকুরের মুখ বন্ধ করে দিলেন। কুকুরটি বাণ মুখে নিয়ে রাজকুমারদের কাছে গেলে তাঁরা অবাক হলেন এবং কুকুরের সাহায্যে একলব্যকে খুঁজে বের করলেন।

দ্রোণাচার্যের মূর্তি এবং একলব্যের অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শীতা দেখে অর্জুনের ঈর্ষা হলো। তিনি দ্রোণকে একলব্যের কথা জানিয়ে বললেন, 'আচার্য, আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কোন শিষ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না। যে ভাবেই হোক না কেন, একলব্য আপনারই শিষ্য, সে কেন ধনুর্বিদ্যায় আমাকে ছাড়িয়ে গেলো?'

দ্রোণ অর্জুনকে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন। একলব্য তাঁকে প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ তাঁকে বললেন, 'বীর যুবক, তুমি সত্যিই যদি আমার শিষ্য হও তাহলে আমাকে গুরু দক্ষিণা দাও।'

একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, 'প্রভু আদেশ করুন আপনি কি চান? আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।' দ্রোণ বললেন, 'তোমার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি আমাকে দাও।'

এই দারুণ বাক্য শুনে একলব্য এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিনি হাসিমুখে নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি কেটে গুরুর চরণে অর্পণ করলেন।

তারপর সেই হতভাগ্য নিষাদযুবক অন্য হাত দিয়ে ধনুচালনা করতে গিয়ে দেখলেন তাঁর ধনু চালনার অসাধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

অর্জুন খুশী হয়ে গুরুকে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে এলেন। তার মনে যেন আনন্দ ধরছে না।

দ্রোণের শিক্ষার ফলে ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে, অশ্বত্থামা গুপ্ত অস্ত্রের প্রয়োগে, নকুল ও সহদেব তলোয়ার যুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথ চালনায় এবং অর্জুন বুদ্ধি বল এবং সব রকমের অস্ত্রযুদ্ধে ও অস্ত্রপ্রয়োগ ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন।

ঈর্ষ্যাকাতর দুর্যোধন ও তাঁর ভাইরা ভীম ও অর্জুনের শ্রেষ্ঠতা সহ্য করতে পারতেন না।

একদিন দ্রোণ একটি নকল ভাসপক্ষী (শকুন জাতীয় পাখি) তৈরী করে একটি গাছের চূড়ায় সেটি স্থাপন করলেন এবং রাজকুমারদের বললেন, 'তোমরা এই পাখির দিকে লক্ষ্যস্থির কর, যাকে বলবো সে তীর ছুঁড়ে ওর মস্তক ছিন্ন করে মাটিতে ফেলবে।'

রাজকুমারেরা প্রত্যেকে ধনুর্বান নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

দ্রোণ প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'তুমি গাছের পক্ষীটি ছাড়া আর কি কি দেখছো?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, তিনি পাখি, গাছ, তাঁর ভাইদের এবং আচার্যকে দেখতে পাচ্ছেন।

দ্রোণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সরে দাঁড়াও। লক্ষ্যভেদ করা তোমার কর্ম নয়।'

দ্রোণ অন্যান্য রাজকুমারদের ঐ একই প্রশ্ন করলেন। তাঁরাও যুধিষ্ঠিরের মত উত্তরই দিলেন। দ্রোণ তাঁদের সরিয়ে দিয়ে অর্জুনকে প্রশ্ন করলে অর্জুন উত্তর দিলেন, 'আমি কেবল ভাসপক্ষীর মস্তকটি দেখছি।'

আনন্দে উচ্ছ্বসিত দ্রোণ বললেন, 'বৎস, এইবার শর ত্যাগ কর।'

তৎক্ষণাৎ অর্জুনের তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে পক্ষীর ছিন্ন মস্তক মাটিতে পড়ে গেল। এরপর একদিন দ্রোণ শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গায় স্নান্ করতে নামলে একটা কুমীর তার উরু কামড়ে ধরলো। দ্রোণ চিৎকার করে শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা আমাকে রক্ষা কর।'

কুরুপাণ্ডব ভ্রাতারা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শুধুমাত্র ক্ষিপ্র বুদ্ধি অর্জুন চোখের নিমেষে পাঁচটি শর ছুঁড়ে কুমীরটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন।

দ্রোণ খুশি হয়ে অর্জুনকে ব্রহ্মশির নামে একটি অস্ত্র দান করে বললেন, 'এই অস্ত্র কখনও মানুষের প্রতি প্রয়োগ কোর না, যদি অন্য কোন রকম শত্রু তোমাকে আক্রমণ করে, তবেই প্রয়োগ করবে।'

অস্ত্র শিক্ষা প্রদর্শন

রাজকুমারদের অস্ত্র শিক্ষা শেষ হবার পর দ্রোণাচার্য একদিন ব্যাসদেব, কৃপাচার্য, ভীষ্ম এবং বিদুরের কাছে প্রস্তাব করলেন, 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যদি অনুমতি দেন তাহলে কুমারেরা তাদের নিজ নিজ অস্ত্রকৌশল দেখাবেন।'

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত হয়ে বললেন, 'আচার্য আপনি যে মহৎ কাজ শেষ করেছেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে চক্ষুষ্মান মানুষদের মত আমিও কুমারদের অপূর্ব কলাকৌশল দেখি।'

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে ও দ্রোণের নির্দেশ অনুযায়ী বিদুর এক সুবিশাল রঙ্গভূমি তৈরী করালেন এবং ঘোষণা করে রাজ্যের জনসাধারণকে রাজকুমারদের অস্ত্রকৌশল দেখার আমন্ত্রণ জানালেন। বিভিন্ন দেশের রাজা ও রাজপুরুষেরা এই উৎসবে আমন্ত্রিত হলেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিশানে, ঝালরে, পুষ্পমাল্য আর নহবৎ ধ্বনিতে রঙ্গভূমিতে উৎসবের রং লেগে গেলো। দেশ বিদেশ থেকে আগত দর্শকদের কোলাহলে ও বাদ্যধ্বনিতে হস্তিনাপুর মুখর হয়ে উঠলো। বিদুর দেবপূজা করে রাজ্য ও কুমারদের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মও কৃপাচার্যকে নিয়ে সুসজ্জিত আসনে বসলেন। রাজপুরীর রমণীদের সাথে নিয়ে কুন্তী দেবী ও গান্ধারী দেবী (দুর্যোধনদের মা) নির্ধারিত মঞ্চে এসে বসলেন। তাঁদের অপূর্ব বেশভূষা ও পুষ্পচন্দন ইত্যাদি প্রসাধনীর সুবাসে বাতাস আমোদিত হলো।

এরপর শুভ্র কেশ দ্রোণাচার্য পবিত্র শুক্লবসন এবং কণ্ঠে সাদা পুষ্পের সুগন্ধ মালা পরে তাঁর ছেলে অশ্বত্থামাকে সাথে নিয়ে রঙ্গ-ভূমিতে এলেন। তিনি অপূর্ব এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে কয়েকজন মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সাথে নিয়ে মঙ্গলাচরণ (পূজা) করলেন।

দ্রোণাচার্যের নির্দেশে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মচর্মে সজ্জিত কুরুপাণ্ডব রাজপুত্রেরা এক একটি তেজস্বী নক্ষত্রের মত দ্যুতি নিয়ে রঙ্গভূমিতে এলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে প্রথমে রেখে বয়স অনুসারে একে একে অস্ত্র প্রয়োগ দেখাতে শুরু করলেন। তাঁরা ছুটন্ত ঘোড়ায় বসে নিজ নিজ নাম লেখা বাণ দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন, রথ, হাতি ও অশ্বচালনা, বাহুযুদ্ধ ইত্যাদির নানা কৌশল দেখালেন। কুমারদের কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ জনতার কোলাহল যেন উত্তাল সাগরের গর্জনের মত ফেটে পড়-ছিল। সেই কোলাহল আরও উদ্দাম হয়ে উঠলো যখন দুই যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভীম ও দুর্যোধন গদা হাতে মত্ত হাতির মত ভয়ংকর গর্জন করে পরস্পরের মুখোমুখি হলেন।

কুমারেরা রঙ্গভূমিতে কি করছেন তার বিবরণ বিদুর অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এবং কুন্তী গান্ধারীকে জানাতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী অবশ্য অন্ধ নন। কিন্তু স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতার বশে তিনি নিজের চোখকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতেন এবং অন্ধের মতই জীবন-যাপন করতেন।

ভীম ও দুর্যোধনের উত্তেজক গদাযুদ্ধ দেখে দর্শকেরাও মহা উৎসাহে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলো এবং একদল ভীমকে অন্যদল দুর্যোধনকে সমর্থন জানিয়ে চীৎকার জুড়ে দিলো। গদা যুদ্ধ ক্রমে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে দেখে দ্রোণের আদেশে অশ্বত্থামা দুই ক্ষিপ্ত বীরকে থামিয়ে দিলেন।

এরপর দ্রোণাচার্য সমস্ত বাদ্যধ্বনি থামিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'যিনি আমার পুত্রের চেয়েও প্রিয়, সর্বশাস্ত্র বিশারদ, সেই অর্জুনের শিক্ষা আপনারা দেখুন।' দর্শকেরা অর্জুনকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। ধৃতরাষ্ট্র মন্তব্য করলেন, 'বিদুর, কুন্তীদেবীর তিন পুত্রের গৌরবে আমি ধন্যবোধ করছি।'

অর্জুন আগ্নেয়, বায়ব্য, বারুণ ইত্যাদি নানা ভয়ংকর অস্ত্রের প্রয়োগ দেখালেন। তাঁর ধনুর্বিদ্যা দেখে দর্শকেরা হতবাক হয়ে গেলো। সকলকে স্পষ্টই স্বীকার করতে হলো যে অস্ত্র বিদ্যায় অর্জুনের সাথে কোন রাজপুত্রেরই তুলনা হয় না।

অর্জুনের অস্ত্র কৌশল দেখানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় রঙ্গভূমির তোরণে কে যেন ভীষণ গর্জন করে উঠলেন। দ্বার রক্ষীরা দরজা ছেড়ে দিলে দুপুরের সূর্যের মত প্রখর তেজ নিয়ে কর্ণ এসে রঙ্গভূমিতে দাঁড়ালেন এবং কৃপাচার্য ও দ্রোণকে প্রণাম জানালেন।

অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে কর্ণ ভীষণ কণ্ঠে বললেন, 'পার্থ (অর্জুনের অন্য নাম), তুমি মনে কোরনা অস্ত্র কৌশলে তোমার জুড়ি কেউ নেই। যে সব কৌশল তুমি দেখিয়েছো তার সবই আমি এখন দেখাবো।'

দ্রোণের অনুমতি নিয়ে কর্ণ অর্জুনের দেখানো সমস্ত অস্ত্র কৌশল গুলোই দেখালেন। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

দুর্যোধন মহাখুশি হয়ে কর্ণকে বার বার আলিঙ্গন করে বললেন, 'মহাবাহু কর্ণ, আজ থেকে তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।'

কর্ণ উত্তর দিলেন, 'রাজকুমার আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই এবং অর্জুনের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে (মুখোমুখি যুদ্ধ) নামতে চাই।'

অর্জুন এতে নিজেকে অপমানিত মনে করে কঠোর স্বরে বললেন,

'কর্ণ' তুমি অতি নীচ তাই বিনা আমন্ত্রণে এখানে এসেছো এবং গায়ে পড়ে বড় বড় কথা শোনাচ্ছো।

কর্ণ উত্তর দিলেন, 'এটা রঙ্গভূমি, এখানে যে কেউ আসতে পারে। পার্থ, যদি সাহস থাকে তো অস্ত্র হাতে এগিয়ে এসো। আজ গুরুর সম্মুখেই আমি তোমার মস্তক ছিন্ন করবো।'

অর্জুন দ্রোণাচার্যের অনুমতি নিয়ে নিজের ভাইদের সঙ্গে করে বীরদর্পে কর্ণের সামনে দাঁড়ালেন। দুর্যোধন ও তাঁর ভাইয়েরা কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করলেন। দ্রোণ, কৃপাচার্য ও ভীষ্ম অর্জুনের পক্ষ নিলেন। রঙ্গভূমির পরিবেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো এবং সেখানে রণক্ষেত্রের আবহাওয়া সৃষ্টি হল। আপন ছেলে কর্ণকে চিনতে পেরে কুন্তী দেবী মূর্ছিত হলেন। দাসীরা চন্দন জল ছিটিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো। দুই ছেলেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে দেখে কুন্তী ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য কর্ণকে সম্বোধন করে বললেন, মহাবাহু কর্ণ. এই অর্জুন কুরু বংশ জাত, রাজা পাণ্ডু ও কুন্তী দেবীর পুত্র ইনি তোমার সংগে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করবেন। এখন তুমি তোমার পিতামাতার কুলের পরিচয় দাও। বল, তুমি কোন রাজ-বংশের মাথার মণি?

কৃপাচার্যের কথার উদ্ধত মস্তক, সূর্যের মত উজ্জ্বল কর্ণ যেন বর্ষার জলে ভেজাপদ্মের মত মাথা নত করলেন।

তখন দুর্যোধন বললেন, 'আচার্য, অর্জুন যদি রাজা ছাড়া আর কারুর সাথে যুদ্ধ না করেন তাহলে আমি এই মুহূর্তে কর্ণকে আমার অঙ্গরাজ্যের রাজা বলে ঘোষণা করছি।'

দুর্যোধন তক্ষুণি কর্ণকে স্বর্ণ আসনে বসিয়ে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুষ্পওস্বর্ণঘটের জল দিয়ে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করলেন।

এমন সময় কর্ণের পালক বাবা বুড়ো অধিরথ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ ধনুর্বাণ ত্যাগ করে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলেন। অধিরথ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

ভীম অট্টহাস্যে বলে উঠলেন, 'ওহে সূতপুত্র কর্ণ, তুমি তো অর্জুনের হাতে মরারও যোগ্য নও। যাও, যাও রথের রাশ আর ঘোড়ার চাবুক হাতে নিয়ে নিজের কুলধর্ম পালন কর। কুকুর যেমন যজ্ঞের প্রসাদ খেতে পারে না তুমিও তেমনি শূদ্র বংশজাত হয়ে অঙ্গরাজ্যের রাজা হতে পারবে না।'

দুর্যোধন বললেন, 'ভীম, মহাবাহু কর্ণকে এরকম কথা বলা তোমার অন্যায়। কবচকুণ্ডলধারী সর্ব সুলক্ষণ কর্ণ কখনই নীচ বংশজাত হতে পারেন না। কেবল অঙ্গরাজ্য নয়, সমস্ত পৃথিবীর রাজা হবার যোগ্যতাও এঁর আছে।'

এমন সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় সকলে রঙ্গভূমি ত্যাগ করলেন। দুর্যোধন কর্ণের হাত ধরে যাবার আগে পাণ্ডবদের বলে গেলেন, 'ইচ্ছা থাকলে তোমরা আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।'

কর্ণ অঙ্গরাজ্যের রাজপদ পেলেন বলে আনন্দে কুন্তীর বুক ভরে গেলো। আর যুধিষ্ঠিরের এই বিশ্বাস হলো যে কর্ণের মত ধনুর্ধর এই পৃথিবীতে নেই।

দ্রুপদের পরাজয়ে দ্রোণের গুরুদক্ষিণা

একদিন দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়েছে, এখন আমার গুরুদক্ষিণা চাই। তোমরা যুদ্ধ করে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে নিয়ে এসো, তাই হবে আমার জন্য মূল্যবান গুরুদক্ষিণা।'

রাজকুমারেরা দ্রোণের কথায় আনন্দে সম্মত হলেন এবং সসৈন্যে পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করলেন।

দ্রুপদ রাজা ও তাঁর ভাইরা রথে চড়ে যুদ্ধ করতে এলেন। যুদ্ধ চলাকালে দুর্যোধনেরও তাঁর ভাইদের অতিদর্প আর আস্ফালন দেখে অর্জুন দ্রোণকে বললেন, 'ওরা যতই গর্জন করুক, যুদ্ধে দ্রুপদকে পরাজিত করতে পারবে না। ঠিক আছে, আগে ওরা ওদের বীরত্ব দেখিয়ে নিক তারপর আমরা পাণ্ডবেরা যুদ্ধে নামব। কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর দ্রুপদ রাজের বাণ বর্ষণে দুর্যোধন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাঞ্চাল সৈন্যেরা কৌরব সৈন্যদের সহজেই দুর্দশায় ফেলে দিলো। কৌরবদের আর্ত চীৎকার শুনে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইরা দুর্যোধনদের হাত থেকে যুদ্ধের ভার তুলে নিয়ে ভীষণ বিক্রমে দ্রুপদ রাজ ও তাঁর সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অর্জুনের সাথে দ্রুপদ ও তাঁর ভাই সত্যজিতের ভীষণ যুদ্ধ হলো। অর্জুনের শরাঘাতে সত্যজিতের ঘোড়া, রথ ও রথের সারথি নষ্ট হলো। সত্যজিৎ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন। অর্জুন দ্রুপদের ধনু ও রথের নিশান ছিঁড়ে ফেলে খড়গ হাতে

লাফিয়ে রথে উঠলেন। পাঞ্চাল সৈন্যরা পাণ্ডবসৈন্যদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগলো। অর্জুন দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে দ্রোণের সম্মুখে এনে বললেন, 'প্রভু এই আমাদের গুরুদক্ষিণা।'

দ্রোণ দ্রুপদকে বললেন, 'আমি তোমার রাজ্য অধিকার করেছি, তোমার জীবনও এখন আমার হাতে। এখন বাল্যবন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে বল তুমি কি চাও?'

রাজা দ্রুপদ নিরুত্তর রইলেন। দ্রোণ হাসিমুখে বললেন, 'বীর, ভয় নেই। মনে রেখো, ব্রাহ্মণেরা ক্ষমাশীল। তাছাড়া তুমি আমার শৈশবের সখা, সেজন্যও তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে। একদিন তুমিই বলেছিলে একমাত্র একজন রাজাই পারে অপর এক রাজার সখা হতে। তোমাকে আমি অর্ধেক পাঞ্চাল রাজ্য দান করলাম, এখন ইচ্ছা করলে আমাকে সখা বলে মনে করতে পারো।'

দ্রুপদ দ্রোণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'আমি চিরকাল আপনার বন্ধু হয়ে থাকতে চাই।'

দ্রোণ খুশি হয়ে দ্রুপদকে অর্ধেক রাজ্য উপহার এবং মুক্তি দিলেন।

এক বছর পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ধৈর্য, করুণা, মমতা ইত্যাদি গুণের জন্য সবার কাছে প্রিয় হলেন এবং সারা দেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। এদিকে তাঁর বীর ভাই অর্জুন ও অন্যেরা বহু দেশ জয় করে নিজেদের রাজ্য বিস্তার করতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষা

পাণ্ডবদের সুনাম দিন দিন বাড়ছে জেনে ধৃতরাষ্ট্রের মনে ঈর্ষার বিষ জমতে শুরু করলো। তিনি নিজে অন্ধ বলে রাজা হতে পারেননি, আবার তাঁর ছেলেরাও কেউ সিংহাসন পাবেন না। তার ওপর সারা দেশের মানুষ কেবল পঞ্চপাণ্ডবের প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ। এইসব কারণে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটলো ও শরীর অসুস্থ হলো।

অবশেষে একদিন ধৃতরাষ্ট্র তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী কনিককে ডেকে বললেন, 'আপনি অভিজ্ঞলোক, আমি পাণ্ডবদের এত সুনাম ও গৌরব সহ্য করতে পারছি না। আপনিই বলুন আমি কি করবো?'

কনিক ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন, 'মহারাজ, আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ। আপনি যা করবেন তা খুবই শীতল মস্তিস্কে এবং ধৈর্যের সাথে করা চাই। এজন্য পাণ্ডবদের সাথে আপনার বাইরের ব্যবহার হবে মধুর কিন্তু অন্তরে তীক্ষ্ণ ছুরিতে শান দেওয়া চলতে থাকবে।'

পাণ্ডবদের ধ্বংস করার জন্য কুটিল দুর্যোধন তাঁর মামা শকুনির সঙ্গে মতলব আঁটতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব বুঝতে পেরে দুর্যোধন তাঁর কাছে দিনরাত পাণ্ডবদের নিন্দা করতে লাগলেন। একদিন সুযোগ বুঝে বললেন, 'পিতা, আপনি কুরুবংশের গৌরব, আমাদের পিতামহ ভীষ্মও একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তবু দেশের লোক আপনাদের দু'জনকে

বাদ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকেই বেশী সম্মান করে। আপনি অন্ধ বলে রাজা হতে পারেননি, পাণ্ডুই রাজা হয়েছিলেন। এরপর পাণ্ডুর ছেলেরাই যদি বংশ বংশ ধরে রাজ্য পায় তাহলে একদিন পৃথিবী থেকে কৌরব বংশের নাম মুছে যাবে, টিঁকে থাকবে পাণ্ডবদেরই নাম। পিতা, আপনি কৌশল করে পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসন দিন।'

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন, 'বৎস শোন, যুধিষ্ঠিরকে প্রজারা সকলেই ভালোবাসে। ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপাচার্য আর বিদুরও তাঁকে চান। আমি যদি পঞ্চপাণ্ডবের কোন ক্ষতি করতে চাই তাহলে প্রজারা বিদ্রোহ করবে, রাজ্যের প্রধানেরাও আমাকে সমর্থন করবেন না। এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি?'

দুর্যোধন বললেন, 'আমি অর্থ ও ধনরত্ন দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ও প্রধানদের বশ করেছি। রাজকোষও আমাদের হাতে। আর যেহেতু অশ্বত্থামা আমাদের পক্ষে সেহেতু দ্রোণাচার্য ও তাঁর ছেলেকেই সমর্থন করবেন। কৃপাচার্য অশ্বত্থামার মামা, কাজেই তিনিও আমাদের পক্ষই নেবেন। তবে আমাদের কাকা বিদুর আবার পাণ্ডবদের বেশী স্নেহ করেন। মুখে তিনি আমাদের যতই আদর দেখান না কেন, মনে মনে তিনি পাণ্ডবদেরই চান। কিন্তু তাঁর একার সাধ্য কতটুকু। আপনি দেরী না করে পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই ও তাদের মা কুন্তীকে বারণাবতে পাঠিয়ে দিন।'

দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের কথামত কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রধান অমাত্য পাণ্ডবদের কাছে বারণাবতের খুব প্রশংসা করে বললেন, 'বারণাবতে পশুপতি উৎসব উপলক্ষে অনেক লোক জমেছে। সেখানে দারুণ জমজমাট উৎসব চলছে।'

ধৃতরাষ্ট্রও পাণ্ডবদের খুব আদরের সাথে বললেন, 'তোমরা তোমা-

দের মাকে নিয়ে কয়েক দিন বারণাবতে কাটিয়ে এসো। বারণাবতের পশুপতি উৎসবে এখন অনেক গায়ক এবং ব্রাহ্মণ এসেছেন। কুন্তী দেবী তাঁদের ধন দান করে সুখী হবেন, তোমরাও অনেক আমোদ প্রমোদ করতে পারবে।'

বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। নিজেদের অসহায় অবস্থা চিন্তা করে তাঁর কথাতেই রাজী হলেন। শুভক্ষণ দেখে পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের মাকে নিয়ে বারণাবতের পথে যাত্রা করলেন।

দুর্যোধন খুব খুশি হয়ে পুরোচন নামে একজন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, তোমার চেয়ে বিশ্বাসী আমার আর কেউ নেই। তুমি আজই একটি দ্রুতগামী রথ নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের আগেই বারণাবতে চলে যাও। সেখানে শন, জতু (গালা), ধুনা ইত্যাদি দিয়ে একটি চক মিলানো প্রাসাদ তৈরী করবে। প্রাসাদ তৈরীর মাটির সাথে প্রচুর ঘি, তেল চর্বি ইত্যাদি মিশিয়ে দেওয়ালে লেপে দেবে। তাছাড়া বাড়ীটির প্রতিটি ঘরে এমন ভাবে শুকনো কাঠ, তেল ইত্যাদি লুকিয়ে রাখবে যাতে পাণ্ডবেরা বুঝতে না পারে। তারপর পাণ্ডবদের তুমি সম্মান ও আদর করে ঐ 'জতুগৃহে' বাস করবার ব্যবস্থা করে দেবে। কিছুদিন পর একদিন গভীর রাত্রে তারা সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে দেবে যাতে পঞ্চপাণ্ডব ও তাদের মা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

পুরোচন তখনই একটি দ্রুতগামী রথ নিয়ে বারণাবতের দিকে ছুটলেন। ওদিকে জ্ঞানী বিদুর দুর্যোধনের সমস্ত কুমতলব আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। বিদুর আর যুধিষ্ঠির দু'জনেই ম্লেচ্ছ ভাষা জানতেন। পাণ্ডবেরা রওনা হবার সময় যাতে কেউ বুঝতে না পারে সেজন্য সকলের অবোধ্য ভাষায় বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, 'শত্রুর

কুমতলব যে জানে সে নিশ্চয়ই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পথও বের করতে পারে। বৎস, মনে রেখো, অস্ত্র কেবল লোহা থেকেই তৈরী হয় না। লোহা ছাড়াও অন্য অস্ত্রে প্রাণনাশ হতে পারে। আগুনে যখন বন পুড়ে যায় তখন সমস্ত প্রাণী পুড়ে মরলেও যেসব প্রাণী গর্তে থাকে তারা ঠিকই রক্ষা পায়। যে ব্যক্তি নক্ষত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয় করতে পারে সে শুধু নিজেকেই নয় অন্যদের ও বাঁচাতে পারে।'

যুধিষ্ঠির বিদুরকে প্রণাম করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি আপনার উপদেশ বুঝতে পেরেছি।'

পাণ্ডবেরা বারণাবতে পৌঁছুবার অনেক আগেই মন্ত্রী পুরোচন সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনি তাঁদের মহাসম্মানে একটি প্রাসাদে নিয়ে থাকা খাওয়ার রাজসিক ব্যবস্থা করে দিলেন। পাণ্ডবেরা বেশ কয়েকদিন বারণাবতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট লোকজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তায় কাটিয়ে দিলেন।

দিন দশেক পর পুরোচন এসে যুধিষ্ঠির ও কুন্তী দেবীর কাছে খুব বিনয়ের সাথে জানালেন, তাঁদের সম্মানার্থে 'শিব' নামে একটি নতুন প্রাসাদ তৈরী করা হয়েছে। আজ থেকে তাঁরা সেখানেই বাস করবেন।

জতুগৃহ দাহ

নতুন প্রাসাদে গিয়ে যুধিষ্ঠির চর্বি, ঘি এবং গালার গন্ধ পেলেন। তিনি ভীমকে বললেন, 'বাড়ীটির নাম "শিব" হলেও, এটি আসলে "অশিব।" নিপুণ শিল্পীরা নানা রকম সহজ দাহ্য পদার্থ (যা সহজে

আগুনে পোড়ে) দিয়ে এই বাড়ী তৈরী করেছে। আমি জানি কুটিল দুর্যোধনের আদেশে পাপী পুরোচন আমাদের পুড়িয়ে মারবার জন্য এই বাড়িতে এনেছে।'

ভীম একথা শুনে গোপনে পালিয়ে যাবার কথা বললেন।

যুধিষ্ঠির তাতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'পুরোচন হঠাৎ করে কিছু করবেন বলে আমার মনে হয় না। তাছাড়া আমি বুঝতে পারছি দুর্যোধনের চরেরা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা পালাতে চেষ্টা করছি জানলে পুরোচন যে ভাবে হোক আমাদের পালাবার পথে গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করবে। তার চেয়ে আমরা বরং মৃগয়া করার ছলে এই দেশের নগর বন সব জায়গায় ঘুরে পথঘাট চিনে রাখবো। আর চুপিচুপি জতুগৃহের মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে রাত্রিবেলা সেই গর্তের ভেতর থাকবো।'

এই সময়ে একজন লোক গোপনে পাণ্ডবদের বললো, 'আমি মাটি খোঁড়ার কাজে পটু। মহাত্মা বিদুর আমাকে আপনাদের সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে পেরেছেন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে পুরোচন এই বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেবে। আমাকে বলুন এই বাড়ীর কোথায় কি ভাবে গর্ত করে আমি আপনাদের উপকার করতে পারি?'

যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ঐ লোক জতুগৃহের মেঝে খুঁড়ে মস্ত একটি সুড়ঙ্গ তৈরী করলো। সুড়ঙ্গটি এমন যার ভেতর দিয়ে জতুগৃহের পেছন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এছাড়া লোকটি খুব কায়দা করে এমন একটি দরজা তৈরী করলো যা বন্ধ করলে ঘরের মেঝের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়।

পুরোচন পাণ্ডবদের দিকে নজর রাখার উদ্দেশ্যে রোজ রাতে জতু-

গৃহের প্রধান দরজার কাছে এসে থাকতেন। আর পাণ্ডবেরা দিনের বেলা মৃগয়ার ছলে সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন এবং রাত্রিবেলা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খুব সাবধানে সুড়ঙ্গের ভেতর বাস করতেন।

এইভাবে এক বছর কেটে গেলো। যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের বললেন, 'এবার আমাদের পালিয়ে যাবার সময় এসেছে। পুরোচন এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। এবার খুব শীগগিরই এক রাত্রিতে সে জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে দেবে। আমি ঠিক করেছি কৌশলে আমরা অন্য কোন ছয়জন লোক ও পুরোচনকে এই বাড়ীতে আগুনে পুড়িয়ে মেরে পালিয়ে যাবো। ঐ ছয়জনের দেহের পোড়া অংশ দেখে সবাই বিশ্বাস করবে যে আমরাই পুড়ে মরেছি। তাতে করে দুর্যোধনেরা আর আমাদের খুঁজবে না, হত্যার চেষ্টাও করবে না।'

এরই মধ্যে একদিন কুন্তীদেবী তাঁর ব্রত উদযাপন উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন, অনেক গরীব লোকজনেরাও ভোজ খেতে এলো। এক নিষাদ স্ত্রীলোক তার পাঁচটি ছেলেকে নিয়ে ভোজ খেতে এসেছিলো। তারা প্রচুর খাবার ও মদ খেয়ে সেই রাতে জতুগৃহের মধ্যেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে রইলো। যুধিষ্ঠির দেখলেন, এই সুযোগ। মাঝরাতে বারণাবতের সমস্ত মানুষ যখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে ভীম তখন পুরোচনের শোবার ঘর সহ জতুগৃহের সব ক'টি দরজায় আগুন লাগিয়ে দিলেন। তারপর পাঁচ ভাই তাদের মাকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে দ্রুত পালিয়ে গেলেন।

প্রবল বাতাসে জতুগৃহের চারদিক দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আগুনের উত্তাপ ও ঘর পোড়ার শব্দে নগরবাসীরা জেগে উঠলো। তারা জতুগৃহে আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে পাণ্ডবদের জন্য হাহাকার

করে রাত কাটালো।

সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বেরিয়ে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী খুব দ্রুত পায়ে গঙ্গা নদীর দিকে ছুটতে লাগলেন। কুন্তীর ছুটতে কষ্ট হচ্ছে দেখে মহাবীর ভীম তাঁর মাকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটতে লাগলেন।

গঙ্গার তীরে বিদুরের একজন বিশ্বাসী অনুচর একটি বিশেষ ধরনের নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। নৌকাটিতে 'বায়ুবেগ যন্ত্র' লাগানো ছিলো যার জন্য এর গতিবেগ ছিলো বাতাসের মত, আর এতে একটি সুন্দর পতাকা শোভা পাচ্ছিল। পাণ্ডবেরা নৌকাতে চড়তেই অনুচরটি তাঁদের নিমেষের মধ্যে নদীর ওপারে পৌঁছে দিয়ে প্রণাম করে বিদায় নিলো।

নৌকা থেকে নেমে যুধিষ্ঠির নক্ষত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয় করে সকলকে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

দীর্ঘ দুর্গম পথ পার হয়ে তাঁরা পরদিন সন্ধ্যায় এক ঘোর বনে এসে পৌঁছুলেন। বনটি হিংস্র জন্তু আর নানা রকম বিপদে ভরা। পথ চলার ক্লান্তিতে ও ভীষণ পিপাসায় সবাই কাতর হয়ে সেই বনেই লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু ভীমের কোন ক্লান্তি নেই। তিনি সরোবর খুঁজে বের করে পদ্মপাতায় করে ও নিজের গায়ের চাদর ভিজিয়ে জল এনে সবার তৃষ্ণা মেটালেন। সকলে ক্লান্ত শরীরে ঐ ভীষণ বনেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন। কিন্তু ভীম সেনের চোখে ঘুম নেই। তিনি অতন্দ্র প্রহরীর মত সবাইকে পাহারা দিয়ে জেগে রইলেন।

রাত কেটে গেলো। ভোরবেলায় বারণাবতের লোকজনেরা নিবু নিবু আগুনের মধ্যে দেখলো মন্ত্রী পুরোচন ও আরও ছয়জনের আগুনে পোড়া দেহের অংশ। তাদের এমন দশা হয়েছে যে দেখে চেনা যায়

না। হস্তিনাপুরে এই খবর গেলে রাজ্যে কান্নার রোল পড়ে গেলো। ধৃতরাষ্ট্র অনেক বিলাপ করলেন এবং পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীর জন্য রাজসিক আয়োজনে পারলৌকিক কাজ করালেন।

সকলে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো বিদুর কোন শোক করছেন না। বরং তাঁকে খুব গম্ভীর ও চিন্তিত মনে হচ্ছে।

হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচ কথা

কুন্তী ও পাণ্ডবেরা যেখানে ঘুমিয়ে ছিলেন তার কাছে শাল গাছের ওপর হিড়িম্ব নামে বিকট এক রাক্ষস বাস করতো। তার সাথে তার বোন হিড়িম্বাও থাকতো। পাণ্ডবদের দেখে মানুষের মাংস খাবার জন্য হিড়িম্বের জিভ থেকে লালা ঝরতে লাগলো। সে বোনকে ডেকে আদেশ করলো, 'যাও এখুনি ঐ মোটাসোটা মানুষ গুলোকে মেরে নিয়ে এসো। বহুদিন পর আজ আমরা আমাদের প্রিয় খাবার মানুষের মাংস খাবো। তারপর ভাইবোন মিলে মহা আনন্দে নাচবো।

মানুষের নরম মাংস হিড়িম্বারও খুব প্রিয় খাবার। সে মহা খুশিতে গাছের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে পাণ্ডবদের কাছাকাছি এসে দেখলো সবাই ঘুমিয়ে, শুধু একজন বিশাল দেহ রূপবান পুরুষ জেগে রয়েছেন। বলা বাহুল্য তিনি ভীমসেন।

ভীমকে দেখামাত্র হিড়িম্বা এমন মুগ্ধ হয়ে গেলো যে তক্ষুণি সে এক পরমা সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে ভীমের সামনে এসে দাঁড়ালো। বনের মধ্যে হঠাৎ করে এমন এক রূপসী মেয়ে দেখে ভীম তো

অবাক। তিনি পরিচয় জানতে চাইলে হিড়িম্বা লাজুক হেসে মিষ্টি করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, 'রূপবান বীর, আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হন তাহলে আমি আপনাদের সবাইকে আমার ভাই রাক্ষস হিড়িম্বের হাত থেকে রক্ষা করবো। আমার আকাশে ওড়ার ক্ষমতা আছে। আপনারা যেখানে যেতে চান আমি সবাইকে সেখানেই উড়িয়ে নিয়ে যাবো।'

ভীম হিড়িম্বার ওসব কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'আমি রাক্ষস কিংবা যক্ষ কাউকে ভয় করি না। তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দাও এখুনি তাকে যমের বাড়ী দেখিয়ে দেবো।'

বোনের দেরী দেখে হিড়িম্ব নিজেই পাণ্ডবদের দিকে ছুটে এলো। ভীম তাঁর মা এবং ভাইদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে রাক্ষসকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার সাথে বাহুযুদ্ধ শুরু করলেন।

রাক্ষসের বিকট চীৎকারে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। কুন্তী দেবী দেখলেন তাঁর সামনে অপ্সরার মত সুন্দরী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে, মেয়েটির পরনে মহামূল্যবান কাপড় আর অলংকার, যেন কোন রাজকন্যা। তিনি পরিচয় জানতে চাইলে হিড়িম্বা নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, তার মনে ভীমের জন্য অনুরাগ জন্মেছে, সে কুন্তী দেবীর ছেলের বউ হতে চায়।

ওদিকে ভীম তো হিড়িম্বের সাথে যুদ্ধের নামে যেন খেলা জুড়েছেন। তাই দেখে অর্জুন ভীমকে ডেকে বললেন, 'সূর্য ওঠার আর দেরী নেই, সূর্যের কিরণে রাক্ষসদের শক্তি ভীষণ হয়ে ওঠে, রাক্ষসকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলুন। তাছাড়া আমাদের যাত্রারও সময় হয়ে গেছে।'

ভীম তখন হিড়িম্বকে দু'হাতে শূন্যে তুলে বন বন করে ঘুরিয়ে

মাটিতে আছড়ে মেরে ফেললেন। তারপর হিড়িম্বার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার এই রাক্ষসীকেও ওর ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিই।'

যুধিষ্ঠির তাঁকে নিষেধ করলেন, 'ভীম, তুমি নারী হত্যা করো না।'

হিড়িম্বা কুন্তীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর ছেলের বউ হবার জন্য কাতর মিনতি করে বললো, 'মা আমি আপনার ছেলেকে দেখা মাত্র মনে মনে তাঁকে স্বামী বলে বরণ করেছি। ওঁকে না পেলে এখুনি আমি মরে যাবো।'

হিড়িম্বার অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির ভাইকে বললেন, 'ভীম তুমি একে বিয়ে কর। আর হিড়িম্বা শোন, তুমি একমাত্র দিনের বেলাতে ভীমের সাথে থাকতে পারবে, সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে সে আমাদের কাছে চলে আসবে।'

ভীম হিড়িম্বাকে বললেন, 'এই যে রাক্ষসের মেয়ে, তোমাকে আমি এক শর্তে বিয়ে করতে পারি, তা হচ্ছে, তোমার একটি ছেলে জন্মাবার পর আর আমি তোমার সাথে থাকবো না।'

হিড়িম্বা সেই শর্তেই রাজী হয়ে ভীমকে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে গেলো।

পাণ্ডবেরা চার ভাই মাকে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। তাঁদের নগর লোকালয় থেকে অনেক দূরে কোন অচেনা জায়গায় যেতে হবে যেখানে দুর্যোধন তাঁদের নাগাল পাবেন না, পরিচিত কেউ থাকবে না।

কিছুদিন পর হিড়িম্বার একটি ছেলে হলো। রাক্ষসদের অদ্ভুত নিয়মে ছেলেটি জন্মাবার সাথে সাথেই বলবান এক যুবক হয়ে উঠলো এবং সব রকমের অস্ত্র চালনাতেও দক্ষ হলো। হিড়িম্বা তার ছেলের

নাম দিলো ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ কুন্তী ও পাণ্ডবদের সাথে দেখা করে প্রণাম জানিয়ে বললো, 'আদেশ করুন আমার কি কর্তব্য?'

কুন্তী বললেন, 'বাছা, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের প্রথম ছেলে, আমাদের পরম আদরের ধন। আমাদের প্রয়োজন হলে অবশ্যই তুমি সাহায্য করবে।'

ঘটোৎকচ সেই আদেশ মাথায় নিয়ে বিদায় হলো।

ভীমের বকরাক্ষস বধ

পাণ্ডবেরা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে মৎস, ত্রিগর্ত, পঞ্চাল ও কীচক দেশের ভেতর দিয়ে চললেন। পথে তাঁদের পিতামহ মহামুণি ব্যাসদেবের সাথে দেখা হলো। ব্যাস তাঁদের সবরকমের মঙ্গল ও শুভদিনের আশ্বাস দিয়ে একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

এখানে ব্যাসদেব সম্বন্ধে একটু বলা প্রয়োজন মনে করছি। তা হচ্ছে, যদিও পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিচিত্র বীর্যেরই ছেলে। তবে তাঁরা ব্যাসদেবের প্রসাদে পৃথিবীতে জন্মেছিলেন বলে ব্যাসদেবই পাণ্ডব ও কৌরবদের আসল পিতামহ।

যাই হোক, ব্যাসদেবের আদেশে গরীব ব্রাহ্মণ খুব আনন্দের সাথে পাণ্ডবদের আশ্রয় দিলেন এবং তাঁদের থাকবার জন্য একটি ঘর ছেড়ে দিলেন। পাণ্ডবেরা প্রত্যেকদিন ভিক্ষা করে যা আনতেন কুন্তী সেই খাবার দুই ভাগ করে অর্ধেক ভীমকে দিতেন, বাকী অর্ধেক চার

ছেলেকে নিয়ে নিজে খেতেন। ভীমের শরীরটা যেমন বিশাল, তার খিদে আর খাবারের চাহিদাও ছিলো তেমনি বেশী।

অনেকদিন এই ভাবে কেটে গেলো। একদিন কুন্তী ও ভীম ঘরে আছেন, অন্য চার ভাই ভিক্ষা করতে গেছেন। এমন সময় ব্রাহ্মণের ঘর থেকে কান্নাকাটি ও বিলাপের সুর ভেসে এলো। নিশ্চয়ই তাদের কোন বিপদ হয়েছে ভেবে কুন্তী সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলেন, ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা কাঁদছে। ছোট শিশুগুলো ভয়ে যেন কাঁদতেও পারছে না। শুধু থর থর করে কাঁপছে।

কুন্তী তাঁদের দুঃখের কারণ জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ বললেন, 'এই নগরের কাছে বক নামে এক ভয়ংকর শক্তিশালী রাক্ষস বাস করে, এ রাজ্যের সেই প্রভু। আমাদের রাজা দুর্বল, নির্বোধ ও রাজ্য রক্ষায় অক্ষম। বক রাক্ষসই এদেশকে রক্ষা করে। তবে তার মূল্য স্বরূপ প্রতিদিন একটি করে পরিবার থেকে একজন মানুষকে প্রচুর ভাত ও দুইটি মহিষ নিয়ে বক রাক্ষসের কাছে যেতে হয়। বক সেই ভাত, মহিষ এবং মানুটিকে খায়। আজ আমার পালা। আমি প্রাণে ধরে ছেলে-মেয়ে বা স্ত্রী কাউকে পাঠাতে পারব না বলে নিজেই রাক্ষসের কাছে যেতে চাই কিন্তু এরা আমাকে ছাড়তে চায় না। এর চেয়ে আমরা সবাই রাক্ষসের কাছে যাই, রাক্ষস আমাদের খেয়ে ফেলুক।'

কুন্তী বললেন, 'আপনি দুঃখ করবেন না। আমার পাঁচ ছেলের একজন রাক্ষসকে আজ খাবার পৌঁছে দেবে।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'তা হয় না মা। আপনারা আমার ঘরে আশ্রিত অতিথি। আমি জেনে শুনে আপনার সন্ন্যাসী ছেলেদের মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।

কুন্তী বললেন, আমার ছেলেরা সন্ন্যাসী হলেও তারা মন্ত্র সিদ্ধ

মহাবীর। আমার মেজ-ছেলে অনায়াসে রাক্ষসকে খাবার দিয়ে ফিরে আসবেন। তবে একথা আপনি কাউকে বলবেন না। তাতে আমাদের বিপদ হতে পারে।

ব্রাহ্মণ খুশী মনে কুন্তীর কথায় রাজী হলেন। ভীম বকরাক্ষসের কাছে চললেন। সংগে তার প্রচুর ভাত। রাক্ষসের বাড়ীর কাছে গিয়ে ভীম চীৎকার করে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন।

রাক্ষস ভীষণ বেগে ছুটে এসে দেখলো ভীম তার জন্য আনা ভাত গুলো খাচ্ছেন আর হাসছেন। সামান্য মানুষের ছেলের এত সাহস! বকরাক্ষস মস্ত এক বটগাছ উপড়ে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলো। ভীম তখন বাঁ হাতে সেই গাছ চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে খাওয়া শেষ করে তারপর বককে আক্রমণ করলেন। বক যতবড় শক্তিমান রাক্ষসই হোক ভীমের দেহে অযুত হাতীর বল। তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই বককে হত্যা করে তার মৃতদেহ নগরের প্রধান দরজায় ফেলে রেখে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ফিরে এলেন।

এক চক্রানগরের লোকেরা তাদের সাক্ষাৎ যম বকরাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অজানা অচেনা সেই বীর যিনি বককে হত্যা করেছেন তাঁকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলো।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর

কিছুদিন পর ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অন্য ব্রাহ্মণ বেড়াতে এলেন। তিনি পাণ্ডবদের কাছে নানা গল্প উপাখ্যান আর নানা দেশের নানা অভি-

জ্ঞতার কথা বললেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি এ কথাও বললেন, খুব অল্প-দিনের মধ্যে পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হবে। এই কুমারী দ্রৌপদী ও তার ভাই ধৃষ্ট দ্যুম্নকে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যজ্ঞের আগুন ও বেদী থেকে অলৌকিক ভাবে পেয়েছেন। দ্রৌপদীর মত সুন্দরী গুণবতী বুদ্ধিমতী মেয়ে সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর বিশাল দু'টো কালো চোখ, রেশমের মত কোমল লম্বা কোঁক-ড়ানো চুল, সুঠাম দেহের গঠন আর গায়ের শ্যামল রং সব মিলে সে যেন একটি সদ্য ফোটা নীলপদ্ম। তার দেহের পদ্মফুলের মত সৌরভ এক ক্রোশ দূর থেকেও পাওয়া যায়। দ্রুপদ রাজার এই মেয়েকে দ্রোপদী বলে সবাই চিনলেও শ্যামল রংয়ের জন্য তাঁর আসল নাম কৃষ্ণা। এ ছাড়াও পাঞ্চাল দেশের রাজকুমারী বলে তাঁকে বলা হতো পাঞ্চালী, যজ্ঞের আগুন থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন বলে তাঁর আর এক নাম যাজ্ঞসেনী।

দ্রৌপদীর বিষয়ে এইসব কথা শুনে পাণ্ডবেরা মনে মনে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা দেখার জন্য আগ্রহী হলেন। কুন্তী দেবীও যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আমাদের অনেকদিন কেটে গেল, এ-দিকের যত সুন্দর জায়গা আছে সবই আমাদের দেখা হয়ে গেছে। যদি তোমাদের ইচ্ছে হয় তবে চল পাঞ্চাল দেশে যাই।' পাণ্ডবেরা মায়ের কথাতেই রাজী হলেন।

পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল নগরে যাত্রা করার আগে মহামুণি ব্যাস আবার তাঁদের সাথে দেখা করতে এলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'তোমরা যে পাঞ্চাল নগরে যাচ্ছো এর পেছনে কিন্তু তোমার নিয়তির অদৃশ্য লীলা রয়েছে। তবে এতে তোমাদের কোন রকম অকল্যাণ হবে না।' কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মুখে এই কথা শুনে পাণ্ডবেরা একটু

চিন্তিত হলেও খুশী মনেই পাঞ্চাল নগরে যাত্রা করলেন। পথে অর্জুনের সাথে এক গন্ধর্বের (যে সব দেবতারা স্বর্গে গান-বাজনা করেন) সাথে তুমুল যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে গন্ধর্ব হেরে গিয়ে অর্জুনের সাথে বন্ধুত্ব করলেন এবং তাঁকে 'চাক্ষুষী' বিদ্যা দান করলেন। এই বিদ্যার সাহায্যে অর্জুন ত্রিলোকের অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত পাতাল সব জায়গার সমস্ত জিনিষ ইচ্ছামত দেখার ক্ষমতা পেলেন।

মাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা সন্ন্যাসীর বেশে পথ চলেছেন। পথে বহু ব্রাহ্মণের সাথে তাঁদের আলাপ পরিচয় হলো। তাঁরাও পাঞ্চালে যাচ্ছেন ভোজের নিমন্ত্রণ খাবেন, অনেক দান দক্ষিণা পাবেন এই আশায়।

দ্রুপদের রাজ্য দক্ষিণ পাঞ্চালে এসে পাণ্ডবেরা ভার্গব নামে এক কুম্ভকারের (কুমার) অতিথি হলেন। ভার্গবের মাটির কুটিরে থেকে তাঁরা ব্রাহ্মণ ভিখারীর মত ভিক্ষা করে জীবন চালাতে লাগলেন।

ওদিকে রাজা দ্রুপদ অনেকদিন থেকেই তাঁর গুণবতী মেয়ে কৃষ্ণাকে তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুনের হাতে তুলে দেবেন বলে আশা করেছিলেন। যদিও একবার তিনি যুদ্ধে অর্জুনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন তবু অর্জুনের অপূর্ব রূপ, তেজস্বীতা, সুনাম ইত্যাদির জন্য তাঁর মনে হয়েছিলো একমাত্র অর্জুনই হতে পারেন কৃষ্ণার উপযুক্ত স্বামী। বোধহয় সেই কারণেই রাজা দ্রুপদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিলো যে ভাবেই হোক পাণ্ডবেরা বেঁচে আছেন, আর তাঁর মেয়ের স্বয়ংবর সভায় অর্জুন আসবেনই।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে শর্ত ছিলো এই যে, একটি অসাধারণ ধনুকে ছিলা পরিয়ে কঠিন এক লক্ষ্য ভেদ করতে হবে। দ্রুপদ মনে মনে

জানতেন অর্জুন ছাড়া অন্য কোন রাজা বা রাজপুত্রই এ কাজ পারবেন না!

স্বয়ংবরে অংশ নেবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সবাই উপস্থিত হলেন। এ ছাড়াও ভোজরাজ, বিরাটরাজ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ, মদরাজশল্য, মথুরার রাজা নরনারায়ণ রূপী শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভাই বলরাম, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রভৃতি বহু রাজা ও রাজপুত্র এলেন। দ্রুপদরাজ তাঁদের সবার জন্য আহার ও বাসস্থানের রাজসিক ব্যবস্থা করলেন।

স্বয়ংবর সভার দীর্ঘদিন আগে থেকেই নগরে নৃত্যগীত ও দান ধ্যানের ধূম লেগে গেছে। নিপুণ শিল্পী ও স্থপতিরা মিলে বিশাল এক সভাগৃহ তৈরী করলেন। সভা কক্ষটিকে বহু সুন্দর সুন্দর জিনিষ, রংবেরংয়ের চাঁদোয়া ঝালর নিশান ইত্যাদিতে সাজানো হলো।

স্বয়ংম্বরের দিনে কৃষ্ণার পাণি প্রার্থীরা সবাই খুব জমকালো পোষাক আর অলংকার পরে, ফুলের মালা আর সুগন্ধিতে সেজে সভায় যার যার জন্য নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। সদ্যস্নাতা দ্রৌপদীকে ফুল চন্দন আর মণিমানিক্যের গহনায় সাজানো হলো, সোনার তারা খচিত রেশমী শাড়ী পরে, পিঠে মেঘের মত ঘন কালো চুল ছড়িয়ে রত্নমালা হাতে দ্রৌপদী ধীরে ধীরে এসে এসে সভায় দাঁড়ালেন। তাঁর কচিদূর্বার মত শ্যামল লাবণ্যের ছটায় সভার লক্ষ লক্ষ দর্শক মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

রাজা দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন বোন কৃষ্ণাকে সভার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'উপস্থিত রাজ পুরুষেরা শুনুন, এই ধনু, এই বাণ আর ঐ লক্ষ্য, এবং লক্ষ্যর সম্মুখে ঐ যন্ত্র। এই ধনুতে ছিলা পরিয়ে ঐ যন্ত্রের ছিদ্রটি পাঁচটি বাণ চালিয়ে লক্ষ্যভেদ

করতে হবে। যে শক্তিমান গুণবান রাজা অথবা রাজপুত্র ঐ কঠিন লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন পাঞ্চাল রাজকন্যা কৃষ্ণা তাঁরই গলায় বরমাল্য দেবেন।

তরুণ ও শক্তিমান রাজারা প্রত্যেকেই ভাবছেন কৃষ্ণা তাঁরই গলায় মালা দেবে। তাঁরা মুগ্ধ চোখে অপরূপা কৃষ্ণাকে দেখছেন। পঞ্চপাণ্ডবেরা কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজাদের সভায় বসেন নি। তাঁরাতো রয়েছেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে, এজন্য তাঁরা বসেছেন অতিথি ব্রাহ্মণদের সাথে। তাঁদের কেউ চিনতেও পারেন নি। শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁর ভাই বলরাম যাঁরা পাণ্ডবদের মামাতো ভাই তাঁরাই ওঁদের চিনতে পেরেছেন। কৃষ্ণ ও বলরাম অবশ্য বরমাল্যের আশায় আসেন নি, এসেছেন দ্রুপদ রাজার বিশেষ অতিথি হিসেবে। কৃষ্ণ আবার শুধু পাণ্ডবদের মামাতো ভাই-ই নয় তিনি অর্জুনের প্রিয় সখা। এই সভাতে অর্জুনদের দেখতে পেয়ে তাঁর খুব আনন্দ হলো। তিনি লক্ষ্য করলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রইলেও পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই মুগ্ধ চোখে দ্রৌপদীর দিকে চেয়ে রয়েছেন।

এরপর একে একে রাজারা লক্ষ্যভেদ করতে এলেন কিন্তু লক্ষ্যভেদ করা দূরে থাক তাঁরা ধনুতে গুনই পরাতে পারলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ এগিয়ে এসে ধনুতে গুন পরিয়ে লক্ষ্যভেদের জন্য তৈরী হলেন। পাণ্ডবেরা এবং অন্য সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কর্ণের লক্ষ্যভেদের জন্য অপেক্ষা করছেন, হঠাৎ কৃষ্ণা চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমি কোন নীচ বংশের সন্তান সূতপুত্রকে স্বামী হিসাবে বরণ করবো না।' কৃষ্ণার এই কথা শুনে কর্ণ সূর্যের দিকে একবার তীব্র চোখে তাকালেন তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ধনু মাটিতে ফেলে দিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একে একে চেদিরাজ শিশুপাল, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা, মদ্রদেশের রাজা শল্য এবং আরও অনেক ক্ষত্রিয় বীর এলেন। কিন্তু কেউই ধনুতে গুন পরাতে পারলেন না।

এবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছাই চাপা আগুনের মত রূপবান ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে অর্জুন উঠে এলেন। এক তরুণ সন্ন্যাসীর এই স্পর্ধা দেখে অনেকে হেসে উঠলেন, কেউ কেউ অবাক হলেন।

অর্জুন ধনুর সামনে গিয়ে মহাদেবকে প্রণাম জানালেন, কৃষ্ণকে স্মরণ করে ধনু তুলে নিলেন। তারপর অনায়াসে ধনুতে গুন পরিয়ে ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে পর পর পাঁচটি শর নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভেদ করলেন। ব্রাহ্মণেরা আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। আকাশ থেকে অর্জুনের মাথায় পুষ্প বৃষ্টি হলো। সভায় বাজনা, কলরব ও আনন্দের জোয়ার বয়ে গেলো।

ব্যর্থ রাজারা রাগে হতাশায় সভা ছেড়ে চলে গেলেন। রাজা দ্রুপদ আনন্দিত হয়ে অর্জুনের কাছে এলেন। কৃষ্ণা দেবরাজ ইন্দ্রের মত রূপবান অর্জুনের দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইলেন, তারপর মৃদু হেসে তাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিলেন। অর্জুন কৃষ্ণার হাত ধরে সভা থেকে বের হয়ে এলেন।

ওদিকে রাজারা এক সন্ন্যাসীর এতবড় সাহস ও সৌভাগ্য মেনে নেবেন না বলে সবাই মিলে অর্জুনকে আক্রমণ করতে এলেন। অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করবেন বলে ব্রাহ্মণেরা ছুটে এলেন। অর্জুন তাঁদের থামিয়ে দিয়ে রাজাদের মুখোমুখি হয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর ভাইরাও তাঁর পক্ষে এগিয়ে এলেন। অর্জুনের আশ্চর্য ধনুর্বিদ্যা দেখে কর্ণ প্রশ্ন করলেন, 'বিপ্রশ্রেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ), তুমি কি মানুষ না স্বয়ং রামচন্দ্র অথবা বিষ্ণু?'

অর্জুন উত্তর দিলেন, 'আমি মানুষের সন্তান।'

যুদ্ধ বেড়েই চলেছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে অনুনয় করে বললেন, 'ধর্মমতে এই তরুণ ব্রাহ্মণই কৃষ্ণাকে জয় করেছেন, আপনারা যুদ্ধ বন্ধ করুন।'

শ্রীকৃষ্ণের কথায় রাজারা শান্ত হলেন। পঞ্চপাণ্ডব মহাআনন্দে দ্রৌপদীকে নিয়ে কুম্ভকারের বাড়ীতে ফিরে এলেন। কুন্তী তখন কুটিরের ভেতর ছিলেন। ছেলেরা তাঁকে ডেকে বললেন, 'মা শীগগির এসে দেখো আমরা কি সম্পদ জয় করে এনেছি।'

কুন্তী কুটিরের ভেতর থেকেই উত্তর দিলেন, 'যা এনেছো তা তোমরা পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও।

মায়ের আদেশ শুনে পাঁচ ভাই কি করবেন ভেবে পেলেন না। কুটির থেকে বেরিয়ে এসে কুন্তীরও মুখে কথা সরলো না। তারপর তিনি দ্রোপদীর হাত ধরে বললেন, 'আমি না জেনে একথা বলেছি। বাবা যুধিষ্ঠির, তুমি ধার্মিক ও জ্ঞানী তুমিই বলে দাও কি ভাবে এ ভুলের সংশোধন হতে পারে?' যুধিষ্ঠির বললেন, 'পার্থ, তুমিই যাজ্ঞসেনীকে জয় করেছো, তুমি একে বিয়ে কর।'

কিন্তু অর্জুন উত্তর দিলেন, 'আমরা মায়ের আদেশই পালন করবো। কৃষ্ণা আমাদের সকলের পত্নী হোক।'

তখন যুধিষ্ঠিরের ব্যাস দেবের কথাগুলো মনে পড়লো। মনে পড়লো 'নিয়তির অদৃশ্য লীলা' কথাটি। তিনি বললেন, 'তবে তাই হোক।'

ওদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনের আসল পরিচয় জানার জন্য গোপনে তাঁদের পেছনে পেছনে গিয়ে পথের মধ্যে তাঁদের কথাবার্তা শুনে বুঝে গেলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনই তাঁর বোনকে জয় করেছেন। তিনি

প্রাসাদে ফিরে রাজা দ্রুপদকে বললেন, 'এঁর রূপ, তেজ আর শিষ্টাচার দেখে আমি আগেই বুঝেছিলাম ইনি নিশ্চয়ই ধনঞ্জয় অর্জুন। যে কারণেই হোক এই পঞ্চপাণ্ডব ছদ্মবেশে অজ্ঞাত বাস করছেন।'

কুন্তী দ্রৌপদীকে পাঁচ ছেলের বধু হিসেবে বরণ করার অল্পক্ষণ পরেই কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পিসিমা কুন্তীর সাথে দেখা করতে এলেন। কৃষ্ণ এতদিন শুধু অর্জুনেরই প্রিয় সখা ছিলেন। এখন থেকে তিনি দ্রৌপদীরও সখা হলেন।

বিদায় নেবার সময় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই উপদেশ দিলেন, 'আপনাদের অনেক বিপদ কেটে গেলেও এখনও আপনাদের সাবধানে আত্মগোপন করে থাকতে হবে।'

পরদিন সকালেই রাজা দ্রুপদ রথ, হাতী, ঘোড়া, লোকলস্কর সহ রাজপুরোহিতকে পাঠিয়ে কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর ইচ্ছা পাঞ্চালরাজ্যে রাজসিক আয়োজনে কৃষ্ণার বিয়ের উৎসব করবেন।

কৃষ্ণা ও কুন্তীকে নিয়ে পাণ্ডবেরা পাঞ্চালে এলেন। কিন্তু মেয়েকে একসাথে পাঁচ ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেবার কথা শুনে দ্রুপদ রাজ ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'অসম্ভব। এ তো রীতিমত অধর্ম। এমন অসামাজিক বিয়ে আমি কখনই মেনে নিতে পারি না।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'কিন্তু আমরাও মায়ের আদেশ অমান্য করতে পারবো না।'

এই নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেলো।

ঠিক সেই সময়ে মহামুনি ব্যাস দেবের আবির্ভাব ঘটলো। তিনি দ্রুপদকে বললেন, পূর্বজন্মে কৃষ্ণা ছিলেন দেবকন্যা। তখন থেকেই ঠিক করা ছিলো এই জন্মে তাঁর পাঁচ স্বামী হবে। আর এই পঞ্চপাণ্ডব

হলেন দেবতার অবতার, এঁদের সাথেই কৃষ্ণার বিয়ে হবে। মহাদেব দ্রৌপদীকে এই বর দিয়ে ছিলেন তোমার পঞ্চপতি হবে।'

ব্যাস আরও বললেন, 'মানুষের এমন বিয়ে হওয়া চলে না, তবে এঁরা দেবতার অবতার। মহাদেবের ইচ্ছায় এঁরাই হবেন দ্রৌপদীর স্বামী।'

দ্রুপদ তখন বিপুল আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এই বিয়েতে উপহার হিসেবে দ্রৌপদীকে বহু মণিমুক্তার অলংকার মূল্যবান পোষাক, দাসদাসী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি পাঠিয়ে দিলেন।

হস্তিনাপুরে বিতর্ক

পাণ্ডবেরা বেঁচে আছেন এবং তাঁরাই কৃষ্ণাকে লাভ করেছেন এ খবর খুব শীগগিরই দুর্যোধনদের কানে পৌঁছে গেলো। এতে তাঁদের রাগের আর সীমা রইলো না।

বিদুরের মুখে পাণ্ডবদের সুখবর শুনে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অখুশী হলেও মুখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারপর বিদুর অন্যদিকে চলে যাবার পর দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'মহারাজ, শত্রুর সুখে সুখী না হয়ে তাকে বিনাশ করার কথা চিন্তা করাই আমাদের উচিত।'

ধৃতরাষ্ট্র জানতে চাইলেন, কি উপায়ে পাণ্ডবদের ক্ষতি করা যায়। তখন দুর্যোধন কয়েকটি উপায়ের কথা বললেন। কিন্তু সেগুলো কর্ণের

পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, 'যতই চেষ্টা করা যাক না কেন পাণ্ডবদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ ঘটানো যাবে না। আর দ্রুপদ-রাজের এত ঐশ্বর্য আছে যে, তাঁকেও ধন দিয়ে বশ করা সম্ভব নয়, তাছাড়া পঞ্চপাণ্ডব এখন তাঁর জামাতা একথা ভুলে গেলে চলবে কেন?' তবে আমার মতে যতদিন না পর্যন্ত পাণ্ডবেরা সৈন্য বাহিনী তৈরী করছেন এবং কৃষ্ণ তাঁর যাদব বাহিনী নিয়ে তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমরা অনেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে গিয়ে তাঁদের বিনষ্ট করে ফেলতে পারি।

দুর্যোধন কর্ণের এই পরামর্শে খুবই খুশী হলেন। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁকে সমর্থন করলেন। তবে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর এতে আপত্তি জানালেন। ভীষ্ম বললেন, আমার চোখে কৌরব ও পাণ্ডব কুমারদের কোন তফাৎ নাই। এই রাজ্যে যেমন ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের অধিকার আছে তেমনি অধিকার আছে পাণ্ডুর পুত্রদের ও। ধৃতরাষ্ট্র, তুমি রাজার ধর্ম পালন করবে। জতু গৃহদাহে যে পাণ্ডবেরা নিহত হয় নি সে আমাদের পরম সৌভাগ্য। হস্তিনাপুরবাসীরা পুরোচনের চেয়ে দুর্যোধনকেই বেশী ঘৃণা করে এ খবরও তোমার জানা উচিত।

তুমি যত শীগগির পারো পাণ্ডবদের ফিরিয়ে এনে অর্ধেক রাজ্য তাদের দাও।

দ্রোণাচার্যও বিদুর ও ভীষ্মের সাথে একমত হলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দুই ছেলে দুঃশাসন ও বিকর্ণকে বহু ধনরত্ন ও সৈন্য সামন্তসহ এই খবর দিয়ে রাজা দ্রুপদের কাছে পাঠালেন যে, দ্রৌপদী তাঁর পুত্রবধু হয়েছেন বলে তিনি খুবই গৌরব অনুভব করছেন, এখন তিনি চান পাণ্ডবেরা তাদের নিজের রাজ্যে ফিরে এসে আনন্দে বসবাস করুক।

দুর্যোধন এসব দেখে খুবই চটে গেলেন, কিন্তু কোন বাধা দিতে পারলেন না। বিশেষ করে বিদুর যখন বললেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাদের সহায় ও মন্ত্রণাদাতা তাদেরকে পরাজিত করার শক্তি কোন মানুষের নেই। দুর্যোধন কর্ণ আর শকুনি হচ্ছে পাপ বুদ্ধি, ধৃতরাষ্ট্রের কখনই এদের মতে চলা উচিত নয়। তখন দুর্যোধনের মাথায় যেন আগুন ধরে গেলো।

ধৃতরাষ্ট্রের খবর পেয়ে কৃষ্ণের উপদেশ মত পাণ্ডবেরা জন্মভূমিতে ফিরে যাবেন বলে ঠিক করলেন।

শুভলগ্নে পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের মা ও বধূ কৃষ্ণাকে নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। নগরের লোকেরা তাঁদের দেখে আনন্দে যেন ফেটে পড়লো। রাজ অন্তঃপুরের রাণী ও বধূরা কৃষ্ণাকে উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে বরণ করে নিলেন। রাজমাতা গান্ধারী কৃষ্ণাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরেই শিউরে উঠলেন। কেন যেন তাঁর মনে হলো, এই পাঞ্চালীর জন্যই একদিন তাঁর শতপুত্রের মৃত্যু হবে।

কয়েকদিন পর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের সামনে পাণ্ডবদের বললেন, 'তোমরা এই রাজ্যের অর্ধেক নাও এবং খাণ্ডব প্রস্থে গিয়ে বাস কর, তাহলে আমার ছেলেদের সংগে তোমাদের বিবাদের কোন কারণ ঘটবে না।'

পাণ্ডবেরা এই কথাতে রাজী হয়ে কৃষ্ণাকে সাথে নিয়ে ঘোর বনের পথ দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে তাঁরা এমন এক নগর তৈরী করলেন যে খাণ্ডবপ্রস্থের লোকেরা নিজেদের দেশের নতুন নাম দিলো ইন্দ্রপ্রস্থ।

অর্জুনের বন গমন

পাণ্ডবেরা কৃষ্ণাকে নিয়ে মহাসুখে দিন কাটাচ্ছেন, এমন সময় দেবর্ষি-নারদ এসে তাঁদের প্রাসাদে অতিথি হলেন। দ্রৌপদী ও তাঁর স্বামীরা নারদের অনেক সেবা যত্ন করলেন। নারদ তাঁদের সেবায় খুশি হয়ে গোপনে পঞ্চপাণ্ডবকে উপদেশ দিলেন, 'পাঞ্চালী একাই তোমাদের পাঁচজনের স্ত্রী। এমন নিয়ম করে তোমরা সংসার ধর্ম পালন করবে যাতে তাঁকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে কখনও ঈর্ষা কিংবা বিরোধের কারণ না ঘটে।'

নারদ চলে যাবার পর পাণ্ডবেরা আলাপ আলোচনা করে ঠিক করলেন যে, দ্রৌপদী এক এক বছর এক এক পাণ্ডবের সাথে বাস করবেন। সেই সময়ে অন্য কোন ভাই যদি তাঁর কাছে যান তাহলে সেই ভাইকে ব্রহ্মচারী হয়ে বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে।

বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী এই নিয়ম হাসিমুখে মেনে নিলেও তাঁর মনে খুব দুঃখ হলো। কারণ পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ধর্মমতে তাঁর স্বামী হলেও মনে মনে তিনি অর্জুনকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। কিন্তু এখন থেকে এই নিয়মের জন্য একটানা চার বছর ধরে তাঁকে প্রিয় ধনঞ্জয়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে এজন্য তাঁর মনে ভীষণ কষ্ট হলো।

এরমধ্যে একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে খুব রাগ করে অর্জুনকে বললেন, 'দস্যুরা এসে প্রায়ই তাঁদের গরু মহিষ আর শস্য লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে অথচ রাজার সৈন্যরা এর কোন প্রতিকার করছে

না। রাজা যদি প্রজাদের ধন-সম্পদ রক্ষা না করতে পারেন তাহলে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে রাজকর নেন কেন?'

ব্রাহ্মণদের কথা শুনে অর্জুন নিজেই দস্যুদের শাস্তি দেবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু এক সমস্যা হলো, যে ঘরে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র থাকতো সেই ঘরে তখন দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির ছিলেন। অর্জুন বাধ্য হয়ে সেই ঘরে ঢুকে অস্ত্র নিয়ে দস্যুদমন করতে ছুটলেন।

দস্যুদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ফিরে এসে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আমি নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, এতে আমার পাপ হয়েছে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি বনে যাবো।'

যুধিষ্ঠির এবং অন্য ভাইরা তাঁকে অনেক বোঝালেন। তাঁরা বললেন, অর্জুনকে বাধ্য হয়েই অস্ত্র নেবার জন্য ঘরে ঢুকতে হয়েছিলো তাতে তাঁর কোন দোষ হয়নি।

কিন্তু অর্জুন কারুর কথাই শুনলেন না। তিনি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর বেশে অজ্ঞাত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

বহুদেশ ঘুরে অর্জুন গঙ্গাদ্বারে এসে বাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছেন এমন সময় নাগ রাজকন্যা উলুপী তাঁকে জলের নীচে টেনে নিয়ে গেলেন। অনেক সেবা যত্নে অর্জুনকে তৃপ্ত করে উলুপী বললেন, 'ধনঞ্জয় খুব অল্পদিনের জন্য হলেও আপনি আমাকে বিয়ে করুন। এতে আপনার যথেষ্ট উপকার হবে।'

অর্জুন সুন্দরী নাগ রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন এবং অল্পদিন পরই তাঁর কাছে বিদায় চাইলেন। বিদায়ের সময় উলুপী তাঁকে বর দিলেন যে অর্জুন পৃথিবীর সমস্ত জলকে এবং জলচর প্রাণীদের বশে রাখতে পারবেন।

এরপর অনেক তীর্থ ঘুরে অর্জুন সমুদ্র তীর দিয়ে মনিপুর রাজ্যে

এলেন।

মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা বনবাসী অর্জুনকে দেখে মুগ্ধ হলেন। অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করে তিন বছর মনিপুরে কাটালেন। তাঁদের একটি ছেলে জন্মালো। চিত্রাঙ্গদা ছেলের নাম রাখলেন বভ্রুবাহন।

অর্জুন চিত্রাঙ্গদার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলে গেলেন, 'তোমার ছেলেকে তুমি একজন খাঁটি মানুষ তৈরী করবে তারপর ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে আমার মা ও ভাইদের সাথে দেখা করবে।'

অর্জুন আবার তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। পথে শ্রীকৃষ্ণ এসে তাঁকে রৈবতক পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে কিছুদিন আনন্দে কাটাবার পর অর্জুন কৃষ্ণের সাথে সোনার রথে চড়ে দ্বারকায় যাত্রা করলেন।

সুভদ্রা হরণ

দ্বারকায় অর্জুন তাঁর প্রিয়সখা কৃষ্ণের সাথে নানারকম আমোদ প্রমোদে মেতে রইলেন। তাঁর সন্ন্যাস জীবন এখন আনন্দে ভরা।

একদিন শ্রীকৃষ্ণের বোন রাজকন্যা সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অর্জুনের মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে কৃষ্ণ বললেন, 'ক্ষত্রিয়দের নিয়ম আছে তাঁরা পছন্দমত কোন মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে বিয়ে করতে পারে। তুমিও আমার বোন সুভদ্রাকে হরণ করে বীরের মত ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যাও।'

অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করবেন বলে সোনার রথে চড়ে যাত্রা

করলেন। সুভদ্রা তখন দেব মন্দিরে পূজা দিয়ে সেই পথেই ফিরছিলেন। অর্জুন তাঁকে জোর করে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রথ ছুটিয়ে দিলেন। রাজকন্যার দেহরক্ষী সৈন্যরা রথের পিছনে ছুটতে লাগলো এবং চীৎকার করতে লাগলো। রাজকন্যা সুভদ্রার দেহরক্ষী সৈন্যেরা অর্জুনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে না পেরে রাজবাড়ীতে এসে সব খবর জানালো।

সুভদ্রা হরণের খবর পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভাই বলরাম ভয়ানক রেগে গেলেন। যাদবেরা (যদু বংশের লোকজন) সকলেই অর্জুনকে নিন্দা করতে লাগলেন।

তখন কৃষ্ণ মধুর হেসে সবাইকে শান্ত করে বললেন, 'অর্জুন ক্ষত্রিয় বীরের কাজই করেছেন। তিনি শান্তনু-ভীষ্মের বংশধর, আমাদের পিসিমা কুন্তীর ছেলে। সবচেয়ে বড় কথা অর্জুন বিশ্বজয়ী বীর এবং সব্যসাচী (যাঁর উভয় হাতেই সমান শক্তি)। আমার মনে হয় তাঁর মত সুপাত্রই সুভদ্রার যোগ্য। যাদব পণ্ডিত ও রাজপুরুষেরা বরং অর্জুন-সুভদ্রাকে ফিরিয়ে এনে বিয়ের উৎসবের ব্যবস্থা করুন।

সুভদ্রার সাথে বিয়ের পর অর্জুন এক বছর দ্বারকায় কাটালেন। ইতিমধ্যে বারো বছর কেটে গেছে।

অর্জুন সুভদ্রাকে গোপবধূর বেশে সাজিয়ে কৃষ্ণের সোনার রথে চড়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। তাঁদের পেয়ে কুন্তী ও ভাইয়েরা খুবই খুশি হলেন। শুধু দ্রৌপদীর দু'চোখ ভরা কান্না। তিনি অর্জুনকে দেখে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কৌন্তেয় (কুন্তীর পুত্র), এই বারো বছর আমি তোমার পথ চেয়ে ছিলাম, যাও তুমি সুভদ্রার কাছে যাও, আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই।'

বুদ্ধিমতী সুভদ্রা দ্রৌপদীকে প্রণাম করে বললেন, 'দিদি যাজ্ঞ-

সেনী, আমি আপনার দাসী।'

দ্রৌপদী তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'তোমার স্বামী অজাতশত্রু (যার কোন শত্রু জন্মায়নি) হোন।

কিছুদিন পর সুভদ্রার একটি ছেলে হলো। তার নাম রাখা হলো অভিমন্যু। জন্মের পর থেকেই অভিমন্যুর সমস্ত শিক্ষার ভার শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে তুলে নিলেন।

অল্প বয়সেই অভিমন্যু বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সাহসে শ্রীকৃষ্ণের মতই হয়ে উঠলেন।

দ্রৌপদীও এর মধ্যে পাঁচটি বীর ছেলের মা হয়েছেন। তাঁদের নাম হলো প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন।

খাণ্ডব দাহন

সুন্দর একটি দিনে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের কয়েকজন প্রিয় বন্ধু, দ্রৌপদী ও সুভদ্রাকে নিয়ে যমুনার তীরে খাণ্ডব-বনে বেড়াতে গেলেন। সবাই সেখানে নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি করছেন। শুধু অর্জুন আর কৃষ্ণ নদীর ধারে বসে কথাবার্তা বলছেন। এমন সময়ে সেখানে খুব লম্বা চওড়া চেহারার এক ব্রাহ্মণ এলেন। তাঁর শরীরের রং পাকা সোনার মত, মাথার চুল ও দাঁড়ির রং কটা, পরনে ছেঁড়া কাপড়।

ব্রাহ্মণ বললেন, 'কৃষ্ণার্জুন শোন, আমি সর্বভুক অগ্নিদেব। রাজা শ্বেতকির যজ্ঞে একটানা বারো বছর ঘি খেয়ে আমার অরুচি রোগ

হয়েছে। আমার এই রোগ কিছুতেই সারছে না। দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বলেছেন, আমি যদি এই খাণ্ডব বন খেতে পারি তাহলে আমার অসুখ সেরে যাবে। কিন্তু তক্ষকনাগ সপরিবারে এই বনে থাকে বলে তাঁর সখা ইন্দ্রদেব বনকে রক্ষা করেন। সেজন্যই আমি খাণ্ডব বন পোড়াতে পারি না।'

অর্জুন বললেন, 'প্রভু, আদেশ করুন আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?'

অগ্নি বললেন, 'ব্রহ্মার কাছে খবর পেলাম নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও নরনারায়ণ কৃষ্ণ আজ এই বনে এসেছেন, তোমরা সহায় হলে আমি এই বনকে খেতে পারবো, দেবতারা আমাকে বাধা দিতে পারবেন না।'

অগ্নির কথা শুনে অর্জুন বললেন, 'ভগবান, আমরা তো এই বনে আনন্দ করতে এসেছি, আমাদের সাথে কোন অস্ত্র নেই। আপনি যদি আমাদের অস্ত্র দিতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব।'

তখন অগ্নিদেব বরুণ দেবকে স্মরণ করে তাঁর কাছ থেকে অর্জুনের জন্য গাণ্ডীব-ধনু দু'টি অক্ষয় তুনীর এবং একটি ভীষণ চেহারার বানর মূর্তি বসানো কপি ধ্বজরথ চেয়ে নিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিলেন একটি চক্র ও কৌমদকী নামে একটি গদা।

কৃষ্ণার্জুন রথে উঠে বসলে অগ্নিদেব খাণ্ডব বন পোড়াতে শুরু করলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টি হতে লাগলো ও ঝড়ো বাতাস বইতে লাগলো। অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস সবাই ইন্দ্রের আদেশে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলো। অগ্নি তাঁর তেজে সমস্ত বৃষ্টির ধারা মাটিতে নামবার আগেই শুষে নিলেন।

কৃষ্ণার্জুনের অস্ত্রের মুখে দেবতা দানব কেউই টিঁকতে পারলো

না। অগ্নি মহা খুশিতে খাণ্ডব বন পুড়িয়ে চললেন। এই ভীষণ আগুন থেকে মাত্র ছয়টি প্রাণী বেঁচে গেলো। তাদের একজন ময়দানব, অন্য-জন তক্ষক রাজার ছেলে অশ্বসেন এবং চারটি বকের ছানা।

খাণ্ডব দাহন শেষ করে অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জুনকে বর চাইতে বললেন।

অর্জুন অগ্নির কাছে ইন্দ্রদেবের সমস্ত অস্ত্র চাইলেন। এই কথা শুনে ইন্দ্র আকাশ থেকে জানালেন, 'মহাদেব যেদিন তোমার ওপর প্রসন্ন হবেন সেদিন তুমি আমার সব অস্ত্র পাবে।'

কৃষ্ণ বর চাইলেন, অর্জুনের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব যেন চিরদিন টিঁকে থাকে।

অগ্নিদেব তাঁদের আশীর্বাদ করে চলে যাবার পর কৃষ্ণ, অর্জুন ও ময়দানব নদীর কূলে বিশ্রাম করতে বসলেন।

সভাপর্ব

ময়দানবের সভা নির্মাণ

যমুনাতীরে ময়দানব হাতজোড় করে অর্জুনকে বললেন, 'কৌন্তেয় আপনি আমাকে বাসুদেবের (কৃষ্ণ) রাগ ও অগ্নিদেবের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছেন। আমি আপনার জন্য বড় কোন কাজ করে দিতে চাই, এখন আদেশ করুন।'

অর্জুন বললেন, 'আমার কোন কাজই দরকার নেই। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি সুখে থাকো।'

ময়দানব বললেন, 'আমি দানবদের শ্রেষ্ঠ কারিগর এবং মহা শিল্পী। আপনাকে কিছু তৈরী করে দিতে পারলে বড় সুখী হতাম।'

ময়দানবের অনুরোধ শুনে কৃষ্ণ বললেন, 'তুমি যদি পার্থের প্রিয় কোন কাজ করতে চাও তাহলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটি সভাগৃহ তৈরী করে দাও যেমনটি পৃথিবীর কোন মানুষ কখনও পারবে না।

বেশ কিছুদিন চিন্তা ভাবনা ও আলাপ আলোচনা করার পর

যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইরা ময়কে দিয়ে সভাগৃহ তৈরী করাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই উপলক্ষে পাণ্ডবেরা পূজা অর্চনা ও মাঙ্গলিক উৎসব করলেন, ব্রাহ্মণদের ধনরত্ন দান করলেন এবং ভোজ খাওয়ালেন।

শ্রীকৃষ্ণ অনেকদিন ইন্দ্রপ্রস্থে কাটিয়েছেন, এখন তিনি নিজের রাজ্য দ্বারকায় ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু পাণ্ডবেরা, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা কেউ-ই তাঁকে ছাড়তে চান না। কৃষ্ণ তাঁদের মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে, আবার আসবেন এই কথা দিয়ে সোনার রথে উঠে বসলেন। তাঁর সাথে পাণ্ডবেরাও কিছুদূর যাবেন বলে রথে উঠলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সারথি দারুককে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রথের ঘোড়ার রাশ ধরলেন, অর্জুন কৃষ্ণের মাথার ওপর চামর দোলাতে লাগলেন। প্রায় আধযোজন পথ যাবার পর কৃষ্ণ তাঁদের আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন।

ময়দানব অর্জুনকে বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন আমি একবার মৈনাক পর্বতে যাই। সেখানে একবার দানবেরা যজ্ঞ করবে বলে তাদের রাজা বৃষপর্বার জন্য অনেক মূল্যবান উপহার আর মণিমানিক্য এনে জড় করেছিলো। আমিও কিন্তু সরোবরের ধারে কিছু মূল্যবান আর দুর্লভ জিনিষপত্র রেখেছিলাম। এ ছাড়াও মৈনাক পর্বতে দানব-রাজ বৃষপর্বার ভীষণ শক্তিশালী একটি গদা আছে। সোনা আর রত্ন দিয়ে সাজানো গদাটি আমার মনে হয় একমাত্র ভীমসেনের হাতেই মানায়। আর বরুণ দেবের একটি শংখ আছে সেটি আমি আপনাকে উপহার দিতে চাই।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ময়দানব মৈনাক পর্বত থেকে মূল্যবান উপহার ও ধনরত্নগুলো নিয়ে ফিরে এসে সভাগৃহ তৈরীর কাজে লেগে গেলেন।

আকাশ ছোঁয়া সভা গৃহটিকে ময়দানব এমন সব মণিমানিক্য দিয়ে

গড়লেন যে এর কাছে সূর্যের দীপ্তীও যেন ম্লান হয়ে গেলো। এর প্রাচীর ও তোরণে দামী দামী সব পাথর বসানো ও ভেতরে অপূর্ব সুন্দর সব ছবি আঁকা হলো। সভাগৃহের সামনে ময়দানব এমন চমৎকার একটি সরোবর তৈরী করলেন যার সিঁড়িগুলো স্ফটিকে তৈরী। টলটলে নীল জলে সোনার পদ্মফুল ফুটে আছে, আর রঙিন মাছেরা সেই জলে খেলা করছে।

সভাগৃহের চারদিকে ফুলের বাগান, সেই বর্ণালী ফুলের বাগানে ময়দানব নানা-রঙের পাখির মেলা বসিয়ে দিলেন।

এই অদ্ভুত সুন্দর সভাগৃহটি তৈরী শেষ হতে সময় লাগলো চৌদ্দ-মাস।

পাণ্ডবেরা যেদিন সভাগৃহে প্রবেশ করলেন সেদিন যুধিষ্ঠির দশ হাজার ব্রাহ্মণকে পলান্ন (পোলাও), হরিণ ও বরাহের (শূকর) মাংস, সুস্বাদু পায়েস, নানারকম মিষ্টান্ন আর ফলমূল খাওয়ালেন। তারপর তাঁদের দামী কাপড়-চোপড়, ফুলের মালা ও হাজার হাজার গাভী দান করলেন। সভাগৃহে ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা পূজা অর্চনা করলেন। এক সপ্তাহ ধরে এই উপলক্ষে নাচগান আর নানারকম আমোদ প্রমোদ চলতে লাগলো।

যুধিষ্ঠিরের সভায় দেবর্ষি নারদ

যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহের সুনাম স্বর্গমর্তের সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়লো। অনেকদিন ধরে নানাদেশের রাজারা এই সভা দেখতে এলেন। তাঁরা এই সভার অদ্ভুত সৌন্দর্য আর কায়দা কৌশল দেখে যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন। কেউ কেউ স্ফটিকে তৈরী মেঝেকে জল ভেবে পা রাখতে থমকে গেলেন, কেউ আবার সরোবরের জল-কেই স্ফটিকের তৈরী ভেবে জলে পড়ে হাবুডুবু খেলেন।

এর মধ্যে একদিন স্বর্গ থেকে দেবর্ষিনারদ, পারিজাত, রৈবত, সুমুখ ও সৌম্য এই চারজন ঋষিকে নিয়ে পাণ্ডবদের সভা দেখতে এলেন।

যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইরা ঋষিদের উপযুক্ত সম্মান ও সেবা করলেন। নারদও যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম ও প্রজাপালন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন।

যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু আমি সব সময়েই ধর্ম-পথে থাকবার চেষ্টা করি। আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো তা হচ্ছে, আপনি তো স্বর্গমর্ত পাতাল সব জায়গাতেই গিয়েছেন, আমার এই সভার মত সভা কি কোথাও আপনার চোখে পড়েছে?'

নারদ হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'পৃথিবীর কোথাও এমন সভাগৃহ নেই, তবে দেবরাজ ইন্দ্রের সভার মত সভা ত্রিভুবনে কোথাও নেই।'

পাণ্ডবেরা নারদের কাছে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সেই সভাগৃহের বর্ণনা শুনতে চাইলে তিনি বললেন, 'ইন্দ্রের সভা একশো যোজন লম্বা, দেড়শো যোজন চওড়া আর পাঁচশো যোজন উঁচু। সেই সভাকে ইচ্ছামত আকাশে উড়িয়ে নেওয়া যায়। সেখানে জরা, শোক, ক্লান্তি নেই। সেই সভাতে ইন্দ্রের সাথে তাঁর স্ত্রী শচী, বহু মহর্ষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা আর পৃথিবীর মহা পুণ্যবান রাজা হরিশচন্দ্র বাস করেন।'

যুধিষ্ঠির একটু বিষণ্ণ হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'দেবর্ষি, আপনি শুধু রাজা হরিশ চন্দ্রের নামই বললেন? আমাদের বাবা রাজা পাণ্ডু স্বর্গে থেকেও কেন সেই সভায় স্থান পেলেন না? আমার ওপর পিতার কোন আদেশ কি আপনি বয়ে এনেছেন? তাহলে আমাকে সে কথা বলুন।' নারদ উত্তর দিলেন, 'রাজা হরিশচন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দাতা ছিলেন এবং তিনি রাজ সূয়যজ্ঞ করে অনেক দান ধ্যান করে পূণ্য-লাভ করেছিলেন বলেই ইন্দ্রের সভায় স্থান পেয়েছেন। ধর্মরাজ যুধি-ষ্ঠির শোন, তোমার পিতার ইচ্ছা তুমি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞ কর, তাহলে তোমার সেই পুণ্যে তিনিও রাজা হরিশচন্দ্রের মতই ইন্দ্রের সভায় অনন্ত কাল সুখে সম্মানে থাকতে পারবেন। তুমি তোমার বাবার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর এবং বিশ্বজয়ী হও।'

নারদ পাণ্ডবদের আশীর্বাদ করে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দ্বারকার পথে যাত্রা করলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের বিষয়ে কৃষ্ণের মন্ত্রণা

যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রী ও ভাইয়েরাও নারদের সব কথা শুনেছিলেন। তাঁরাও বললেন, 'ধর্মরাজ, আপনি সম্রাট হবার যোগ্য, রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য এটাই আপনার জন্য উপযুক্ত সময়।'

রাজ্যের পুরোহিত ও মুণি ঋষিরাও যুধিষ্ঠিরকে একই উপদেশ দিলেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁদের সবচেয়ে বড় বন্ধু ও নরনারায়ণ রূপী দেবতা শ্রীকৃষ্ণের মত জানার জন্য তাঁকে আনবার জন্য দ্বারকায় দূত পাঠালেন। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে দ্রুতগামী রথে চড়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে এলেন।

সব কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন, 'ধর্মরাজ রাজসূয় যজ্ঞ করার সমস্ত যোগ্যতাই আপনার আছে। তবে এজন্য অনেক অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে। কারণ সমস্ত পৃথিবীতে যত রাজা আছেন সকলে যদি আপনার বশ্যতা স্বীকার করে আপনাকে রাজকর দেন তাহলেই আপনি ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারবেন। কিন্তু মগধের রাজা জরাসন্ধ যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তা সম্ভব নয়। জরাসন্ধ মহাদেবের কাছ থেকে শক্তিলাভ করে ছিয়াশিজন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের কারাগারে বন্দী করে রেখেছেন। আরও চৌদ্দজন রাজাকে বন্দী করতে পারলেই তিনি একশো জন রাজাকে এক সাথে বলি দেবেন। রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাইলে আগে আপনাকে জরাসন্ধকে বধ করে সেই ছিয়াশিজন বন্দী রাজাকে মুক্ত করতে হবে। তবে সে কাজ-

ও বড় সহজ নয়। ভয়ংকর যোদ্ধা চেদিরাজ শিশুপাল হলেন জরাসন্ধের সেনাপতি। মহাবীর বক্র, ভগদত্ত, শৈল্য, পৌণ্ড্রক, ভীষ্মক ইত্যাদি বীর রাজারা হচ্ছেন তাঁর প্রিয় বন্ধু। জরাসন্ধের সাথে যুদ্ধ করে জেতা অসম্ভব জেনেই আমরা যাদবেরা মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় এসে বাস করছি। তবে জরাসন্ধকে বধ করা সম্বন্ধে পার্থ ও ভীমসেন কি ভাবছেন তা আমার জানা দরকার।'

ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'জনার্দন বাসুদেব, আপনি যদি সহায় হন তাহলে আমি ও অর্জুন মিলে জরাসন্ধকে নিশ্চয়ই বধ করতে পারবো।'

কিন্তু যুধিষ্ঠির ভীমসেনের কথায় রাজী হলেন না। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'তা হয় না ভীম। তুমি এবং অর্জুন আমার দুই চোখের মণি আর বাসুদেব আমার হৃদপিণ্ড। তোমাদের হারিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না। তারচেয়ে রাজসূয় যজ্ঞের ইচ্ছাই আমি ত্যাগ করলাম।'

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আমরা ক্ষত্রিয়, অত্যাচারীকে বিনাশ করাই আমাদের কর্তব্য। ধর্মরাজ, জরাসন্ধের ভয়ে আপনি যদি রাজসূয় যজ্ঞের ইচ্ছা ত্যাগ করেন। সেটা হবে আমাদের সকলেরই লজ্জার কারণ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কথা শুনে খুব খুশী হয়ে বললেন, 'আমার প্রিয় সখা পার্থ ক্ষত্রিয় বীরের মতই কথা বলেছেন, জরাসন্ধের সাথে যুদ্ধ করে তাকে বধ করে, বন্দী রাজাদের মুক্ত করাই আমাদের কর্তব্য। সেজন্য মরণকেও ভয় করলে চলবে না।'

যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন, 'এই জরাসন্ধ কে? সে এত ভয়ংকর কি করে হলো যে ভগবান কৃষ্ণ পর্যন্ত তার জন্য ভীত? এর জন্মবৃত্তান্তই

বা কি ?'

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'ধর্মরাজ, এই জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত সত্যিই অদ্ভুত। তাঁর পিতা মগধের রাজা বৃহদ্রথের মত বীর জগতে খুব কম ছিলো। তিনি তিন অক্ষৌহিণী সেনার (এক অক্ষৌহিনী সেনা-বাহিনীতে ৬৫,৬১০টি ঘোড়া, ২১,৮৭০টি হাতি, ২১৮৭০টি রথ ও ১০৯,৩৫০জন পদাতিক সৈন্য থাকে) অধিপতি ছিলেন। জরাসন্ধ দু'-টুকরো শরীর নিয়ে জন্মেছিলো বলে তাকে তার মা বাবা ফেলে দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু জরা নামে এক রাক্ষসী তাকে কুড়িয়ে মন্ত্র বলে জোড়া দেবার পর সে এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশুতে পরিণত হলো। জরা তখন সেই শিশুকে তার মা বাবার কাছে দিয়ে চলে গেলো। রাক্ষসী জরা একে জোড়া দিয়েছিলো বা সন্ধিত করে বাঁচিয়ে ছিলো বলে বৃহদ্রথ তাঁর ছেলেটির নাম রাখলেন জরাসন্ধ। বৃহদ্রথ বৃদ্ধ হবার পর জরাসন্ধকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর রাণীদের নিয়ে বনে তপস্যা করতে চলে গেলেন। আর জরাসন্ধ চণ্ড কৌশিক নামে এক সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে সমস্ত রাজাদের ওপর প্রভুত্ব করা ও মহাদেবের দেখা পাওয়ার ক্ষমতা পেয়েছেন। এই লোকের বল বিক্রমকে ভয় না করে উপায় কি ? তবু আমি প্রতিজ্ঞা করছি সব্যসাচী ও ভীমকে নিয়ে তাঁর সাথে আমি মরণপণ যুদ্ধ করবো।'

আলোচনা শেষ করে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন স্নাতক ব্রাহ্মণের (পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ) ছদ্মবেশে মগধ যাত্রা করলেন। তাদের পরনে শাদা কাপড়, গলায় ফুলের মালা, শরীরে চন্দনের সাজ।

জরাসন্ধের সভায় এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হবার পর জরাসন্ধ খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের সেবা করতে চাইলে তাঁরা শান্ত অথচ কঠিন ভাবে সেই সেবা ফিরিয়ে দিলেন।

জরাসন্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি করে বলুন তো আপনারা কারা? আমার সেবা নিতেই বা কেন আপনাদের এত অনিচ্ছা? আপনাদের বেশবাস ব্রাহ্মণের মত, কিন্তু শরীরের গঠন ক্ষত্রিয়ের মত মজবুত, আপনাদের হাতে ধনুকের গুণ টানার চিহ্ন।'

কৃষ্ণ স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, 'আমরা অবশ্যই ক্ষত্রিয়, আপনি আমাদের শত্রু বলেই আমরা আপনার সেবা নেব না। জরাসন্ধ খুব অবাক হয়ে বললেন, 'বুঝেছি আপনারা ছদ্মবেশী। কিন্তু আমি কি করে আপনাদের শত্রু হলাম তাতো বুঝলাম না!'

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'আমরা একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজার আদেশে তোমাকে শাসন করতে এসেছি। তুমি নরবলি দেবার ইচ্ছায় বহু সৎ-রাজাকে বন্দী করে রেখেছো। আমরা তোমাকে কখনই এই অধর্মের কাজ করতে দেবো না। আমি হৃষিকেশ কৃষ্ণ, এঁরা দু'জন পাণ্ডব রাজকুমার ভীম ও অর্জুন। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি।

হয় তুমি বন্দী রাজাদের মুক্তি দাও, না হয় আমাদের হাতে মৃত্যুর জন্য তৈরী হও।'

জরাসন্ধ যুদ্ধকেই বেছে নিয়ে ভীমসেনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। একটানা দুই সপ্তাহ ধরে এই দুই দুরন্ত বীরের যুদ্ধ চললো। রাজ্যের হাজার হাজার লোক খাওয়া ঘুম ত্যাগ করে যুদ্ধ দেখার জন্য জমা হলো। যুদ্ধের চৌদ্দ দিনে ভীম পরাজিত জরাসন্ধকে দু'হাতে তুলে আছড়ে মারলেন।

তারপর ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের কারাগার থেকে বন্দী রাজাদের মুক্ত করলেন। রাজারা গভীর কৃতজ্ঞতায় দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে বার বার প্রণাম জানালেন।

জরাসন্ধের ছেলে সহদেব তাঁর পুরোহিত ও অমাত্যদের নিয়ে হাতজোড় করে কৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয় দিয়ে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। তারপর ভীম অর্জুন ও মুক্ত রাজাদের সাথে করে জরাসন্ধের দিব্য রথে (অলৌকিক ও সুন্দর) চড়ে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবদের দিগ্‌বিজয়

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'মহারাজ, আমরা রাজ্য পেয়েছি, আমাদের শক্তি, অস্ত্রশস্ত্র আর সুনামের অভাব নেই। কিন্তু আমাদের রাজকোষে ধনরত্ন বড় কম। আপনি অনুমতি দিলে আমরা চার ভাই দিগবিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে আমাদের অধীনস্থ করে

রাজকর আদায় করতে পারি।

যুধিষ্ঠির অনুমতি দিলে অর্জুন, ভীম সহদেব ও নকুল চারজন চার দিকে যাত্রা করলেন।

অর্জুন উত্তর দিকে যাত্রা করে কুলিন্দ, আনর্ত, শাকল দ্বীপ প্রভৃতি জয় করে প্রাগ জ্যোতিষপুরে গেলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত ছিলেন ইন্দ্রের সখা এবং মহাবীর। ভগদত্ত তাঁর কিরাত সৈন্য, চীন সৈন্য এবং সাগর তীরবাসী সৈন্যদের নিয়ে অর্জুনের সাথে আটদিন ধরে যুদ্ধ করে পরাজিত হলেন এবং অর্জুনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য জেনে যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করে তাঁকে রাজকর দিলেন।

এরপর অর্জুন উত্তর পর্বতের সমস্ত রাজ্য, কাশ্মীর, লোহিত দেশ, ত্রিগর্ত, সিংহপুর, সুহ্ম, চোলদেশ, বাহ্লীক, কাম্বোজ, দরদ প্রভৃতি দেশ জয় করলেন। তারপর শ্বেত পর্বত পেরিয়ে কিম্পুরুষ, হাটক ও গন্ধর্ব দেশ জয় করে এলেন হরিবর্ষে। হরিবর্ষের শক্তিমান প্রহরীরা অর্জুনকে খুব সম্মান করে বললেন, 'কুমার পার্থ, এই দেশে কোন মানুষ ঢুকতে পারে না, এ দেশে কখনও যুদ্ধ হয় না। আপনি কি চান বলুন, আমরা খুশি মনেই তা দেব।'

অর্জুন তাঁর ইচ্ছা জানালে রক্ষীরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মানে বহু মূল্যবান উপহার অর্জুনের হাতে দিলেন।

দিগবিজয় শেষ করে অর্জুন মহা আনন্দে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে সমস্ত ধনরত্ন যুধিষ্ঠিরের পায়ে ঢেলে দিলেন।

ভীমসেন তাঁর বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে পূর্ব মুখে যাত্রা করেছিলেন। তিনি পাঞ্চাল, গণ্ডকীয়, বিদেহ, দশার্ণ, পুলিন্দনগর প্রভৃতি জয় করে চেদিরাজ্যে এলেন। চেদিরাজ শিশুপাল খুব আনন্দের সাথেই ধর্মরাজকে রাজকর দিলেন। ভীম কয়েকদিন চেদিরাজ্যে

আনন্দে কাটিয়ে তারপর কুমারদেশ, কোশল, অযোধ্যা, গোপালকচ্ছ, উত্তর সোমক, মল্ল, মৎস্য, দরদ, বৎস প্রভৃতি দেশ জয় করলেন। পুণ্ড্র দেশ জয় করার পর তিনি মহাবাহু কর্ণের রাজ্যে এলেন। কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট বলে স্বীকার করে রাজকর দিলেন। এরপর ভীম কৌশিকী নদীর তীরের রাজাকে জয় করে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, এবং ব্রহ্মপুত্র নদ ও পূর্বসাগরের তীরের ম্লেচ্ছ দেশ জয় করে বহু ধন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

সহদেব দক্ষিণ দিকে শূরসেন, মৎস্য দেশের রাজা, কুন্তি ভোজ রাজ্য, অবন্তী ও ভোজককটের রাজাকে জয় করে কিস্কিন্ধা বিজয়ে গেলেন। মহিষ্মতীর রাজাকে জয় করতে তাঁকে খুবই বেগ পেতে হলো। এই যুদ্ধে তাঁর বহু সৈন্য মারা গেলো এবং নিজেও আহত হলেন। তবে তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করলেন। এরপর সহদেব ত্রিপুর, পৌরব, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের রাজাদের পরাজিত করে রাজকর আদায় করলেন। আরও জয় করলেন কর্ণ প্রবারক, কালমুখ রাক্ষসদের দেশ, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র ও কলিঙ্গ রাজ্য। দক্ষিণ সমুদ্রতীরে লংকা দ্বীপে তখন ধর্মাত্মা রাজা বিভীষণ রাজত্ব করছিলেন। তিনি খুবই আনন্দের সাথে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করলেন ও অনেক মণিমানিক্য, চন্দন ও অগরু কাঠ, হাতির দাঁত, মূল্যবান কাপড় এবং অলংকার উপহার দিলেন।

এইভাবে শান্তি ও শক্তি প্রয়োগ করে সহদেব দক্ষিণের সমস্ত দেশ জয় করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন এবং সমস্ত ধনসম্পদ যুধিষ্ঠিরের হাতে তুলে দিলেন।

নকুল পশ্চিম দিকে যাত্রা করে শৈরীষক, মহোত্থ, দশার্ণ, ত্রিগর্ত, মালব, পঞ্চনদ প্রদেশ, দ্বারপালপুর ইত্যাদি দেশ জয় করলেন। তিনি

দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠালে শ্রীকৃষ্ণ যাদবদের নিয়ে যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করলেন। এরপর নকুল রাজপুর ও সকল রাজ্যে গিয়ে সেখানকার রাজা মদ্র (পাণ্ডবদের মামা) শল্যের কাছ থেকে প্রচুর ধন-রত্ন পেলেন এবং সাগর তীরের ম্লেচ্ছ পহলব জাতি ও বর্বরদের জয় করে দশহাজার উটের পিঠে ধন বোঝাই করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে সকলকে অবাক করে দিলেন।

রাজকোষে প্রচুর ধন এবং শস্য ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য সঞ্চিত হবার পর যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য উদ্‌যোগী হলেন।

রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ

রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, বাসুদেব, তোমার দয়াতেই আমাদের এই সুখ এবং ঐশ্বর্য। তুমি অনুমতি দিলেই আমি যজ্ঞের অনুষ্ঠান শুরু করবো।

কৃষ্ণ বললেন, 'আপনি শ্রেষ্ঠ রাজা, সম্রাট হবারই যোগ্য। যজ্ঞের জন্য আপনি আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেবেন তাই আমি পালন করবো।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন যাতে যজ্ঞের আয়োজনে কোন ত্রুটি না হয়। সহদেব নিমন্ত্রণের জন্য দেশে দেশে দূত পাঠালেন। ইন্দ্রপ্রস্থে অতিথি ব্রাহ্মণ ও রাজাদের থাকবার জন্য সুন্দর সুন্দর সব বাড়ী তৈরী করা হলো। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের যুধিষ্ঠির হাজার হাজার গাভী, দামী কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র, সোনা রূপা এবং দাস দাসী দান করলেন।

নিমন্ত্রিত রাজা ও রাজপুত্রেরা রাজসূয় যজ্ঞের উৎসবে যোগ দিয়ে নাচ গান আমোদ প্রমোদে দিন কাটাতে লাগলেন।

মহামুণি ব্যাসদেব নিজে যজ্ঞের জন্য ঋত্বিকদের (পুরোহিত) নিয়ে এলেন। মুণি সুসামা যজ্ঞের উদ্‌গাতা (যিনি সামগান করেন) হলেন, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য হলেন অধ্বর্যু (যজুর্বেদ পাঠক), ধৌম ও পৈল মুণি হোতা (উদযোগী) এবং স্বয়ং ব্যাসদেব যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন।

যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনারাই আমার পরম আত্মীয়, আপনারা সকলে মিলে আমাকে সাহায্য করুন যাতে আমি এই বিরাট অনুষ্ঠানকে সফল করতে পারি।'

তারপর যুধিষ্ঠির দুঃশাসনকে খাদ্য-দ্রব্যের ভার ও অশ্বত্থামাকে ব্রাহ্মণদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সারথি পেলেন রাজাদের সেবার ভার, ভীষ্ম ও দ্রোণ নিলেন সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব, কৃপাচার্য ধনরত্ন এবং দক্ষিণার ভার ও বিদুর ব্যয়ের ভার নিলেন। জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দেবার কাজে নিযুক্ত হলেন।

নিমন্ত্রিত রাজারা কে কত পরিমাণ ধনরত্ন রাজসূয় যজ্ঞে দান করতে পারেন তার প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান ও শিশুপাল বধ

যজ্ঞের অভিষেকের দিন সমস্ত সম্মানিত অতিথিদের নিয়ে মহর্ষি নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিরা যজ্ঞশালায় এলেন।

পিতামহ ভীষ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির এবার তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ জনকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য (পূজা) দান কর।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ আপনি বলে দিন কাকে আমি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিতে পারি?

ভীষ্ম বললেন, এই সভায় বাসুদেব কৃষ্ণই তাঁর শক্তি, তেজ, জ্ঞান ও ধর্মগুণে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাবার যোগ্য।

যুধিষ্ঠির তখন সহদেবকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করলেন।

কৃষ্ণের এই সম্মান ও পূজা লাভ করা চেদিরাজ শিশুপালের অসহ্য মনে হলো। তিনি প্রকাশ্য সভায় ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরকে কটুবাক্য বললেন এবং কৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগলেন। তারপর তাঁর সমর্থক রাজাদের নিয়ে এমন গোলযোগ সৃষ্টি করলেন যে যজ্ঞ পণ্ড হবার উপক্রম হলো।

ভীমসেন শিশুপালের কুৎসিত কথা শুনে ও অবশিষ্ট আচরণ দেখে ভীষণ রেগে তাঁকে আক্রমণ করতে গেলে ভীষ্ম তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তারপর সভার কোলাহলকে শান্ত করে নিয়ে বললেন, 'উপস্থিত সকলে

শুনুন, এই শিশুপাল জন্মের সময় তিনটি চক্ষু আর চারটি হাত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো এবং জন্মেই গর্দভের মত চীৎকার করেছিলো। তাই দেখে এর পিতামাতা ভয় পেয়ে একে ফেলে দিতে চাইলেন, কিন্তু তখনই দৈববাণী হলো, 'এই শিশুর এখনও মরার সময় হয়নি। তোমরা একে লালন-পালন করো, যার হাতে এর মৃত্যু লেখা আছে তার হাতেই এর মৃত্যু হবে।'

শিশুপালের মা তখন দৈববাণীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন, 'দেবতা, কার হাতে এর মৃত্যু হবে?'

আবার দৈববাণী হলো, 'যিনি একে কোলে নিলে এর বাড়তি দু'টো হাত খসে যাবে ও তৃতীয় চোখটি মিলিয়ে যাবে তিনিই হবেন এর মৃত্যুর কারণ। তখন চেদিরাজের অনুরোধে রাজ্যের হাজার হাজার লোক এসে শিশুপালকে কোলে নিলো কিন্তু কোন ফল হলো না। তারপর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাদের পিসিমার (শিশুপালের মা) সাথে দেখা করতে এলেন। চেদিরাজের মহিষী তাঁর ভাইয়ের ছেলেদের দেখে খুব খুশি হয়ে নানা কথাবার্তা বললেন তারপর শিশু-পালকে এনে শ্রীকৃষ্ণের কোলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বাড়তি হাত দু'টি খসে গেলো আর কপালের তৃতীয় চোখটিও অদৃশ্য হলো। এই ঘটনায় সকলে চমকে গেল।

শিশুপালের মা ভীষণ ভয় পেয়ে কৃষ্ণকে বললেন, 'মাধব, আমার ভয় করছে, তুমি আমাকে কথা দাও আমার ছেলের সব অপরাধ ক্ষমা করবে?'

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'আমি শিশুপালের একশোটা পর্যন্ত অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু তার ওপর একটাও যদি অপরাধ সে করে তাহলে আমার হাতে তার মৃত্যু অনিবার্য।' তারপর বহুকাল কেটে

গেছে। আজ এই দুর্বুদ্ধি শিশুপাল মনে হয় নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনছে।

শিশুপাল ভীষ্মকে বিদ্রূপ করে বললেন, ওহে ভীষ্ম, তুমি তো কর্ণ, দ্রোণ, জয়দ্রথ ইত্যাদি রাজাদের দয়ায় বেঁচে আছো। তা শ্রীকৃষ্ণের পায়ে তেল না দিয়ে তাঁদের পায়ে তেল দিলেই তো পারো।'

ভীষ্ম উত্তর দিলেন, 'শিশুপাল জেনে রেখো, এই সব রাজাদের কাছে আমিই শ্রদ্ধার পাত্র। তোমার যদি সৎসাহস থাকে তো আমাদের পূজার পাত্র এই শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কৃষ্ণের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।'

শিশুপাল চীৎকার করে হেসে উঠে বললো, 'এই যে মাধব, আমি তোমাকে যুদ্ধ করতে ডাকছি।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন শান্ত কণ্ঠে যজ্ঞ সভার রাজাদের বললেন, 'রাজারা সবাই শুনুন, আমরা অর্থাৎ যাদবেরা শিশুপালের কোন ক্ষতি না করা সত্ত্বেও এ আমাদের কাছে বহু অপরাধ করেছে। তবু আমি একমাত্র এর মা অর্থাৎ আমার পিসীমার অনুরোধের কথা মনে করে একে এতকাল ক্ষমা করেছি। কিন্তু আজ সে সবার সামনে যে অপরাধ করলো তার ক্ষমা নেই। এই পাপী আমার স্ত্রী রুক্মিণীকে পর্যন্ত অপমান করার চেষ্টা করেছিলো।

কৃষ্ণের কথা শুনে শিশুপাল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণী সম্বন্ধে কুৎসিত মন্তব্য করে বললেন, 'কৃষ্ণ তোমার ক্ষমা করা না করায় আমার আদৌ আগ্রহ নেই।'

এটাই হলো শিশুপালের একশো একটি অপরাধ। চোখের নিমেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে দেহ থেকে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন, বিশাল পর্বতের মত শিশুপালের শরীর মাটিতে

আছড়ে পড়লো। সভার সকলে বজ্রাহতের মত বসে রইলেন। শুধু মহর্ষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা হাতজোড় করে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে শিশুপালের দেহের সৎকার করা হলো এবং সমস্ত রাজারা মিলে শিশুপালের ছেলেকে চেদিরাজ্যের রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হবার পর একে একে সব রাজারা তাঁর প্রশংসা করে বিদায় নিলেন। সবশেষে শ্রীকৃষ্ণ সবাইকে আশীর্বাদ জানিয়ে তাঁর মেঘ রং গরুড়ধ্বজ রথে চড়ে দ্বারকার পথে যাত্রা করলেন।।

দুর্যোধনের দুঃখ

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে দুর্যোধন যে কয়দিন রইলেন সারাক্ষণ পাণ্ডবদের সভাগৃহের সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন এবং এত বিচিত্র সৌন্দর্য ও জাঁকজমক দেখে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। ফলে তিনি নানারকম হাস্যকর কাণ্ড করলেন। যেমন, স্ফটিকের মেঝেকে জল ভরা সরোবর মনে করে থমকে গিয়ে পরনের পোষাক গুটিয়ে নিলেন, পরে ভুল বুঝে তাঁর লজ্জার অন্ত রইলো না। আবার সরোবরকে নীলাভ স্ফটিকে তৈরী মেঝে ভেবে চলতে গিয়ে জলে পড়ে গেলেন। তখন রাজবাড়ীর ভৃত্যরা মুখ টিপে হেসে তাঁকে অন্য পোষাক এনে দিলো। এইসব কারণে দুর্যোধনের বুকের ভেতর রাগ

ও ঈর্ষার আগুন জ্বলতে লাগলো। উৎসব শেষে হস্তিনাপুরে ফিরেও তাঁর মন মেজাজ সর্বক্ষণ খুব খারাপ হয়ে রইলো।

দুর্যোধনের মনের অবস্থা লক্ষ্য করে তাঁর মামা শকুনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি হয়েছে? কেউ কি তোমার কোন রাগ অথবা দুঃখের কারণ ঘটিয়েছে?'

দুর্যোধন উত্তর দিলেন, 'মামা পাণ্ডবদের অস্ত্রের জোরে আর রাজসূয় যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির এখন সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট। তাদের সেই ঐশ্বর্য আর প্রতাপ দেখে আমার বুকে যে দুঃখের আগুন জ্বলছে একমাত্র আত্মহত্যা করলেই তা নিবতে পারে। আপনি আমার বাবাকে বলবেন, খুব শীগগিরই আমি মরে সব জ্বালা জুড়াবো।'

শকুনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমিও অসহায় নও। তোমরা একশো বীর ভাই মিলে ইচ্ছে করলে সমগ্র পৃথিবী জয় করতে পারো।'

দুর্যোধন বললেন. 'আপনারা অনুমতি দিলে নিশ্চয়ই তা পারি। তবে পাণ্ডবদের ঐ অপরূপ রাজ সভাটি কিন্তু আমার চাই-ই।'

এ কথা শুনে শকুনি একটু দমে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবকে যুদ্ধে হারানো তো দেবতাদেরও অসাধ্য, বিশেষ করে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যে ক্ষেত্রে তাঁদের সহায়। তবে কৌশলে কিভাবে যুধিষ্ঠিরকে হারানো যায় সে কথা নিয়ে আমি কিছু ভেবেছি।' দুর্যোধন কৌশলের কথা জানবার জন্য আগ্রহ দেখালে শকুনি বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলায় খুব ঝোঁক, কিন্তু খেলাতে সে একেবারেই কাঁচা। আবার এদিকে আমার মত নিপুন পাশা খেলোয়াড় সারা পৃথিবীতে নেই। তুমি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানাও, তারপর দেখো আমি কেমন কৌশলে তোমাকে জিতিয়ে তাঁর রাজ্য তোমার হাতের মুঠোয়

এনে দেই।

যুধিষ্ঠির বললেন, 'কিন্তু একথা আমার বাবাকে আপনিই বলুন, তাঁকে এধরনের কোন কথা বলার সাহস আমার হয় না।'

শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে এসে বললেন যে তাঁর বড় ছেলে দুর্যোধন শোকে ও দুশ্চিন্তায় দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, দয়া করে এর কারণ তিনি খুঁজে বের করুন।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ডেকে বললেন, 'বৎস, তোমার রাজত্ব, সম্পদ, সুখ আনন্দ সবই তো আছে তবু কেন তুমি দুঃখ পাচ্ছো আমাকে বলো?'

দুর্যোধন তাঁর দুঃখের কারণগুলো জানিয়ে তারপর বললেন, 'মহারাজ আপনি অনুমতি দিন, শকুনি মামার সাহায্যে পাশা খেলায় পাণ্ডবদের হারিয়ে তাদের সমস্ত সুখ সম্পদ আমি লাভ করি।'

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ছেলের হীন প্রস্তাবে দুঃখিত হয়ে বললেন, 'পাণ্ডবেরা আমাদের শত্রু নয়, তবু কেন তুমি তাদের ক্ষতির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছো? তাছাড়া ধর্মাত্মা বিদুরের উপদেশ ছাড়া তো আমি কোন কাজ করি না, এ বিষয়ে তাঁর মত আমাকে জানতে হবে।'

দুর্যোধন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বিদুর যে পাণ্ডবদেরই পক্ষে এ তো সবারই জানা। বুঝেছি, মৃত্যু ছাড়া আমার কোন পথ নাই।'

ছেলের করুণ কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মন নরম হয়ে এলো। তিনি খুব আদরের সাথে বললেন, 'বাবা দুর্যোধন, তুমি এখনই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের খবর পাঠাও, তাঁদের কাছে পাণ্ডবদের সভাগৃহের বর্ণনা দাও, আমি রাজকোষ খুলে দিচ্ছি যত ধনরত্ন লাগে সব দিয়ে তুমি তেমনি এক সভাগৃহ তৈরী করিয়ে নাও। তুমি এ রাজ্যের যুবরাজ, তোমার তো শোক করা সাজে না।'

দুর্যোধন বললেন, 'পিতা আপনি যদি চক্ষুষ্মান হতেন তাহলে আপনি ইন্দ্রপ্রস্থের সেই সভা দেখে বুঝতেন একমাত্র ময়দানব ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় অমন সভাগৃহ তৈরী করা। কিন্তু আমরা কখনই ময়দানবকে দিয়ে কাজ করাতে পারবো না। তাছাড়া সম্রাট হিসাবে রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরকে বিভিন্ন দেশের রাজারা যেসব উপহার দিয়েছেন তার বিবরণ শুনুন। কম্বোজরাজ তাঁকে সোনার কাজ করা পশমের তৈরী পোষাক দিয়েছেন। ত্রিগর্ত-রাজ শত শত ঘোড়া, খচ্চর ও উট দিয়েছেন। শূদ্ররাজারা দিয়েছেন কয়েকশত সুন্দরী দাসী, ম্লেচ্ছরাজা দগদত্ত বহু ঘোড়া, মূল্যবান অলংকার এবং হাতির দাঁতের বাঁট লাগানো অনেক তলোয়ার দিয়েছেন। এ ছাড়াও দ্বিচক্ষু,* ত্রিচক্ষু,* ললাট চক্ষু,* উষ্ণীষধারী, উলঙ্গ, রোমশ, একপদ* চীন, শক, হূন, হার, উড্র, বর্বর, বনবাসী প্রভৃতি জাতিরা দলে দলে এসে যুধিষ্ঠিরকে সম্মান জানানোর জন্য দিনের পর দিন ইন্দ্রপ্রস্থে অপেক্ষা করেছে। মেরু আর মন্দর পর্বতের মধ্যে শৈলোদা নদীর তীরের অধিবাসী খস, পারদ, কুলিঙ্গ প্রভৃতি জাতির লোকেরা যুধিষ্ঠিরের জন্য রাশি রাশি পিপীলিকা স্বর্ণ* এনেছিলো। কৃষ্ণ অর্জুনের সম্মানে চৌদ্দ হাজার উৎকৃষ্ট হাতি উপহার দিয়েছেন। সবার ওপরে পাণ্ডবদের গৃহলক্ষ্মী অপরূপা দ্রৌপদী প্রতিদিন নিজে উপোস থেকে উৎসবে যত গরীব দুঃখী অন্ধ আতুর এসেছে সবার খাওয়া হয়েছে কিনা, ঠিকমত দান দক্ষিণা পেয়েছে কিনা এই সব দেখতেন। মোটকথা রাজসূয় যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির রাজা হরিশচন্দ্রের মত সুখ সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। এসব দেখার পর আমার আর বেঁচে

[* মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণে এইসব জাতি ও জিনিষের উল্লেখ আছে।]

থাকার ইচ্ছা নেই।'

ধৃতরাষ্ট্র তবুও যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে যুধিষ্ঠির বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মহারাজ আপনি আমাকে ধর্মের কথা বলে ভোলাতে পারবেন না। যে উপায়েই হোক শত্রুকে বিনাশ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, আমি সেই ধর্ম পালন করতে চাই।'

শকুনিও বার বার পাশা খেলার কথা বলে ধৃতরাষ্ট্রকে চাপ দিতে লাগলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র কিছুটা বাধ্য হয়েই মন্ত্রীদের ডেকে পাশা খেলার জন্য দ্যূতসভা তৈরী করার আদেশ দিলেন।

দ্যূত সভার আয়োজন

দ্যূতসভা তৈরী শেষ হবার পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ভাই ও মুখ্যমন্ত্রী বিদুরকে বললেন, 'তুমি দ্রুতগামী রথ নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলো, 'সে যেন তার ভাইদের সঙ্গে এসে আমাদের সাথে বন্ধুভাবে দ্যূত ক্রীড়া (পাশা খেলা) করে।'

বিদুর বললেন, 'আপনার এই আদেশের আমি প্রশংসা করতে পারছি না। পাশা খেলা অবশ্যই সর্বনাশ ডেকে আনবে। এর ফলে রাজ্য নাশ, বংশ নাশ হবে, কুরুপাণ্ডবের মধ্যে ভীষণ বিবাদ হবে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'বিদুর আমি দৈবের উপর নির্ভর করি। দৈব যদি সহায় থাকে তাহলে সব দিকেই শান্তি বজায় থাকবে।'

বিদুরকে দেখে পাণ্ডবেরা খুব খুশি হলেও তাঁর আসবার কারণ

জেনে যুধিষ্ঠিরের মন খারাপ হয়ে গেলো। তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন, 'পাশা খেলা থেকে যে সব নীচ কলহের সৃষ্টি হয় তা কোন বুদ্ধিমান লোকই পছন্দ করেন না। তবে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ রাখা আমার কর্তব্য বলেই আমরা হস্তিনাপুরে যাবো।'

হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে পাণ্ডবেরা প্রথমে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যের সাথে দেখা করলেন তারপর ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। দ্রৌপদীর অপরূপ সৌন্দর্য ও মহামূল্যবান অলংকার ও কাপড়চোপড় দেখে রাজপ্রাসাদের বধুরা সবাই ঈর্ষান্বিত হলেন।

পরদিন সকালে যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের নিয়ে দ্যূত সভায় এলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বিষণ্ণ মুখে দ্যূতসভায় উপস্থিত হলেন।

শকুনি খুব উল্লাসের সাথে যুধিষ্ঠিরকে খেলায় যোগ দিতে বললে যুধিষ্ঠির বললেন, পাশা খেলায় যে শঠতা হয় তাকে আমি ঘৃণা করি। এই সভার কার সাথে আমাকে খেলতে হবে? পণ কে দেবেন?

দুর্যোধন বললেন, 'ধর্মরাজ শুনুন, পাশা খেলায় শঠতা কোন নিন্দার ব্যাপার নয়। আমার মামা শকুনি আমার হয়ে খেলবেন, তবে পণের ধনরত্ন আমিই দেবো।'

যুধিষ্ঠির একটু অখুশি হয়ে উত্তর দিলেন, 'অন্যের হয়ে খেলাটা আমি রীতি বিরুদ্ধ বলে মনে করি। তবে কেউ যদি আমাকে খেলায় আহ্বান করে তাকে আমি প্রত্যাখান করি না।'

খেলা শুরু হলো। যুধিষ্ঠির বললেন, 'দুর্যোধন শোন, সমুদ্রের ঢেউ থেকে তোলা আমার গলার এই মহামূল্যবান হার আমি পণ ধরলাম।'

দুর্যোধন বললেন, 'আমার সমস্ত মনিমানিক্যই আমি পণ ধরেছি।'

শকুনি কৌশলে পাশা ফেলে যুধিষ্ঠিরের পণ জিতে নিলেন। যুধিষ্ঠির বুঝলেন, শকুনি খেলায় শঠতা করে জিতেছেন তবু ভয়ংকর জিদ আর আক্রোশ নিয়ে আবার পণ ধরলেন এবং শকুনির শঠতার জন্য হেরে গিয়ে এক হাজার করে স্বর্ণমুদ্রা ভরা অনেকগুলো মঞ্জুষা (ঝাঁপি) পণ দিলেন।

শকুনি বার বার কৌশলে পাশা ফেললেন। আর যুধিষ্ঠির খেলায় হেরে যেসব পণ দিতে বাধ্য হলেন তা হচ্ছে, বাঘের চামড়ায় মোড়া ও সোনার জালি দিয়ে ঘেরা একটি রথ, রথের আটটি শ্বেতপদ্মের মত সুন্দর ঘোড়া, নাচেগানে নিপুণ একলক্ষ সুন্দরী দাসী, একলক্ষ বিনয়ী ও বিশ্বাসী দাস, এক হাজার উৎকৃষ্ট হাতি, স্বর্ণধ্বজ ও পতাকা দিয়ে সাজানো এক হাজার রথ। এ ছাড়াও গন্ধর্বরাজ অর্জুনকে যে দশ হাজার রথ, দশ হাজার ঘোড়ায় টানা গাড়ি, ষাট হাজার বীর সৈন্য আর স্বর্ণমুদ্রায় ভরা চারশোটি সোনার ভাণ্ড দিয়েছিলেন সেসবই পণ হিসেবে শকুনিকে দিতে বাধ্য হলেন।

দুর্যোধন আর শকুনির শঠতায় যুধিষ্ঠিরের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে দেখে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'মহারাজ দুর্যোধনের জন্মলগ্নেই আপনি জেনেছিলেন এই ছেলের জন্য আমাদের ভরত বংশ অর্থাৎ কুরুকুল ধ্বংস হবে, আমি এখনই তার সূচনা দেখতে পাচ্ছি। তার এই শঠতার জন্য ভীষণ কলহ হবে যার ফলে পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধে কৌরবেরা বিনষ্ট হবে। আপনি দুর্যোধনের আনন্দে খুশি না হয়ে তাকে পাশা খেলা বন্ধ করতে আদেশ দিন।'

বিদুরের কথায় দুর্যোধন এত রেগে গেলেন যে তাঁকে দ্যূতসভা থেকে বের হয়ে যেতে বললেন।

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ এবং অনেক অমাত্য দুর্যোধন ও শকুনির কাণ্ড

দেখে খেলা বন্ধ করার জন্য বলতে লাগলেন। এই সব গোলযোগের মধ্যেই খেলা চলতে লাগলো আর যুধিষ্ঠির তাঁর সমস্ত ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া, শস্যের ভাণ্ডার এবং পর্ণাশা ও সিন্ধু তীরের সমস্ত সম্পত্তি, নগর, গ্রাম ইত্যাদি বাজী রেখে হেরে গেলেন। এরপর মরীয়া হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর চারজন মহাবীর ভাই ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে বাজী রেখে হারলেন এবং অন্ধ আক্রোশে ঘোষণা করলেন এবার তিনি নিজেকেই বাজী রাখবেন।

কিন্তু শকুনি বললেন, তা হয় না। ধর্মরাজ, তোমার অন্য কোন ধন অবশিষ্ট থাকতে তুমি নিজেকে বাজী রাখতে পারো না। তোমার প্রিয় পাঞ্চালী এখনও আছে, তাকে পণ রাখো।'

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর সমস্ত শুভ-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে বললেন, 'তাই হবে। আমি রূপে গুণে অতুলনীয়া, পদ্মগন্ধা, মধুর ভাষিণী দ্রৌপদীকেই পণ রাখলাম।'

যুধিষ্ঠির এই কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে সভায় উপস্থিত সকলে 'ধিক্ ধিক্' বলে উঠলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলেন। আর শকুনি উচ্চহাস্যে পাশা ফেলে চীৎকার করে ঘোষণা করলেন, 'জিতেছি।'

কর্ণ আর দুঃশাসন আনন্দে ফেটে পড়লেন। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দ লুকাতে না পেরে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'কি জিতলাম? আমরা কি জিতলাম?'

দুর্যোধন বিদ্রূপ করে বিদুরকে বললেন, 'যান, পাণ্ডব প্রিয়া দ্রৌপদীকে নিয়ে আসুন, সে দাসী হয়ে আমার এই সভাগৃহ ঝাঁট দেবে।'

বিদুর উত্তর দিলেন, 'তোমার মত পাপিষ্ঠ লোকই এমন কথা বলতে পারে।'

দ্রৌপদীর অপমান ও ধৃতরাষ্ট্রের বর দান

দুর্যোধন তাঁর এক অনুচরকে বললেন, 'তুমি যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এসো।' দ্যূতসভার সমস্ত খবর ইতিমধ্যেই রাজ অন্তঃপুরে পৌঁছে গেছে। দৌপদী অনুচরকে কঠোর ভাষায় তাড়িয়ে দিলেন। এমন কি যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে দূতের মুখে খবর পাঠালেন তিনি তখন-ও তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তখন দুর্যোধন তাঁর যোগ্য ভাই দুঃ-শাসনকে বললেন, 'তুমিই যাও, অবাধ্য পাঞ্চালীকে ধরে আনো।'

দুঃশাসনকে দেখে দ্রৌপদী ভয়ে আতংকে ধৃতরাষ্ট্রের রাণীদের কাছে আশ্রয় চাইলেন। কিন্তু দুঃশাসন তাঁর চুলের গোছা ধরে টেনে দ্যূতসভার দিকে নিয়ে চললেন।

খোলাচুলে, এলোমেলো কাপড়ে দ্রৌপদীকে জোর করে সভায় এনে দাঁড় করানো হলো। লজ্জায় ঘৃণায় যেন পুড়ে যেতে যেতে দ্রৌপদী চাপা কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'শোন দুঃশাসন, স্বয়ং ইন্দ্রদেবও যদি চেষ্টা করেন তবু পাণ্ডবদের রাগের আগুন থেকে তুমি রক্ষা পাবে না।'

দু'চোখ ভরা জল নিয়ে দ্রৌপদী সভার চারদিক দেখলেন, তারপর বিলাপ করে বলতে লাগলেন, 'এখানে আমার শ্বশুরেরা রয়েছেন, তাঁদের সামনে আমাকে এই অপমান সইতে হচ্ছে কেন? ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর আর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? ধিক্ ধিক্ ভরত বংশ আর কৌরবদের কুল ধর্মকে।'

দ্রৌপদী কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্য করলেন তাঁর স্বামীরা পাথরের

মূর্তির মত বসে রয়েছেন। দুঃশাসন তাঁদের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে দ্রৌপদীকে ধাক্কা দিয়ে হেসে উঠে বললেন, 'দাসী!'

কর্ণ এতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, শকুনিও হাসতে লাগলেন। সভার অন্যরা লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নীচু করে রইলেন। শুধু ভীষ্ম বললেন, 'সুলক্ষণা কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম।'

দ্রৌপদীর অপমান সহ্য করতে না পেরে ভীম ভীষণ রাগে চীৎকার করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ধর্মরাজ, আপনার খেয়াল খেলার জন্য আজ লক্ষীসমা দ্রৌপদীর এই অপমান! এই মুহূর্তে হয় আমি আপনাকে হত্যা করবো, না হয় আমার নিজের অক্ষম দুই হাত আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবো।'

অর্জুন বহু চেষ্টায় ভীমকে শান্ত করলেন। দুর্যোধনের এক ভাই বিকর্ণ বার বার সভার সকলকে বলতে লাগলেন, 'আপনারা দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিবাদ করুন, তা নইলে আমাদের সকলকে এই পাপের জন্য নরকে যেতে হবে।'

বিকর্ণের কথায় কেউ কান দিচ্ছেন না দেখে তিনি চীৎকার করে বললেন, 'মৃগয়া, মদ্যপান ও পাশা খেলা এই তিনটি রাজাদের নেশা। নেশার ঘোরে যুধিষ্ঠির যাজ্ঞসেনীকে পণ রেখেছিলেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব ও দ্রৌপদীর স্বামী সেক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির এই পাণ্ডব বধুকে বাজী রাখেন কোন্ অধিকারে?'

কর্ণ বিকর্ণকে ধমকে উঠলেন, 'বিকর্ণ তুমি ছেলেমানুষ, যা বোঝ না তা নিয়ে বড়দের মত কথা বলতে এসো না। সভার সবাই জানেন, শকুনি যুধিষ্ঠিরের সমস্ত ধন ঐশ্বর্য ও চার ভাই সহ দ্রৌপদীকে জয় করেছেন। দুঃশাসন যাও তুমি এই প্রকাশ্য সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কর।'

দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রের আঁচল ধরে গায়ের জোরে টানতে লাগলেন। অসহায় দ্রৌপদী লজ্জা থেকে রক্ষা পাবার জন্য দু'হাত জোড় করে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন, 'লজ্জাহারী মধুসূদন, রক্ষা কর। রক্ষা কর।'

তখন স্বয়ং মধুসূদন হরি বস্ত্রের রূপ ধরে দ্রৌপদীর দেহকে ঢেকে রইলেন। দুঃশাসনের টানাটানিতে সাদা এবং নানারকম রঙিন কাপড়ে সভাগৃহ ভরে গেলো কিন্তু দ্রৌপদীর শরীর কাপড়ে ঢাকা রইলো। দুঃশাসন ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

ভীম ভীষণ গর্জনে ঘোষণা করলেন, 'যদি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এই পাপী দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান না করি তবে অনন্ত নরকগামী হবো।'

ভীমের শপথ শুনে ধৃতরাষ্ট্র শিউরে উঠলেন।

দুর্যোধন অট্টহাস্যে দ্রৌপদীকে বললেন, 'পাঞ্চালী শোন, যুধিষ্ঠির যদি এই সভায় ঘোষণা করেন তিনি মিথ্যাবাদী এবং তিনি তোমার স্বামী নন তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দেবো।'

দ্রৌপদী এই কথা শুনে বিস্ফারিত চোখে দুর্যোধনের দিকে তাকালে দুর্যোধন তাঁকে নিজের নগ্ন উরু দেখিয়ে অপমান করলেন। ভীম তাই দেখে চীৎকার করে বললেন, 'দুর্যোধন, মহাযুদ্ধে গদার আঘাতে যদি তোমার ঐ উরু ভাঙ্গতে না পারি তাহলে আমার নরকেও যেন স্থান না হয়।' সেই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র মন্দিরের ভেতর একটি শৃগাল ডেকে উঠলো, গাধা, শকুন এবং কাক অশুভ চীৎকার করতে লাগলো। এতে সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ডেকে বললেন, 'মূর্খ', তুমি প্রকাশ্য সভায় রাজকুললক্ষ্মী দ্রৌপদীকে অপমান করেছো, তোমার পতনের আর দেরী

নেই।' তারপর তিনি দ্রৌপদীকে কাছে ডেকে বললেন, 'পাঞ্চালী, তুমি আমার পুত্রবধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তুমি লক্ষ্মী স্বরূপা। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো মা।'

দ্রৌপদী বললেন, 'পিতা, এই বর দিন যাতে নরশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দাসত্ব থেকে মুক্তি পান।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'তাই হবে। তুমি আরও বর চাও।'

দ্রৌপদী বললেন, 'ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব যেন দাসত্ব থেকে মুক্ত হন। আমার ছেলেদের যেন কেউ দাসপুত্র না বলতে পারে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'তাই হবে। কিন্তু মা গো, মাত্র দু'টি বর তোমার জন্য যথেষ্ট নয়। তুমি আরও বর চাও।'

যাজ্ঞসেনী উত্তর দিলেন, 'মহারাজ লোভে মানুষ ধর্মের পথ থেকে সরে যায়। আমার আর কিছু চাইবার নেই।'

সভার সকলে দ্রৌপদীকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের সাথে দেখা করলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে আশীর্বাদ করে সমস্ত ধন ঐশ্বর্য সহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাবার উপদেশ দিলেন।

পাণ্ডবেরা নির্বিঘ্নে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন দেখে দুঃশাসনের ক্ষোভের সীমা রইলো না। তারপর তিনি দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির সাথে পরামর্শ করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন, 'পিতা পাণ্ডবেরা আমাদের হাতে যে অপমানিত হয়েছেন তাতে শীগগিরই তাঁরা আমাদের সবংশে ধ্বংস করবে। ভীমের শপথও আপনি শুনেছেন।'

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা তাহলে কি করতে চাও?'

দুঃশাসন বললেন, 'আমরা আবার তাঁদের পাশা খেলায় হারিয়ে

নিঃস্ব করে দিতে চাই। এবারের খেলায় পণ হবে এই, যে পক্ষ হারবে তাদের বারো বছরের জন্য হরিণের চামড়া আর গাছের বাকল পরে গভীর বনে গিয়ে থাকতে হবে এবং তারপরও আরও এক বছর অজ্ঞাত বাস করতে হবে। এই অজ্ঞাতবাসের সময় যদি কেউ তাদের চিনতে পারে তাহলে আরও বারো বছর বনবাস করতে হবে। পিতা, আমরা যে পাশা খেলায় জয়ী হবো এতো জানা কথাই। এরপর তেরো বছর পরে আমরা যে ধন ও শক্তির অধিকারী হব তাতে পাণ্ডবেরা ফিরে আসার পর খুব সহজেই তাদের যুদ্ধে বিনাশ করতে পারবো।'

ধৃতরাষ্ট্র ছেলেদের চাপে পড়ে আবার পাণ্ডবদের পাশা খেলার জন্য আহ্বান জানাতে বাধ্য হলেন।

পুণ্যবতী গান্ধারী তাঁর স্বামীকে বললেন, 'দুর্যোধন পাপাত্মা এবং তার জন্য তোমার বংশ নাশ হবে জেনেও তুমি তার কথা মেনে নিলে কেন?'

অন্ধরাজা অসহায় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'নিয়তি! ছেলেরা যা ইচ্ছা তাই করুক। নিয়তির হাত থেকে তাদের রক্ষা করার শক্তি কার আছে!'

আবার দ্যূতক্রীড়া ও পাণ্ডবদের বনগমন

ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বান যুধিষ্ঠির প্রত্যাখান করতে পারলেন না। বিপদ ঘটতে চলেছে জেনেও তিনি ভাইদের ও কৃষ্ণাকে নিয়ে হস্তিনাপুর যাবেন বলে তৈরী হলেন। যাত্রার সময় ধর্মরাজের মুখ বিষণ্ণ, তবু

তিনি হাসতে চেষ্টা করে বললেন, 'বিপদ আসন্ন জেনেও আমাকে যেতে হচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্র জানতেন সোনার হরিণ কখনই বাস্তব নয়, তবু তিনি সোনার হরিণের পিছে ছুটেছিলেন। বিপদ সামনে এলেই বোধহয় মানুষের বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটে।'

যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের নিয়ে দ্যূতসভায় উপস্থিত হলে শকুনি তাঁকে এবারের খেলার শর্ত ও পণের কথা জানিয়ে খেলায় আহ্বান করলেন।

সভার সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে যুধিষ্ঠিরকে খেলতে নিষেধ করলে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার নীতি এই যে, পাশা খেলার আহ্বান কখনই ফিরিয়ে দেই না।'

খেলা শুরু হবার অল্পক্ষণের মধ্যেই শকুনির শঠতায় যুধিষ্ঠির হেরে গেলেন।

পাণ্ডবেরা রাজবেশ খুলে হরিণের চামড়া পরে বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দুঃশাসন নানারকম বাজে কথা বলে দ্রৌপদীকে অপমান করতে শুরু করলে ভীম বললেন, 'দুঃশাসন, জেনে রাখো যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার হৃদপিণ্ড আমি উপড়ে নেব।'

দুর্যোধন ভীমকে অনুকরণ করে বিশ্রীভাবে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন। ভীম তাকে এই বলে শাসালেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে আমার গদার আঘাতে তুমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।' এই কথা শুনে দুঃশাসন ভীমের চারদিকে নেচে নেচে তাঁকে 'গরু গরু' বলে গালি দিতে লাগলেন। এতে ভীম আরও রেগে বললেন, 'যুদ্ধে একদিন অর্জুন কর্ণকে, আর সহদেব শকুনিকে বধ করবে।' অর্জুন, সহদেব আর নকুল বললেন, 'ভীমের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই আমাদের দিয়ে পালিত হবে। পৃথিবী থেকে আমরা ধৃতরাষ্ট্রের বংশধরদের নাম মুছে দেব।'

যুধিষ্ঠির সভায় উপস্থিত গুরুজনদের কাছে বনগমনের অনুমতি চাইলে সবাই লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলেন। শুধু ধর্মাত্মা বিদুর পঞ্চপাণ্ডবকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে নানা উপদেশ দিলেন।

ওদিকে দ্রৌপদী রাজ অন্তঃপুরে কুন্তী ও অন্যান্য রানী রাজবধূদের কাছে বিদায় চাইলে সেখানে কান্নার রোল পড়ে গেলো। কুন্তী দ্রৌপদীকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'তুমি সর্বগুণে এবং বুদ্ধিতে লক্ষ্মীসমা, তোমাকে কোন উপদেশ না দিলেও তুমি মঙ্গলজনক কাজই করবে। আশীর্বাদ করি তোমাদের বনের জীবন শান্তিময় হোক।'

যুধিষ্ঠিরকে বিদুর বললেন, 'তোমাদের মা কুন্তীর জন্য কোন চিন্তা কোর না, তিনি আমার বাড়ীতে সম্মানের সাথেই থাকবেন।'

পাণ্ডবেরা কুন্তীকে প্রণাম করে দ্রৌপদীকে নিয়ে যাত্রা করলে নগরের অনেক লোক তাঁদের পেছনে পেছনে কাঁদতে কাঁদতে চললো। সেই সময় হঠাৎ করে দুর্যোধনের সভায় দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হয়ে বললেন, 'দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমের ও অর্জুনের অসীম শক্তিতে আজ থেকে চৌদ্দ বছর পর কৌরবেরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

এই কথা বলে নারদ যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ভীষণ ভয় পেয়ে দ্রোণাচার্যকে বললেন, 'আচার্য, আপনিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা। আমাদের রাজ্য ও জীবনের ভার আপনি গ্রহণ করুন।'

দ্রোণ বললেন, 'তোমরা আমার শরণাগত (আশ্রয় প্রার্থী) বলে আমি তোমাদের ত্যাগ করতে পারবো না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তোমাদের পক্ষ হয়ে আমার পুত্রের চেয়েও প্রিয় অর্জুনের সাথে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তবে এ কথাও ঠিক যে পাণ্ডবদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করার শক্তি আমারও নেই। আমার মৃত্যু যে দ্রুপদ

রাজার ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে হবে একথা জানা আছে। সে কৃষ্ণার ভাই, অবশ্যই সে পাণ্ডবদের পক্ষ নেবে। দুর্যোধন, তোমার এই সুখ আর ধন সম্পদ বড়ই ক্ষণস্থায়ী, কারণ চৌদ্দ বছর খুব অল্প সময়।

বনপর্ব

পাণ্ডবদের বনে বাস ও সূর্যের দেওয়া পাত্র

পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে চললেন। তাঁদের পুরোহিত ধৌম্য সামগান ও মন্ত্র পাঠ করতে করতে তাঁদের আগে চললেন।

যুধিষ্ঠির নগরের লোকদের মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বললে তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন। শুধু কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁদের শিষ্যদের নিয়ে পাণ্ডবদের পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন।

সন্ধ্যার সময় পাণ্ডবেরা গঙ্গার তীরে মহাবটবৃক্ষের নীচে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিলেন। ধৌম্য বটগাছের নীচে হোমাগ্নি (পূজার আগুন) জ্বেলে দিলেন। পাণ্ডবেরা সারারাত ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের নানারকম সৎ আলোচনা করে কাটালেন এবং সকলে জল ছাড়া আর কিছুই খেলেন না।

পরদিন সকালে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন, 'আমরা এখন নানা

দুর্গম বনে ঘুরবো, ফলমূল খেয়ে জীবন কাটাবো। আপনাদের তাতে কষ্ট হবে, আপনারা ঘরে ফিরে যান।'

ব্রাহ্মণেরা বললেন, 'রাজা আপনার কাছাকাছি থাকতে পারলে আমাদের কোন কষ্টই থাকবে না। তাছাড়া আমাদের খাবার আমরা নিজেরাই জোগাড় করে নেবো।'

যুধিষ্ঠির তখন পুরোহিত ধৌম্যকে বললেন, 'আমি রাজা হয়ে কি করে এই অনুগত ব্রাহ্মণদের দায়িত্ব বহন না করে পারবো? আপনি বলুন আমার কি করা উচিত?'

ধৌম্য বললেন, 'সূর্যের দয়াতেই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী অন্ন জল পেয়ে বেঁচে আছে। তুমি সূর্যদেবের সাহায্য প্রার্থনা কর।'

যুধিষ্ঠিরের পূজা ও স্তবে সুখী হয়ে সূর্যদেব তাঁর অপূর্ব উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'রাজা, তোমার আশা পূর্ণ হোক। তোমাদের বনবাসের বারো বছর আমি তোমাদের খাবার দেব।'

তারপর সূর্যদেব যুধিষ্ঠিরকে একটি তামার পাত্র দিয়ে বললেন, এই পাত্রে প্রতিদিন দ্রৌপদী তাঁর রান্নাঘরে বসে আমিষ নিরামিষ যা-ই রান্না করবেন তা ই দিয়েই এই পাত্র ভরে থাকবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রৌপদী নিজে উপোস থেকে সকলকে খাওয়াবেন ততক্ষণ পাত্রটি ভরে থাকবে, দ্রৌপদীর খাওয়া হবার সাথে সাথে সেদিনের মত পাত্র শূন্য হয়ে যাবে।'

সূর্যের বর লাভ করে যুধিষ্ঠির মহা আনন্দে ধৌম্যকে প্রণাম করলেন এবং দ্রৌপদীর হাতে তামার পাত্রটি তুলে দিলেন।

কিছুদিন পর পাণ্ডবেরা ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের নিয়ে কাম্যক বনে যাত্রা করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অস্থিরতা

পাণ্ডবেরা বনে যাবার দিন দেবর্ষি নারদ এসে যে কথা বলে গিয়েছিলেন সেই ভয়ংকর কথাগুলো চিন্তা করে ধৃতরাষ্ট্রের দিন দিন অস্থিরতা বাড়তে লাগলো। তিনি বিদুরকে ডেকে বললেন, 'তুমি জ্ঞানী ও পবিত্র মনের অধিকারী, আমাকে বলো কি করলে আমার মনে শান্তি আসবে।'

বিদুর বললেন, 'আপনি যদি মনে শান্তি পেতে চান তাহলে পাণ্ডবদের বন থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের নিজের রাজ্য সম্পদ সব ফিরিয়ে দিন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'কিন্তু দুর্যোধন এতে রাজী হবে না।'

বিদুর উত্তর দিলেন, 'তাহলে আপনার উচিত হবে দুর্যোধনকে ত্যাগ করা, আর শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের উচিত পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমা চাওয়া।'

বিদুরের কথায় ধৃতরাষ্ট্র বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বিদুর, মনে রেখো দুর্যোধন আমার বড় ছেলে, তাকে কেন আমি ত্যাগ করবো? আসলে তুমি পাণ্ডবদের দিকটাই চিরকাল বোঝ আর আমার ছেলেদের বিষচোখে দেখো। তুমি বরং পাণ্ডবদের সঙ্গেই থাকো গিয়ে, তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে।'

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে দুঃখে হতাশায় বিদুর একটি রথ নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে যাবেন বলে যাত্রা করলেন।

ওদিকে পাণ্ডবেরা স্বরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বনে এসে পৌঁছেছেন। ছায়া ভরা বড় বড় গাছে ঘেরা কাম্যক বনে সর্বক্ষণ পাখির কাকলী, লতায় পাতায় রঙিন ফুল, বাতাসে সেই বনফুলের সুবাস। সেই বনে পাণ্ডবেরা কুটির বেঁধে মুনি ঋষিদের সাথে বাস করছেন।

এমন সময় একদিন বিদুর এসে কাম্যক বনে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, এখন থেকে তিনি পাণ্ডবদের সাথেই থাকবেন। পাণ্ডবেরা বিদুরকে পেয়ে খুবই খুশি হলেন।

ধৃতরাষ্ট্র আসলে বিদুরকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন। বিদুর চলে যাওয়াতে দুঃখে তাঁর শরীর মন ভেঙ্গে যাচ্ছে দেখে সারথি সঞ্জয় রথ নিয়ে বিদুরের কাছে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা জানালেন।

বিদুর আর কি করবেন। পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার তাঁর দুর্বল চিত্ত, অন্ধভাই ধৃতরাষ্ট্রের কাছেই ফিরে এলেন।

বিদুরকে দেখে দুর্যোধনের রাগ আর বিরক্তির অবধি রইলো না। তিনি কর্ণ ও শকুনির কাছে বললেন, 'আমার সন্দেহ হয় বিদুর কোন একটা মতলব করে এসেছেন, শীগগিরই পাণ্ডবেরা ফিরে আসবে।'

এই কথা শুনে শকুনি বললেন, 'আসবে না। পাণ্ডবেরা আমাদের শত্রু হলেও তারা সত্যনিষ্ঠ। সত্য ভঙ্গ করে কখনই তারা ফিরে আসবে না।'

কর্ণ চীৎকার করে বললেন, 'আমার মতে কখনই শত্রুর শেষ রাখতে নেই। চল আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বনে গিয়ে পাণ্ডবদের বধ করে আসি।'

কর্ণের কথায় রাজী হয়ে দুর্যোধন, দুঃশাসন শকুনি সবাই ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়াই রথ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হতে লাগলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁর দিব্যদৃষ্টির বলে সব জানতে পেরে ধৃতরা-

ষ্ট্রের কাছে বললেন, 'তোমাদের কপটতার শিকার হয়ে পাণ্ডবেরা রাজ্য হারিয়ে বনবাসী হয়েছে। এতে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। আবার তোমার পাপাত্মা ছেলে তাদের হত্যা করার জন্য কাম্যক বনে যাত্রা করছে। মনে রেখো, পাণ্ডবদের হাতে কাম্যক বনে তার মৃত্যু ঘটবেই।'

ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবকে বললেন, 'প্রভু, আপনি নিজেই আমার নির্বোধ ছেলেকে উপদেশ দিন।'

ব্যাস বললেন, 'খুব শিগগীরই ঋষি মৈত্রেয় কাম্যক বন থেকে এখানে আসবেন, তিনিই তোমার ছেলেকে উপদেশ দেবেন।'

ব্যাসদেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মুনি শ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় হলে ধৃতরাষ্ট্র তার সেবা যত্নের সবরকম ব্যবস্থা করলেন।

মৈত্রেয় বললেন, মহারাজ আপনি ও ভীষ্ম বেঁচে থাকতে কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে এই বিরোধ হওয়া উচিত নয়। তারপর তিনি দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন, 'কুমার, তুমি মহাবীর একথা আমি জানি। তবু তোমার কল্যাণের জন্যই বলছি পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধের কথা তুমি কল্পনাতেও এনো না। কারণ তাঁরা প্রত্যেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী, সবার ওপরে জনার্দন কৃষ্ণ তাঁদের সহায়। কাম্যক বনে ভয়ংকর রাক্ষস কির্মীরকে ভীম যে রকম অবহেলা ভরে বধ করেছে তাতে বোঝা যায় ভীমের মত শক্তিমান পৃথিবীতে আর কেউ থাকা অসম্ভব।'

মৈত্রেয়র কথা শুনে দুর্যোধন ব্যঙ্গভরে হেসে উঠে নিজের উরুতে চপেটাঘাত করলেন। ঋষি মৈত্রের দুর্যোধনের এই অবজ্ঞায় রাগে রক্তচক্ষু হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন, 'তোমার এই অহংকারের ফল

অবশ্যই পাবে, মহাযুদ্ধে ভীমের গদার আঘাতে তোমার ঐ উরু ভেঙ্গে যাবে।'

ধৃতরাষ্ট্র অনেক অনুনয় বিনয় করেও মৈত্রেয়েকে প্রসন্ন করতে পারলেন না।

মৈত্রেয় চলে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, 'তুমি কি ভীমের কির্মীর রাক্ষস বধ করা দেখেছো?'

বিদুর বললেন, 'না মহারাজ, ভীমের সেই বীরত্বের দৃশ্য আমি দেখিনি তবে কাম্যক বনের মুনি ঋষিদের মুখে যে বর্ণনা শুনেছি তাই বলছি।—পাণ্ডবেরা প্রথম যখন কাম্যক বনে পৌঁছুলেন তখনই এক ভীষণ চেহারার রাক্ষস তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ালো। রাক্ষসের দু'চোখ রক্তের মত লাল, মাথায় রুক্ষ চুল, হাতের জ্বলন্ত কাঠে আগুন দাউ দাউ করছে। তার ভীষণ গর্জনে বনের পশু পাখিরা পালাতে লাগলে, দ্রৌপদী ভয়ে মূর্ছা গেলেন, পুরোহিতেরা কাঁপতে কাঁপতে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির রাক্ষসকে বললেন, 'কে তুমি? কি চাও?'

রাক্ষস উত্তর দিলো, 'আমি বক রাক্ষসের ভাই কির্মীর। আমার ভাইয়ের হত্যাকারী ভীমকে আমি বধ করে তার রক্ত দিয়ে স্নান করবো, তোমাদের সকলের হাড় মাংস চিবিয়ে খাবো।'

ভীম ততক্ষণে বিরাট এক গাছ উপড়ে নিয়েছেন। রাক্ষসের কথা শেষ হবার আগেই ভীম সেই গাছ দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলেন, রাক্ষসও ভীমের দিকে বজ্রের মত জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিলো। ভীম বাম পায়ে লাথি মেরে সেই জ্বলন্ত কাঠ রাক্ষসের দেহেই ছিটকে দিলেন। রাক্ষস বিকট গর্জন করে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ভীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই ভীম তাকে প্রচণ্ড লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিলেন

এবং পায়ের চাপে পিষে মারলেন। মহারাজ, কাম্যক বনে ঢোকার পথে আমি সেই ভয়ংকর রাক্ষসের মৃতদেহ দেখেছি।

কাম্যক বনে কৃষ্ণের আগমন

পাণ্ডবদের রাজ্যহারা হয়ে বনবাসের খবর পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সাথে কাম্যক বনে দেখা করতে এলেন। তাঁর সাথে ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক দেশের রাজারা, দ্রৌপদীর ভাইরা এবং চেদিরাজ ধৃষ্ট কেতুও এলেন।

কৃষ্ণ বনবাসী পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করে বললেন, 'মহাযুদ্ধে দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ধর্মরাজকে আবার সম্রাটের আসনে বসাবো এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের পরাজয় ও লাঞ্ছনার কথা শুনে ভীষণ রাগে শ্রীকৃষ্ণের চোখে ধ্বংসের আগুন জ্বলে উঠতে দেখে অর্জুন তাকে শান্ত করে বললেন, 'প্রিয় মাধব, শান্ত হও। আমি ব্যাসদেবের কাছে শুনেছি স্বয়ং শূলপানি মহাদেবের ললাট থেকে তোমার জন্ম, তুমিই নারায়ন হরি, ব্রহ্মা, সূর্য, চন্দ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী। এই ক্রোধ তোমাকে সাজে না।'

কৃষ্ণ বললেন, 'পার্থ, তুমি আর আমি একই আত্মা, একই প্রাণ। যে তোমার শত্রু তাকে ধ্বংস করাই আমার ধর্ম।'

কৃষ্ণ যখন তাঁর প্রিয় সখী দ্রৌপদীর সাথে দেখা করতে এলেন দ্রৌপদী অশ্রুজলে ভেসে বললেন, 'মাধব, ব্যাসদেব বলেছেন, তুমি দেবতাদেরও দেবতা। তাই আমার সমস্ত দুঃখ তোমাকেই জানাই।

আমি মহাবীর পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী, বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বোন, সবার উপরে তোমার প্রিয় সখী। তবু কেন দ্যূতসভায় সবার সামনে আমাকে এত অপমান সইতে হলো? মধুসূদন, সেইদিন থেকে পৃথিবীতে আমি একা। আমার স্বামী নেই, পুত্র নেই, ভাই নেই, বাবা নেই, এমন কি তুমিও নেই।'

কৃষ্ণ মধুর স্বরে বললেন, 'প্রিয় সখি, তুমি শান্ত হও। যারা তোমাকে অপমান করেছে শীগগিরই রণক্ষেত্রে তাদের রক্তাক্ত শরীর ধূলোয় লুটাবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তুমিই হবে পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ধর্মরাজ, আমি যদি সেই সময় দুরাত্মা রাজা শাল্বকে দমন করার জন্য দ্বারকা ছেড়ে না যেতাম তাহলে কখনই ধৃতরাষ্ট্রকে দ্যূতসভার আয়োজন করতে দিতাম না। কৃষ্ণাকে অপমান করার আগেই পাপিষ্ঠদের আমার হাতে মৃত্যু হতো।'

কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর কাছে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে সঙ্গে করে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর ছেলেদের পাঞ্চাল রাজ্যে এবং চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু তাঁর বোন করেনুমতীকে (নকুলের একজন স্ত্রী) নিয়ে চেদিরাজ্যে চলে গেলেন।

কিছুদিন পর পাণ্ডবেরা কাম্যক বন থেকে অন্য বনে যাবেন ঠিক করলেন। দ্বৈতবন খুব মনোরম জায়গা, সেখানে বহু হরিণ, ফল ও ফুল পাওয়া যায় শুনে সেই বনেই বারো বছর কাটিয়ে দেবেন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনের ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বৈত বনে চলে গেলেন।

একদিন মহামুনি মার্কণ্ডেয় দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের আশ্রমে অতিথি হলেন। তিনি পাণ্ডবদের সেবা নিতে নিতে হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে হাসলেন।

যুধিষ্ঠির দুঃখিত হয়ে বললেন, 'মুনিবর, আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য সব মুনিঋষিরাই ব্যথিত হন, শুধু আপনি কেন খুশি হলেন প্রভু?'

মার্কণ্ডেয় বললেন, 'বৎস যুধিষ্ঠির আমি তোমার মধ্যে দশরথের পুত্র রাজা রামচন্দ্রের মত একজন সত্যনিষ্ঠকে দেখার সুযোগ পেয়ে সুখী হয়ে হাসছি। রামচন্দ্র ও তোমার মতই সত্যপালনের জন্য রাজ-সুখ ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন। আমি জানি তুমিও একদিন রামচন্দ্রের মতই রাজ্য ও সম্মান ফিরে পাবে।'

দ্রৌপদীর ক্ষোভ

নিজের অপমানের নানা স্মৃতি ও পাণ্ডবদের বর্তমান দুর্দশা দ্রৌপদীর কাছে দিন দিন অসহ্য হয়ে ওঠায় একদিন তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'মহারাজ পৃথিবীর সম্রাট হয়েও যেদিন তুমি ভিখারীর বেশে বনে যাত্রা করলে সেদিন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলো। সম্রাট জীবনে তুমি মহামূল্যবান পোষাক পরতে, দেবভোগ্য সব খাবার খেতে। তোমার ভাইয়েরাও তোমার মতই বিলাস ও সুখ ভোগ করতো। আর আজ তোমরা ভিখারীরও অধম জীবন যাপন করছো, আর আমি বীর পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী পাঞ্চালের রাজকন্যা আমারই বা কি দশা! এ সবই তো ঘটেছে তোমার জন্য। অথচ তোমার ভাই ভীম অর্জুন ইচ্ছা করলেই শক্তি বলে কৌরবদের মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারেন। রাজা, যে ক্ষত্রিয় অপমানের প্রতিশোধ নেয় না সে তো ক্ষত্রিয় নামের যোগ্যই নয়।'

কৃষ্ণার তীক্ষ্ণ বাক্যের উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, 'যাজ্ঞসেনী, তুমি পরম বুদ্ধিমতী, তবে জেনে রেখো, রাগকে বুদ্ধি দিয়ে জয় করাই তেজস্বীতার লক্ষণ।'

দ্রৌপদী রেগে উত্তর দিলেন, 'তাই যদি হয়, তুমি ধর্মজ্ঞ ও মহা বুদ্ধিমান হয়েও কেন পাশা খেলার মত পাপ নেশায় মজলে? আর এই যদি বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহলে আমি মোটেই বিধাতার প্রশংসা করতে পারছি না।

যুধিষ্ঠির ধীর ভাবে বললেন, 'তোমার কথা ও যুক্তি শুনতে ভালো হলেও এসব হচ্ছে নাস্তিকের অভিমত। কল্যাণী, ভুল করেও কখনও বিধাতার নিন্দা কোর না।'

দ্রৌপদী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমি ধর্ম বা ঈশ্বরের নিন্দা করতে চাইনে, বেশী দুঃখেই হয়তো এমন কথা বলে ফেলেছি।'

কিন্তু ভীম ভীষণ রাগে চীৎকার করে উঠলেন, 'আমরা রাজ্য সুখ ত্যাগ করে এই ভিখারীর জীবনই বা মেনে নেবো কেন? আপনার শাসন মেনে নিয়ে সিংহ হয়েও আমরা নীচ শৃগাল দুর্যোধনের অপমান সহ্য করেছি। কিন্তু তাতে কি লাভ হয়েছে? সর্বক্ষণ ধর্ম ধর্ম-করে আপনি আপনার ক্ষত্রিয় তেজ হারিয়ে ক্লীবের পর্যায়ে পড়েছেন।'

যুধিষ্ঠির ভীমের কটু কথাতেও উত্তেজিত হলেন না। আরও শান্ত সুরে বললেন, 'তুমি আমাকে যে কটু বাক্য বললে তা আমার প্রাপ্য। আমারই অন্যায়ের জন্য আজ তোমরা সকলে দুঃখ ভোগ করছো। আমি দুর্যোধনের রাজ্য জয় করার ইচ্ছাতেই পাশা খেলতে নেমেছিলাম। কিন্তু ধূর্ত শকুনির কপটতার জন্য বাজীতে হেরে সর্বস্ব হারিয়ে আমরা দুর্যোধনের দাস হয়েছিলাম। পাঞ্চালীর দয়াতে মুক্তি পাবার

পর আবার যখন আমি দ্বিতীয় বার নিজের নীতি পালনের জন্য পাশা খেলতে নামলাম তখন কেন তোমরা বাধা দিলে না ? তোমাদের তো সে অধিকার ছিলো। আজ আর আমাকে তিরস্কার করে লাভ কি ? তার চেয়ে ভবিষ্যতের জন্য ধৈর্য ধর।'

ভীম রেগে বললেন, 'আর ধৈর্য ধরার চেয়ে মৃত্যুকেই আমি ভালো বলে মনে করছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুর্যোধনদের সঙ্গে এখন আমাদের যুদ্ধে নামার বাধা কোথায় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'প্রিয় ভীম, বাধা আমাদের সত্যনিষ্ঠায়। তাছাড়া রাজসূয় যজ্ঞের জন্য দিগ্‌বিজয় করার সময় যেসব রাজাদের আমরা পরাজিত করেছি তাঁরা অনেকেই এখন কৌরবদের পক্ষে। কৌরবদের প্রতিটি ভাই-ই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তার ওপর তাঁদের পক্ষে আছেন অভেদ্য কবচধারী বীর কর্ণ। আর এদিকে আমরা লোকবলহীন, অর্থ সম্পদ সৈন্য সামন্তহীন। এ অবস্থায় তাদের আক্রমণ করা কি আমাদের উচিত হবে ?'

ভীম বিষন্ন হয়ে চুপ করে রইলেন।

হঠাৎ একদিন ব্যাসদেব দ্বৈতবনে এসে যুধিষ্ঠিরকে গোপনে বললেন, 'ধর্মরাজ, আমি তোমাকে 'প্রতিস্মৃতি' নামে একটি মন্ত্র দিচ্ছি, যার প্রভাবে অর্জুন তোমাদের সবার জন্য অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করবে। অর্জুনকে এই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে তুমি তাকে দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য পাঠিয়ে দাও। আর তোমরা এই বন ছেড়ে অন্য বনে গিয়ে বাস কর। তপস্বীদের জন্য এক বনে বেশীদিন থাকা নিরাপদ নয়। তাছাড়া এতে বনের হরিণ, গাছপালা ইত্যাদিরও ক্ষতি হয়।'

যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ব্যাস দেবের সবকথা বলে প্রতিস্মৃতি মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন এবং উপদেশ দিলেন, 'সব্যসাচী, তোমারই ওপর

আমাদের সমস্ত ভবিষ্যত নির্ভর করছে। পিতামহ ব্যাসের এই মন্ত্রের সাহায্যে কঠোর তপস্যা করে তুমি ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, কুবের ও যমের সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ কর।'

অর্জুনের যাত্রা ও দিব্যাস্ত্র লাভ

পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী আবার কাম্যক বনের আশ্রমে ফিরে এলেন। সেখানে পূজা এবং মাঙ্গলিক কাজ সেরে অর্জুন যাত্রার জন্য তৈরী হলেন।

দ্রৌপদী করুণ সুরে অর্জুনকে বললেন, 'প্রিয় ফালগুনী, আমাদের সবার সুখ-দুঃখ জীবন মরণ এখন তোমার হাতে। তোমর কল্যাণ হোক, তুমি জয়ী হও।'

অর্জুন হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্বত পার হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক শীর্ণ ও কালো দেহ সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন, 'কে তুমি? এই শান্তির তপোবনে অস্ত্র হাতে কেন এসেছো? এখনই অস্ত্র ফেলে দাও।'

অর্জুন অস্ত্র হাতে নিয়ে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দেখে সন্ন্যাসী হেসে উঠে বললেন, 'পার্থ, আমি ইন্দ্র। তোমার কল্যাণ হোক, বল কি তোমার প্রার্থনা?'

অর্জুন ইন্দ্রকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু, আমাকে সব রকমের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র দান করুন, আর কিছু চাই না।'

ইন্দ্র বললেন, 'অর্জুন আমি জানি তুমি মহৎ উদ্দেশ্যেই অস্ত্র

চাইছো। তবে তুমি তপস্যা দিয়ে যখন ভূতনাথ শিবের দেখা পাবে তখন সমস্ত দিব্য অস্ত্র তোমাকে দেবো।'

অর্জুন এক ঘোর বনে শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করছেন এই সংবাদ পেয়ে শিব এক রূপবান তরুণ কিরাতের (ব্যাধ) রূপ ধরে তীর ধনুক নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। দেবী উমাও তাঁর সখী-দের নিয়ে কিরাত মেয়ের সাজে এলেন। শিবের অনুচর ভূতপ্রেতরা-ও এলো তাঁদের পিছু পিছু। মুহূর্তে সমস্ত বন যেন থমথমে হয়ে গেলো। পাখির গান, ঝর্ণার শব্দ সব থেমে গেলো। অর্জুন দেখলেন, বিরাট একটি বন্যবরাহ তার দিকে ছুটে আসছে। অর্জুন সেই বরাহের দিকে বাণ ছুঁড়লেন। তখুনি কিরাতের বাণ গিয়ে বরাহের শরীরে বিঁধলো।

অর্জুন কিরাতকে বললেন, 'রূপবান তরুণ, তুমি মৃগয়ার নিয়ম জানো না? আমার শিকারকে তুমি কেন বাণ মারলে?'

কিরাত হাসতে হাসতে বললেন, 'আমরা এই বনেই থাকি, তোমার ভয় নেই তুমি এখানে যত খুশি তপস্যা করতে পারো।'

অর্জুন কিরাতের কথায় রেগে কিরাতের দিকে শর বর্ষণ করলেন। আশ্চর্য! তাঁর তূণীরের সব শর শেষ হয়ে গেলো কিন্তু কিরাত অক্ষত দেহেই রইলো। অর্জুন ভীষণ রাগে তার মাথায় খড়্গ দিয়ে আঘাত করলে খড়্গ ছিটকে গেলো এবং কিরাত অর্জুনকে এতো জোরে চেপে ধরলো যে অর্জুন অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে অর্জুন শিবের করুণা লাভ করার জন্য শিবের মূর্তি গড়ে পূজা করতে লাগলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর পূজার সমস্ত ফুল ঐ সোনারবরণ যুবক কিরাতের মাথায় গিয়ে পড়ছে। অর্জুন তখনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে কিরাতরূপী শূলীশম্ভু শিবের

পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

মহাদেব অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'পার্থ, পূর্বজন্মে তুমি নারায়ণের সহচর হয়ে অযুত বৎসর তপস্যা করে তোমার নিজের তেজে জগৎকে রক্ষা করেছিলে। বল কি তোমার প্রার্থনা?'

অর্জুন বললেন, 'দেবশ্রেষ্ঠ, আপনার ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র আছে তাই আমাকে দান করুন।'

মহাদেব অর্জুনকে সেই ভয়ংকর শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র দান করে তার প্রয়োগের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন এবং তাঁকে স্বর্গে যাবার আদেশ দিয়ে উমাকে নিয়ে অদৃশ্য হলেন।

তখুনি বরুণ, কুবের, যম এবং ইন্দ্রাণীকে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন।

যম তাঁর 'দণ্ড', বরুণ তাঁর 'পাশ' এবং কুবের তাঁর 'অন্তর্ধান' অস্ত্র অর্জুনকে দান করলেন।

ইন্দ্র বললেন, 'কৌন্তেয়, তোমাকে স্বর্গে যেতে হবে, সেখানেই তোমাকে সব দিব্য অস্ত্র দান করব।'

ইন্দ্রের সারথি মাতলি আকাশ আলোকিত করে রথ নিয়ে উপস্থিত হলে অর্জুন স্বর্গযাত্রা করলেন।

অর্জুন অমরাবতীতে এলে দেবতা, গন্ধর্ব, মহর্ষিরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। ইন্দ্র তাঁকে সাদরে নিজের সিংহাসনে বসালেন। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতি অনন্ত যৌবনা অপরূপা নর্তকীরা নৃত্য-গীতে সভা মুখর করে তুললেন।

ইন্দ্রের কাছে নানারকম অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করতে পার্থের পাঁচ বছর কেটে গেল। ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে তিনি নৃত্য গীত বাদ্যও শিখলেন।

এই সময়ে অপরূপা উর্বশী অর্জুনের রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে নিজের অনুরাগের কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু অর্জুন তাঁকে মাতৃ সম্বোধন করে তাঁর চরণে প্রণত হয়ে বললেন, আপনি আমার কাছে কুন্তী ও শচীদেবীর (ইন্দ্রের স্ত্রী) মত মাতৃতুল্য।

উর্বশী ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হয়ে অভিসম্পাত করলে অর্জুন অবিচল রইলেন। অর্জুনের এই পবিত্র সংযমের কাহিনী যুগে যুগে কালে কালে অক্ষয় হয়ে দেবতা ও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে রইল।

পাণ্ডবেরা মনোকষ্টে কাম্যক বনে কালাতিপাত করছিলেন। ভীম এই নির্বাসিত জীবনে অধৈর্য হয়ে প্রায়ই ক্ষুব্ধ ভাব প্রকাশ করেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েও তাঁকে খুশি করতে পারেন না।

এমন সময় মহর্ষি বৃহদশ্ব কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের অতিথি হলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের মনোকষ্ট ও মন্দ ভাগ্যের কাহিনী শুনে বললেন, ধর্মরাজ তুমি বলছ, তোমার চেয়ে দুঃখী কোন রাজা নেই, কিন্তু আমি তোমাকে তোমার চেয়েও দুঃখী এক রাজার কথা বলব। তাঁর নাম নল ও তাঁর স্ত্রীর নাম দময়ন্তী। এই বলে বৃহদশ্ব মুনি নল রাজার দুঃখ, ত্যাগ, তিতিক্ষার এক বিরাট উপাখ্যান শোনালেন। পরিশেষে বললেন, নল রাজার মত তুমিও দ্যূত ক্রীড়ার ফলে দুঃখ ভোগ করছো, তিনি যেমন পুণ্যবলে সমস্ত দুঃখকে জয় করে রাজ্যশ্রী ফিরে পেয়েছিলেন তুমিও তাই পাবে। আর আমি সমগ্র পাশা খেলার গূঢ় নিয়ম রহস্য জানি তাই তোমাকে দান করলাম, এরপর আর কেউ তোমাকে পাশা খেলায় পরাজিত করতে পারবে না।

বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করলেন।

লোমশ মুনির আগমন

অর্জুনের বিরহে পাণ্ডবেরা বিষণ্ণ হয়ে কাম্যক বন ত্যাগ করে অন্য কোন বনে যাবার কথা ভাবছেন এরকম সময়ে দেবর্ষি নারদ এসে তাঁদের তীর্থ পর্যটন করার উপদেশ দিলেন এবং বললেন, মহাযোগী লোমশ মুনি আসবেন, তোমরা তাঁকে পথ নির্দেশক হিসাবে সঙ্গী করে তীর্থ যাত্রা কর।

তারপর লোমশ মুনি এসে ইন্দ্রলোকের সংবাদ পরিবেশন করবেন বললে পাণ্ডবেরা ও অন্যান্য সকলে তাঁকে ঘিরে বসলেন।

লোমশ মুনি বললেন, 'ইন্দ্রলোকে পার্থ সকলের আদর ও সম্মানের সঙ্গে বাস করছেন। তিনি মহাদেবের কাছ থেকে ব্রহ্মশির নামে একটি দুর্ধর্ষ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র লাভ করেছেন। যম, বরুণ, কুবের ও ইন্দ্র তাঁকে বহু দিব্যাস্ত্র দান করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র খবর দিয়েছেন, অর্জুন এখন আর একটি মহৎ কাজ শেষ করে তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। ইন্দ্র এ কথাও বলেছেন, মহাবীর কর্ণের তুলনায় অর্জুন এখন বহুগুণ শক্তিমান, তাছাড়া কর্ণের কবচকুণ্ডল ইন্দ্র শীগগিরই হরণ করবেন।'

যুধিষ্ঠির লোমশ মুনিকে তীর্থ যাত্রার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এই যাত্রা হতে হবে লঘু। অর্থাৎ বেশী লোকজন ও জিনিষ-পত্র সঙ্গে নেবে না, আমি তোমাদের নিত্যসঙ্গী থাকব এবং বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করব।

যুধিষ্ঠির তখন তাঁর অনুচর ও ব্রাহ্মণদের অনুরোধ করলেন, যাঁরা কষ্ট সহিষ্ণু নন এবং দৈহিক ভাবে দুর্বল তাঁরা বাড়ী ফিরে যান। তখন অনেকেই দুঃখিত মনে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

ঋষি অগ্যস্তের মাহাত্ম্য কথা

পাণ্ডবেরা নৈমিষারণ্য প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করে অগ্যস্তের আশ্রম মণিমতী পুরীতে এলেন। লোমশ মুনি তাঁদের ঋষি অগ্যস্তের সম্বন্ধে এই কাহিনী বললেন, ঋষি অগ্যস্ত ছিলেন অসীম ক্ষমতাবান ও দিব্যশক্তি সম্পন্ন। তিনি বিদর্ভ রাজার মেয়ে লোপামুদ্রাকে বিবাহ করে তপোবনে বাস করতেন। বহুকাল আগে এই মণিমতী পুরীতে ইল্বল নামে এক দানব বাস করত, তার ভাইয়ের নাম ছিল বাতাপি। ইল্বল কোন কারণে ব্রাহ্মণদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ হত্যার প্রতিজ্ঞা নেয়। সে তার বাড়ীতে ব্রাহ্মণদের অতিথি হিসাবে ভোজন করাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতো এবং তার ভাই বাতাপিকে মন্ত্রবলে ছাগলে পরিণত করে কেটে রান্না করে তাঁদের খাওয়াতো। তারপর উচ্চস্বরে 'ভাই বাতাপি' বলে ডাকতেই বাতাপি ব্রাহ্মণের পেট ভেদ করে বের হয়ে আসতো। এইভাবে ইল্বল বহু ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছে জেনে অগ্যস্ত একদিন তিনজন রাজাকে সঙ্গী করে ইল্বলের অতিথি হলেন। ইল্বল যথারীতি বাতাপিকে ছাগলে রূপান্তরিত করে তাকে কেটে রান্না করে অগ্যস্ত ও তাঁর সঙ্গীদের ভোজন করালেন। অগ্যস্ত অতিথি রাজাদের না দিয়ে একাই সমস্ত মাংস খেলেন। তারপর ইল্বল বার

বার 'ভাই বাতাপি ভাই বাতাপি' বলে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো। কিন্তু বাতাপি বের হলো না। অগ্যস্ত তখন সহাস্যে বললেন, 'দানব ইল্বল, আমি তোমার ভাইকে হজম করে ফেলেছি। আর সে বের হতে পারবে না।'

ইল্বল ভীত হয়ে হাতজোড় করে বলল, 'মহামুনি বলুন কি পেলে আপনি সুখী হন?'

অগ্যস্ত বললেন, 'আমি সর্বত্যাগী ঋষি, আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবে আমার স্ত্রী রাজকন্যা, সে ধনরত্ন আশা করে। আমরা জানি তুমি মহাধনী। অন্যের ক্ষতি না করে আমাকে ও এই রাজাদের যতটা পারো ধনসম্পদ দাও।'

ইল্বল তখন তাদের প্রত্যেককে প্রচুর ধনরত্ন ও গরু দান করলো। এ ছাড়াও অগ্যস্তকে একটি স্বর্ণের রথ ও দু'টি বলবান ঘোড়া দিলো।

লোমশ মুনি আরও বললেন, 'সত্যযুগে কালেয় নামে একদল দুর্দান্ত দানব ছিলো, তারা বৃত্রাসুর নামে ভয়ংকর দানবের সহায়তায় দেবতাদের আক্রমণ করে। এরা দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে তাড়িত হয়ে সমুদ্রের নীচে আশ্রয় নিয়েছিল। দিনের বেলায় দানবেরা সাগর-তলে লুকিয়ে থাকত, রাত্রিবেলা উঠে এসে তপস্বী ব্রাহ্মণদের বধ করতো। তখন দেবতারা ঋষি অগ্যস্তের শরণাপন্ন হলে অগ্যস্ত দেব-তাদের সঙ্গে সমুদ্রতীরে এসে সমুদ্রের সুবিশাল জলরাশি নিঃশেষে পান করে ফেললেন। দানবেরা পালাবার পথ না পেয়ে দেবতাদের হাতে নিহত হল। তখন দেবতারা অগ্যস্তকে অনুরোধ করলেন, যে জল তিনি পান করেছেন তা উগরে দিয়ে সমুদ্র পূর্ণ করে দিতে। কিন্তু অগ্যস্ত বললেন, সে জল আমি হজম করে ফেলেছি। ব্রহ্মা তখন দেবতাদের আশ্বাস দিলেন, বহুকাল পর রাজা ভগীরথ আবার

সমুদ্রকে জলপূর্ণ করবেন।

লোমশ মুনি এরপর অগ্যস্ত মুনির আর একটি উপাখ্যান বললেন, 'একদিন বিন্ধ্যপর্বত সূর্যকে বলল উদয় ও অস্তকালে তুমি যেমন মেরু-পর্বত প্রদক্ষিণ কর এখন থেকে আমাকেও তাই করবে। সূর্যদেব বললেন, আমি যা করি বিধাতার নির্দেশে করি, তোমার ইচ্ছায় কিছু হবে না। এতে বিন্ধ্য ক্রুদ্ধ হয়ে মাথা এমন উঁচু করে বেড়ে উঠতে লাগলো যে চন্দ্র সূর্যের পথ রোধ হয়ে সৃষ্টি অন্ধকারে ডুবে যাবার উপক্রম হল। দেবতারা অগ্যস্তের শরণ নিলেন।

অগ্যস্ত তাঁর পত্নী লোপা মুদ্রাকে নিয়ে বিন্ধ্যের সামনে দাঁড়াতে বিন্ধ্য নতশির হয়ে তাঁকে প্রণাম জানালো। অগ্যস্ত তাকে নির্দেশ দিলেন, আমি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করছি, ফিরে না আসা পর্যন্ত আর তুমি মাথা তুলো না। অগ্যস্ত দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। বিন্ধ্য পর্বত মাথা নত করেই রইল। চন্দ্র সূর্যের পথও চির উন্মুক্ত হয়ে গেল।'

এরপর লোমশ মুনি মগর রাজা ও ভগীরথের উপাখ্যান বর্ণনা করলেন। ভগীরথের গঙ্গা আনবার বিচিত্র কাহিনী শুনে পাণ্ডবেরা বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন।

পাণ্ডবেরা নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং ঋষভকূট পর্বত পেরিয়ে কৌশিকী নদীর তীরে এলেন। সেখানে বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রম। কিছুদিন কৌশিকী নদীর তটে বিশ্রাম নিয়ে পাণ্ডবেরা গঙ্গাসাগর সঙ্গম, কলিঙ্গ দেশের বৈতরণী নদী প্রভৃতি তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন। মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরাম নামে মহামানবের সাথে সাক্ষাতের জন্য যুধিষ্ঠির অপেক্ষা করতে লাগলেন। চতুর্দশী তিথিতে মহাত্মা পরশুরাম পঞ্চপাণ্ডবকে দর্শন দিলেন ও তাঁর অনুরোধে যুধিষ্ঠিরেরা

এক রাত্রি মহেন্দ্র পর্বতে কাটিয়ে পরদিন প্রভাতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা গোদাবরী নদী, দ্রাবিড় দেশ, অগ্যস্ত তীর্থ, সুর্পারক তীর্থ প্রভৃতি ভ্রমণ করে সুবিখ্যাত প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হলেন।

কৃষ্ণ ও বলরামের আগমন

পাণ্ডবদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে সাক্ষাৎ করতে এলেন। পাণ্ডবদের ধূলি মলিন দেহ, পরণে জীর্ণ অজিন (হরিণের ছেড়া চামড়া) দেখে তাঁরা দুঃখ পেলেন। বিশেষ করে নীলোৎপল তুল্য দ্রৌপদীর কষ্ট ভোগ তাঁদের কাছে বেদনাদায়ক বলে মনে হলো।

রূপবান বলরাম বললেন, 'মহাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্মাচার করে আজ বনবাসের ক্লেশ ভোগ করছেন, আর দুরাত্মা দুর্যোধন মহাসুখে পৃথিবী শাসন করছেন, এই দেখে সাধারণ লোকে মনে করবে ধর্মের চেয়ে অধর্মের আচরণই ভালো। আমার বিস্ময় জাগছে এই ভেবে ধর্মপুত্রের এই কষ্ট ভোগ আর দুর্যোধনের শ্রীবৃদ্ধি দেখে লজ্জায় দুঃখে পৃথিবী বিদীর্ণ হচ্ছেন না কেন?'

মহাবীর সাত্যকি বললেন, 'বলরাম এখন বিলাপের সময় নয়, যুধিষ্ঠির তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করুন আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব। চলুন আজই আমরা অর্থাৎ বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি যদুবংশের বীরেরা সসৈন্যে যাত্রা করি, দুর্যোধনকে যমালয়ে পাঠিয়ে তাঁর রাজ্য পাণ্ডবদের দেই। যুধিষ্ঠির যদি সিংহাসনে বসতে না চান

তাহলে তাঁদের বনবাসের কাল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অর্জুন নন্দন অভিমন্যু রাজ্যশাসন করবে।'

কৃষ্ণ বললেন, 'সাত্যকি, যা নিজ বাহুবলে বিজিত হয়নি তেমন রাজ্য যুধিষ্ঠির নেবেন না, তাঁর ভাইরাও ও তাঁর মতকেই সমর্থন করবেন। দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণাও স্বধর্ম ত্যাগ করবেন না।'

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথায় খুশি হয়ে বললেন, 'একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে যথার্থ জানেন, প্রিয় সাত্যকি, পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যখন মনে করবেন বল প্রকাশের সময় এসেছে তোমরা তখন দুর্যোধনকে বধ কোর।'

যাদবেরা চলে গেলে যুধিষ্ঠির তাঁর ভাই ও অন্যান্যদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁরা পুন্যতোয়া পয়োষ্ণী নদী পার হয়ে নর্মদার কাছে বৈদুর্য পর্বতে উপস্থিত হলেন। লোমশ মুনি বললেন 'এই পুন্য তীর্থে মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তাঁর দেহ বল্মীক, (উঁই পোকা) পিপীলিকা ও লতাগুল্মে সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলো।'

পাণ্ডবেরা বহু নদনদী, পর্বত, ভুখণ্ড দেখে গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হতে লাগলো, দুর্গম সেই তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথে চলতে গিয়ে দ্রৌপদী মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। পাণ্ডবগণ তাঁকে হরিণের চামড়ার ওপর শুইয়ে সেবা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিব পাঞ্চালীর সমস্ত দুঃখ দুর্দশার মুল নিজেকে ভেবে বিলাপ করতে লাগলেন এবং ভীমকে প্রশ্ন করলেন, 'এই দুর্গম পথে কৃষ্ণাকে আমরা কিভাবে বয়ে নিয়ে যাব?'

ভীম স্মরণ করা মাত্র মহাবাহু ঘটোৎকচ সেখানে এসে করজোড়ে বললেন, 'আজ্ঞা করুন পিতা।' ভীম বললেন, 'প্রিয় বৎস, তোমার মা পরিশ্রান্ত হয়েছেন তুমি এঁকে বয়ে নিয়ে চল।'

ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে কাঁধে তুলে নিলেন, তাঁর অনুচর রাক্ষসেরা তুলে নিল পঞ্চপাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের। তারপর তারা আকাশ পথে ছুটলো ঘটোৎকচের পেছনে পেছনে। শুধু মাত্র লোমশ মুনি তপোবলে উজ্জ্বল জ্যোতিস্কের মত তাদের সাথে আকাশ মার্গে এগিয়ে চললেন।

বদরিকা আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সকলে রাক্ষসদের কাঁধ থেকে নেমে পড়লেন। আশ্রমের মুনি ঋষিরা তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে যথাবিধি আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

দুর্গম বনের মধ্যে খুব মনোরম এক জায়গায় বদরিকা আশ্রম। বিরাট বিরাট বদরী তরুর (কুল বা বরই গাছ) পাশ দিয়ে ভাগীরথী নদী আপন আনন্দে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। বনের ঝোপঝাড়গুলো বন ফুলের রং ও সুবাসে অপরূপ। ফলের গাছগুলো রসালো ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে, শাখায় শাখায় পাখিদের মধুর কলকাকলী। দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবেরা সেই সুন্দর বনে উপবনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

অর্জুনের প্রতীক্ষায় পাণ্ডবেরা ছয়দিন বদরিকা আশ্রমে রয়েছেন। এর মধ্যে একদিন উত্তর দিক থেকে হাওয়ায় উড়ে একটি পদ্মফুল দ্রৌপদীর কাছে এসে পড়লো। এক হাজার পাপড়ির পদ্মটির যেমন রং তেমনি সুগন্ধ দ্রৌপদী ভীমকে পদ্মটি দেখিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে এরকম আরও পদ্ম আর পদ্মের লতা এনে দাও, এই পদ্মলতা আমি কাম্যক বনের সরোবরে লাগাবো।'

ভীম ধনুর্বাণ হাতে পদ্মবনের সন্ধানে চললেন।

ভীম মনোহর গন্ধমাদন পর্বতের ধার ঘেঁষে বনের ডালপালা ঠেলে, কলাবন ভেঙ্গেচুরে চলতে লাগলেন। তাঁর লক্ষ্য সহস্র পাপড়ি পদ্মফুলের সরোবর।

হনুমান সংবাদ

পবনদেবের ছেলে বীর হনুমান গন্ধমাদন পর্বতের কাছেই ছিলেন। আবার ভীমও কিন্তু পবনদেবের আশিসেই কুন্তীর গর্ভে জন্মেছেন। সে হিসাবে তিনি হনুমানের ভাই। তবে হনুমানের সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয় নি।

হনুমান বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ভাই ভীম স্বর্গের পথে চলেছেন, শীগগিরই তাঁর প্রাণ সংশয় ঘটবে। তাঁকে রক্ষা করার জন্য হনুমান বিরাট শরীরটা নিয়ে পথের ওপর আড় হয়ে শুয়ে পড়ে লেজ আছড়াতে লাগলেন। লেজের সেই ভীষণ শব্দে ভীম চমকে এগোতে গিয়েই বাধা পেলেন। দেখলেন সোনালী রংয়ের বিশাল এক হনুমান তাঁর পথ আটকে শুয়ে রয়েছে। ভীম গর্জন করে পথ ছেড়ে দিতে বললে হনুমান তাঁর কটা চোখ মিট মিট করে হেসে বললেন, 'ভাই, আমি একে বুড়ো, তায় অসুস্থ। কেন আমাকে ডাকাডাকি করছো? তুমি কে?'

নিজের পরিচয় দিয়ে ভীম বললেন, 'তুমিই বা কে? আমার পথই বা তুমি কেন আটকেছো?'

হনুমান উত্তর দিলেন, দেখতেই তো পাচ্ছো আমি বানর। তবে তুমি এই পথে যেও না। মানুষ এ পথে গেলে নির্ঘাৎ তার মৃত্যু হবে। আর যদি যেতেই চাও তবে আমাকে ডিঙ্গিয়ে যাও।'

ভীম বললেন, 'সমস্ত জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের অংশ আছে, তাই

তোমাকে ডিঙ্গিয়ে আমি ঈশ্বরকে অপমান করতে চাই না। তা নইলে মহাবীর হনুমান যেমন করে লাফ দিয়ে সাগর পার হয়েছিলেন আমিও তেমনি করে লাফ দিয়ে তোমার মস্ত শরীরটাকে পেরিয়ে যেতাম।'

হনুমান প্রশ্ন করলেন, 'কে সেই হনুমান?' ভীম উত্তর দিলেন, 'তিনি পবনের পুত্র এবং আমার বড় ভাই, মহাগুণবান ও শক্তিমান। এবার দয়া করে পথ ছাড়ো।'

হনুমান বললেন, ভাই আমি বড়ই বুড়ো, হাঁটতে পারি না। তুমি বরং আমার লেজটি সরিয়ে চলে যাও।'

ভীম বিরক্ত হয়ে ঠিক করলেন এই অবাধ্য বানরের লেজ ধরে ঘুরিয়ে যমের ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও হনুমানের লেজ তিনি এক চুলও নড়াতে পারলেন না, তখন হনুমানের সামনে দু'হাত জোড় করে বললেন, 'কপিশ্রেষ্ঠ, আমাকে ক্ষমা করুন বলুন আপনি কে?'

হনুমান নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, রামচন্দ্র রাজ্যলাভ করার পর আমাকে এই বর দিয়েছিলেন যে, যতদিন এ জগতে তাঁর নাম থাকবে ততদিন আমি বেঁচে থাকবো। ভাই ভীম, এই পথে মানুষের যাওয়া চলেনা বলেই আমি তোমার পথ আটকেছিলাম। তুমি যে সহস্রদল পদ্মের জন্য এসেছো সেই পদ্মবন বেশী দূরে নয়। তবে বড় ভাই হিসাবে আমার উপদেশ কুবেরের সেই পদ্মফুলের বন থেকে তুমি জোর করে ফুল তুলো না।'

ভীম বললেন, 'আপনার ভাই হতে পেরে আমি ধন্য। আমার প্রার্থনা, সমুদ্র লঙ্ঘনের সময় আপনি যে বিশাল দেহধারণ করেছিলেন আপনার সেই রূপ আমাকে দেখান।'

হনুমান ভীমের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। ভীম সেই বিন্ধ পর্বতের

মত দেহ দেখে বললেন, 'আপনার এতো ক্ষমতা ! তবে কেন রামচন্দ্র-কে এত সৈন্য নিয়ে কষ্ট করে যুদ্ধ করতে হলো ? আপনি একাই তো রাবণকে পরাজিত করতে পারতেন।'

হনুমান উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই তা পারতাম। কিন্তু তাতে বীর-শ্রেষ্ঠ রামের গৌরব ক্ষুণ্ণ হতো।'

হনুমান তাঁর দেহকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে বিদায় নিলেন।

ভীম হনুমানের দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে এগিয়ে এক কাচ স্বচ্ছ জলের নদী তীরে উপস্থিত হলেন। সেই নদীর বুকে অসংখ্য সহস্র পাপড়ি পদ্মফুল ফুটে রয়েছে, বিচিত্র রংয়ের হাঁস ও জলচর পাখিরা আনন্দে জলকেলি করছে। আর পদ্মবনের চারদিকে বিকট চেহারার সব রাক্ষসেরা পাহারা দিচ্ছে।

হরিণের চামড়া পরা অপূর্ব রূপবান এক সন্ন্যাসীকে ধনুর্বাণ হাতে সাহসী পদক্ষেপে আসতে দেখে রাক্ষসেরা তাঁর পরিচয় এবং এখানে আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলো।

ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, 'আমি আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্য এই পদ্ম নিতে এসেছি।'

প্রহরীরা জানালো, 'এই নদী ও পদ্মের বাগান কুবেরের। কুবেরের অনুমতি ছাড়া কোন মানুষ এখানে আসতে পারে না। তাঁর অনুমতি না নিয়ে পদ্ম তুলতে গেলে তোমাকে মরতে হবে।'

ভীম জবাব দিলেন, 'আমি ক্ষত্রিয়বীর, কারুর অনুমতি নিয়ে কাজ করা আমার নীতি বিরুদ্ধ, তাছাড়া কুবের তো এখানে নেই, অতএব আমি জলে নামছি।'

ভীমকে জলে নামতে দেখে রাক্ষসেরা তাঁর দিকে অস্ত্র নিয়ে ছুটে

এলো। চোখের নিমেষে ভীম তাদের মেরে ফেললেন, কেউ কেউ ছুটে পালিয়ে গেলো কুবেরকে খবর দিতে। ভীম তখন জলে নেমে অমৃতের মত জলপান করলেন এবং পদ্মফুলের গাছ এবং ফুল সংগ্রহ করলেন।

পরাজিত রাক্ষসদের কাছে সংবাদ শুনে কুবের খুশী হয়ে বললেন, 'আমি সব জানি। ভীম কৃষ্ণার জন্য যত খুশী পদ্ম নিন, তোমরা বাধা দিও না।'

ওদিকে সেই সময়ে বদরিকা আশ্রমে ভীষণ ধূলিঝড় উঠলো এবং আরও অনেক দুর্লক্ষণ দেখা দিল। বিপদের আশংকায় যুধিষ্ঠির ভীমকে খুঁজলেন। দ্রৌপদী জানালেন, ভীম তাঁর জন্য সহস্র দল পদ্ম আনতে গেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, 'নিশ্চয়ই ভীম বিপদগ্রস্ত, আমরা এই মুহূর্তে সেখানে যাবো।'

তখন ঘটোৎকচ তাঁর অনুচরদের সাহায্যে সবাইকে বহন করে পদ্ম নদী তীরে নিয়ে এলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমকে এভাবে রাক্ষসদের নিহত করার জন্য তিরস্কার করলেন। ইতিমধ্যে কুবেরের অন্যান্য রক্ষীরা এসে যুধিষ্ঠিরদের প্রণাম করে কুবেরের শুভেচ্ছা জানালো।

এরপর পাণ্ডবেরা আরও কিছুদিন গন্ধমাদনের সানুদেশে কাটিয়ে বদরিকা আশ্রমে ফিরে গেলেন।

জটাসুর নামে এক রাক্ষস ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে বদরিকা আশ্রমে বাস করছিলো। একদিন ভীম ও ঘটোৎকচের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাণ্ডবদের সমস্ত অস্ত্র চুরি করে পালাতে গিয়ে জটাসুর সহদেবের হাতে ধরা পড়লো। তখন সে বিকট রাক্ষসের রূপ ধারণ করে সহদেবের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো। যুদ্ধ চলাকালে ভীম এসে উপস্থিত হলেন। ভীমের গদার আঘাতে জটাসুর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে পাণ্ডবদের বনবাসের চার বৎসর পার হয়েছে। যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের ডেকে বললেন, অস্ত্র শিক্ষার জন্য ইন্দ্রলোকে যাবার সময় অর্জুন বলেছিলো বনবাসের পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ হলে কৈলাস পর্বতে সে আমাদের সাথে আবার মিলিত হবে।

যুধিষ্ঠিরেরা সবাই এবং লোমশ মুনি ও অনুচর ব্রাহ্মণেরা ঘটোৎকচ ও তাঁর অনুচরদের সাহায্যে হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতের কাছে রাজর্ষি বৃষ পর্বার আশ্রমে এলেন। সেখানে সাত রাত্রি পরম আনন্দে কাটিয়ে অনুচর ব্রাহ্মণদের ও অতিরিক্ত জিনিস পত্র বৃষ পর্বার কাছে রেখে যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ও ভাইদের নিয়ে লোমশ মুনি ও ধৌম্যের নির্দেশে কৈলাসে যাত্রা করলেন। পথে তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতে রাজর্ষি আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে আশ্রয় নিয়ে অর্জুনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আর্ষ্টিসেনের আশ্রমের পরিবেশ বড় সুন্দর। পাণ্ডবেরা সেখানে একমাস কাটাবার পর একদিন দেখলেন, আকাশ আলোকিত করে ইন্দ্রের বিমান আসছে। মাতলি সে বিমানের চালক, ভেতরে ফুলের মালা গলায় ও মাথায় রত্ন মুকুট পরে অপূর্ব রূপ নিয়ে অর্জুন বসে আছেন।

বিমান থেকে নেমে অর্জুন ধৌম, যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম করলেন। এবং নকুল সহদেবকে আলিঙ্গন করলেন।

মাতলি পাণ্ডবদের কাছ থেকে যথেষ্ট সেবা-যত্ন লাভ করে বিমান নিয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন।

পার্থ দ্রৌপদীকে ইন্দ্র ও শচীদেবীর দেওয়া মহামূল্যবান অলংকার ও বসনগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। তারপর তাঁর ভাই ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসে ইন্দ্রলোকের জীবন ও অস্ত্র

শিক্ষার বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন।

পরদিন সকালে দিব্য বিমানে ইন্দ্র পাণ্ডবদের কাছে এলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'তুমি পৃথিবীর সম্রাট হবে। অর্জুন সব রকমের অস্ত্রলাভ করেছেন এবং আমার হৃদয় জয় করেছেন। ত্রিভুবনে অর্জুনের সমান বীর আর কেউ নেই, কেউ হবেও না। আমার উপদেশ তোমরা এখন কাম্যক বনে গিয়ে বাস কর।'

ইন্দ্র চলে যাবার পর যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অর্জুন ইন্দ্রলোক থেকে পাওয়া দিব্যাস্ত্রগুলোর প্রয়োগ দেখাতে গেলে হঠাৎ সেখানে অলৌকিক ভাবে দেবর্ষি নারদ এসে বললেন, 'পার্থ তুমি বৃথা এই দিব্যাস্ত্র গুলি প্রয়োগ কোরনা, এতে মহাদোষ হয়। এসব অস্ত্রের প্রয়োগ হবে যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন মহাযুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুন শত্রুদের ধ্বংস করবেন।'

ভীম ও অজগর

বনবাসের এগারো বৎসর চলছে এমন সময় অর্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমরা দুরাত্মা দুর্যোধনকে বধ করিনি, সমস্ত সুখ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে ভিখারীর মত জীবন যাপন করছি। এরপর আরও এক বছর আমাদের অজ্ঞাত বাস করতে হবে। আমাদের মনে হয় এই গন্ধমাদন পর্বতে বিশ্রামে সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার।'

যুধিষ্ঠির গন্ধমাদন পর্বত ত্যাগ করতে রাজী হলে ঘটোৎকচ তাঁর অনুচরদের নিয়ে সকলকে কাঁধে করে বয়ে বিশাখযূপ নামে এক বনে এলেন। সেখান থেকে ঘটোৎকচ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ এবং বাড়তি লোকজনকে যুধিষ্ঠির বিদায় দিলেন।

বিশাখা যূপের গাছপালাগুলো ঘন সবুজ পাতা আর সুবাসিত ফুলে সুন্দর। সুস্বাদু ফলের গাছগুলো পাণ্ডবদের খাবার জোগাতে লাগলো। এ ছাড়া বনে প্রচুর হরিণ, বরাহ মহিষ ইত্যাদি পশু ভীমকে মৃগয়ার জন্য উৎসাহিত করলো। প্রায়ই তিনি মৃগয়ায় গিয়ে আনন্দে শিকার করতে লাগলেন।

একদিন ভীম মৃগয়ায় গিয়ে পর্বতের গুহার কাছে গেছেন এমন সময় হলুদ রংয়ের বিচিত্র নকসা আঁকা এক বিশাল সাপ তাঁকে পেঁচিয়ে ধরলো। ভীম তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন, নাগের শক্ত চাপে ও বিষনিঃশ্বাসে তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে এলে তিনি কাতরভাবে বললেন, 'হে মহাভুজঙ্গ, আপনি কে? পাণ্ডু-পুত্র মহাবাহু ভীমকে এভাবে পাশবদ্ধ করতে যে কেউ পারবে না।'

অজগর বলল, 'আমি রাজর্ষি নহুষ, ঋষি অগ্যস্তের অভিশাপে সাপ হয়েছি। বহুকাল আমি ক্ষুধার্ত আছি, এখন তোমাকে খাবো।'

ভীম করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি নিজের প্রাণের জন্য ভাবিনা, কিন্তু আমার মৃত্যু হলে আমার ভাইরা এবং মা কুন্তী দেবী শোকে কষ্ট পাবেন।'

ভীমের মৃগয়া থেকে ফিরতে দেরী দেখে যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে সাথে নিয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হলেন। পর্বত গুহার কাছে এসে ভীমের অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির সাপকে বললেন, 'মহাসর্প, আপনি অনুগ্রহ করে আমার ভাইকে মুক্তি দিন, আমরা আপনাকে প্রচুর পরিমাণে অন্য

বার দেব।'

সাপ বলল, আমি একে ছেড়ে দিতে পারি যদি তুমি আমার শ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পার। তোমাকে দেখে আমার বুদ্ধিমান ধার্মিক বলে মনে হচ্ছে।'

যুধিষ্ঠির সাপের প্রস্তাবে সম্মত হলে সাপ প্রশ্ন করলো, 'বল, ক্ষণ কে? আর জ্ঞাতব্য কি?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'সত্য, দান, ক্ষমা, দয়া, অহিংসা, তপস্যা সচ্চরিত্র যাঁর গুণাবলী তিনিই ব্রাহ্মণ। আর সুখদুঃখহীন পরম-ন যাঁকে লাভ করলে শোক থাকে না তিনিই জ্ঞাতব্য।'

সাপ বললেন, 'এই সব গুণাবলী তো শূদ্রেরও থাকতে পারে।'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'যাঁর মধ্যে এই গুণাবলী আছে তিনি দ্র নন, ব্রাহ্মণ। আর যে ব্রাহ্মণ নামধারীর মধ্যে এই গুণ নেই কে শূদ্রই বলা উচিত।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে সাপ খুশি হয়ে ভীমকে মুক্তি দিলেন এবং লেন, 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, আপনিই আমার মুক্তিদাতা। আমার অতি ক্ষত্য ও অহংকারের জন্য ঋষি অগ্যস্তের অভিশাপে আমি স্বর্গভ্রষ্ট য় সাপের জীবন যাপন করছি। আমার প্রার্থনায় অগ্যস্ত বলেছি-ন, যদি কখনও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ পাও তাহলে তুমি পমুক্ত হবে।'

এই বলে নহুষ সাপের দেহ ত্যাগ করে দিব্যদেহে মিলিয়ে লেন।

যুধিষ্ঠির ও ধৌম্য ভীমকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন।

মহাতপা মার্কণ্ডেয়র উপদেশামৃত

বিশাখ যূপ বনে বর্ষা ও শরৎকাল কাটিয়ে পাণ্ডবেরা আবার কাম্যক বনে এলেন। এরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁর স্ত্রী সত্যভামাকে সঙ্গে করে পাণ্ডবদের সাথে দেখা করতে এলেন। সেই সময়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের অতিথি হলেন। এই মুনির বয়স বহু হাজার বছর হলেও দেখতে অপূর্ব রূপবান যুবকের মত। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'মহাঋষি, আমরা আপনার মুখে পুণ্যবান লোকের কথা শুনতে চাই। দেবতা ও ঋষিদের পবিত্র কাহিনী শুনতে চাই।'

মার্কণ্ডেয় একে একে বৈবস্বত মনু ও মৎস্যের উপাখ্যান, পরীক্ষিৎ ও মণ্ডুক রাজকন্যার কাহিনী, দীর্ঘায়ু বকঋষি, যযাতি ও শিবি রাজার কাহিনী বললেন। নারীর মহিমার উপাখ্যান হিসেবে বললেন কৌশিক ও শোভানার কথা।

যুধিষ্ঠির তখন মার্কণ্ডেয়কে বললেন, 'প্রভু, আমার চেয়ে হতভাগ্য কোন রাজার কথা কি আপনার জানা আছে?'

মার্কণ্ডেয় বললেন, 'অযোধ্যায় ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দশরথের ছেলে তাঁর পিতার সত্য পালনের যে দুঃখভোগ করেছিলেন তার তুলনা নেই। তাঁর জীবনের কাহিনী শোন:

রাজা দশরথের চার ছেলে রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। রাম তাঁর বড় রাণী কৌশল্যার ছেলে, মেজ রাণী কৈকেয়ীর ছেলে ভরত, ছোট রাণী সুমিত্রার দুই ছেলে লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন।

বৃদ্ধ দশরথ যখন বড় ছেলে রামকে রাজা করবেন বলে ঘোষণা করলেন তখন মেজ রাণী কৈকেয়ী তাঁকে বহুদিন আগের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই বর আদায় করলেন যে তাঁর ছেলে ভরত রাজা হবেন এবং রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে। পিতৃভক্ত ছেলে রাম পিতার সত্য পালনের জন্য বনে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন তাঁর স্ত্রী সীতা ও ছোট ভাই লক্ষণ।

এদিকে ছেলের শোকে দশরথের মৃত্যু হলো। ভরত তাঁর মায়ের হীন লোভের জন্য রাগ করে সিংহাসনে বসলেন না। তিনি ঋষি বশিষ্ঠকে সাথে করে চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে রামকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। রাম কিছুতেই রাজ্যে ফিরে এলেন না। তখন ভরত দুঃখিত মনে অযোধ্যায় ফিরে রামের পায়ের এক জোড়া খড়ম সিংহাসনে রেখে নিজে মাটিতে বসে রাজ্য চালাতে লাগলেন।

কিছুদিন পর রাম লক্ষণ ও সীতাকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে এসে কুটির বেঁধে বাস করতে লাগলেন। সেখানে একদিন লংকার অনার্য রাজা রাবণের বোন শূর্পণখা বেড়াতে এসে লক্ষণের রূপে মুগ্ধ হয়ে লক্ষণকে বিয়ে করতে চাইলেন। লক্ষণ তাঁকে অপমান করে তাঁর নাক কেটে দিলেন। অপমানিতা শূর্পণখা তাঁর ভাই রাবণের কাছে গিয়ে বনবাসী মানুষের এই স্পর্ধার কথা বলে বিচার চাইলেন। বোনের অপমানের শোধ নেবার জন্য রাবণ দণ্ডকারণ্যে এলেন। সেখানে তিনি সীতাকে সোনার হরিণ দেখিয়ে ভুলিয়ে রাম লক্ষণের অনুপস্থিতির সুযোগে সীতাকে জোর করে নিজের পুষ্পকরথে (উড়ন্ত রথ) তুলে লংকায় এনে অশোক বনে বন্দী করে রাখলেন।

পাখিদের রাজা জটায়ুর কাছে রাম লক্ষণ জানতে পারলেন লংকার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। তাঁরা বানর রাজা সুগ্রীব

ও মহাবীর হনুমানের সাহায্যে সমুদ্র পার হয়ে কিস্কিন্ধ্যার বিরাট বানর সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাবণের রাজ্য আক্রমণ করলেন। রাবণ অন্যায়ভাবে সীতাকে হরণ করেছেন বলে তাঁর ভাই বিভীষণ রামের পক্ষ নিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পরম ধার্মিক রামের জন্য তাঁর নিজের রথ ও সারথি মাতলিকে পাঠিয়ে দিলেন।

ইন্দ্রের রথে চড়ে দেবতাদের অসীম অনুগ্রহ ও বানর সেনাদের সাহায্যে রামচন্দ্র রাবণকে পরাজিত করলেন। যুদ্ধে রাবণ নিহত হলেন। রাম বিভীষণকে লংকার সিংহাসনে বসালেন।

বিভীষণ অশোক বন থেকে সীতাকে এনে রামের হাতে তুলে দিলে রাম সীতাকে বললেন, সীতা আমি রাবণের হীন কাজের প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে যুদ্ধে হারিয়ে বধ করেছি। কিন্তু একজন অনার্য পুরুষ তোমাকে হরণ করে বন্দী করে রেখেছিলো, আমি ধর্মজ্ঞ মানুষ হয়ে কি করে তোমাকে আমার ধর্মপত্নী হিসাবে ফিরিয়ে নেবো?'

এই কথা শুনে সীতা লজ্জায় অপমানে জ্বলন্ত আগুনের চিতায় প্রবেশ করে সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষা দিলেন এবং দেবতারা সীতাকে পরম সতী বলে ঘোষণা করলেন। রামচন্দ্র তখন সীতাকে গ্রহণ করলেন।

ইতিমধ্যে চৌদ্দ বছর কেটে গেছে। ভরত সসম্মানে রামকে ফিরিয়ে এনে অযোধ্যার সিংহাসনে বসালেন।

সারা পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাবৎসল রাজা হিসাবে রামচন্দ্রের তুলনা ছিলো না। তবু তিনি আরও অনেক দুঃখ ভোগ করেছিলেন। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী রাক্ষসের ঘরে বন্দিনী ছিলেন বলে প্রজারা সীতাকে বনবাসে দেবার দাবী জানালে তিনি প্রজাদের সুখী করার জন্য গর্ভবতী সীতাকে বনবাসে পাঠালেন।

বনে সীতা ঋষি বাল্মিকীর আশ্রমে ঠাঁই পেলেন এবং সেখানে তাঁর যমজ ছেলে হলো। বাল্মিকী ছেলে দু'টির নাম রাখলেন, লব ও কুশ।

রাম অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন খবর পেয়ে বাল্মিকী সীতা ও লব-কুশকে নিয়ে অযোধ্যায় এলেন। দীর্ঘদিন পর সীতাকে ও এই প্রথম বালক লব কুশকে দেখে রামের বুক আনন্দে ভরে গেলো। বাল্মিকীর মুখে সীতার চরিত্রের পবিত্রতার কথা শুনে রাম সীতাকে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে তাঁর সতীত্বের প্রমাণ দেবার জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললো। অভিমানিনী সীতা এতে লজ্জায় অপমানে ধরিত্রীর কাছে আশ্রয় চাইলেন। মাটি ফেটে গেলো. চিরদুঃখিনী সীতা পাতালে প্রবেশ করলেন।

রাম আমৃত্যু স্ত্রীর জন্য শোকের আগুনে পুড়েও প্রজাদের সুখের জন্য রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন।

রামের উপাখ্যান শেষ করে মার্কণ্ডেয় বললেন, 'ধর্মরাজ, রামের জীবনের দুঃখভোগের কাহিনী শুনে তুমি নিশ্চয়ই নিজের দুঃখকে সহজ বলে মনে করবে।'

তখন যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমার এবং ভাইদের দুঃখের কথা ভেবে আমি যত না কষ্ট পাই তার চেয়ে বেশী দুঃখ পাই দ্রৌপদীর জন্য। মুনিবর, দ্রৌপদীর মত পতিব্রতা কোন মেয়ের কাহিনী কি আপনার জানা আছে?'

মার্কণ্ডেয় তখন মদ্রদেশের রাজা অশ্বপতির পরমা সুন্দরী ও সতী সাধ্বী মেয়ে সাবিত্রীর নাম করে বললেন, 'এই মেয়ের দ্যুমৎসেন নামে এক বনবাসী রাজার ছেলে সত্যবানের সাথে বিয়ে হয়েছিলো। অশ্বপতি তাঁর মেয়েকে অনেক মূল্যবান অলংকার ও কাপড়-চোপড়

দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সবই সাবিত্রী ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর বনবাসিনী শাশুড়ির মত গেরুয়া কাপড় পরে স্বামীর সাথে বনে জঙ্গলে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। সাবিত্রীর সেবায় তাঁর শ্বশুর শাশুড়িও খুব খুশি হলেন।

সাবিত্রী আগে থেকেই জানতেন তাঁর স্বামীর আয়ু কম এবং অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁকে বিধবা হতে হবে। এজন্য সব সময়ে তিনি স্বামীকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতেন।

একদিন সাবিত্রী সত্যবানকে নিয়ে বনে ফলমূল ও ফুল আনতে গেছেন, হঠাৎ সেখানে যমরাজ সত্যবানের প্রাণ নেবার জন্য উপস্থিত হলে সত্যবান জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সাবিত্রী দেখলেন, তাঁর সামনে রক্তলাল পোষাক পরা সূর্যের মত উজ্জ্বল এক বিশাল পুরুষ। তিনি বললেন, সাবিত্রী, আমি যমরাজ। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ, আমি তার আত্মা নিয়ে চলে যাবো, তুমি এর দেহের সৎকারের ব্যবস্থা করো।

যম সত্যবানের আত্মা নিয়ে যাত্রা করলে সাবিত্রী তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। যম অনেক অনুরোধ করেও তাঁকে কিছুতেই ফেরাতে পারলেন না। তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে বললেন, সাবিত্রী তুমি আমার কাছে বর চাও, আমি তোমাকে বর দিচ্ছি তাই নিয়ে ফিরে যাও। বুদ্ধিমতী সাবিত্রী বললেন, 'প্রভু, আমাকে এই বর দিন যেন আমি সত্যবানের স্ত্রী থেকে শতপুত্রের মা হই।'

যম বললেন, 'তাই হবে।'

সাবিত্রী করুণ হেসে বললেন, 'দেবতা আপনি সবই জানেন, তবে কি করে আমাকে সত্যবানের শতপুত্রের মা হবার আশীর্বাদ করলেন? আমি পতিব্রতা নারী, বিধবা হবার পর আমার জীবনে কি করে

আপনার আশীর্বাদ সফল হবে ?'

যম সাবিত্রীর বুদ্ধি ও স্বামীপ্রেম দেখে মুগ্ধ হয়ে সত্যবানের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে আরও একটি বর চাইতে বললেন।

সাবিত্রী বললেন, 'আমার শ্বশুর অন্ধ এবং রাজ্যহারা হয়ে বনে বাস করছেন। আপনি তাঁর রাজ্য ও দৃষ্টি লাভ করার শক্তি ফিরিয়ে দিন।'

যম বললেন, 'কল্যাণী তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

সাবিত্রী স্বামীকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর শ্বশুর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। পরদিন প্রভাতেই শাল্বদেশের প্রজারা এসে রাজর্ষি দ্যুমৎসেনকে জানালো যে তাঁর মন্ত্রী শত্রুদের বিনাশ করে সিংহাসন উদ্ধার করেছেন।

দ্যুমৎসেন রাজ্যে ফিরে সত্যবানকে সিংহাসনে বসালেন। সাবিত্রী শতপুত্রের মা হলেন।'

মার্কণ্ডেয় বললেন, 'মহারাজ এই পরম পুণ্যবতী সাবিত্রীর উপাখ্যান যে ভক্তিভরে শোনে তার মহাপুণ্য হয়।'

গন্ধর্বরাজের হাতে দুর্যোধনের লাঞ্ছনা

ঋষি মার্কণ্ডেয় চলে যাবার পর পাণ্ডবেরা আবার দ্বৈতবনে এসে সরোবরের ধারে কুটির বেঁধে বাস করতে লাগলেন। সেই সময়ে শকুনি একদিন হস্তিনাপুরের প্রাসাদে বসে দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, তুমি এখন পরম সুখে রাজ্য ভোগ করছো, ওদিকে পাণ্ডবেরা বনে গিয়ে

ভিখিরীর জীবন যাপন করছেন। তাঁদের এই দুর্দশা একবার নিজের চোখে দেখে তৃপ্তিলাভ করাটা কি দরকার নয়? তোমার স্ত্রীরাও একবার দামী কাপড় ও অলংকারে সেজে দ্রৌপদীর দীনহীন রূপটা দেখে এলে কেমন হয়?

শকুনির এই প্রস্তাবে দুর্যোধন খুবই খুশি হলেন। তবে তাঁর সন্দেহ হলো তাঁদের এই ইচ্ছাকে ধৃতরাষ্ট্র মোটেই পছন্দ করবেন না।

তারপর শকুনি ও কর্ণের সংগে পরামর্শ করে দুর্যোধন ঠিক করলেন তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলবেন, দ্বৈত বনের কাছে তাঁদের যে গোপপল্লী (গোয়ালা পাড়া) আছে সেই গোপেরা রাজা দুর্যোধনকে দেখতে চায়, তাছাড়া বছরের এই সময়টা গরুদের গণনা করা এবং বাছুরদের গায়ে চিহ্ন দেবার সময়, এখন একবার দুর্যোধনদের সেখানে যাওয়া দরকার।

ধৃতরাষ্ট্র সব শুনে বললেন, 'মৃগয়া করা, গোধন দেখতে যাওয়া খুবই ভালো কাজ। তবে দ্বৈত বনে পাণ্ডবেরা আছেন। অর্জুন ইন্দ্রলোক থেকে অসীম শক্তি ও দিব্যাস্ত্র লাভ করেছেন, ভীমের তোমাদের ওপর ভীষণ রাগ। আমার মনে হয় দুর্যোধনের সেখানে নিজে না যাওয়াই ভালো।'

দুর্যোধন বললেন, 'পাণ্ডবদের কাছে যাওয়ার রুচি আমার হয় না। আমি নিজের কাজেই দ্বৈত বনে যেতে চাই।'

ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমতি দিলে দুর্যোধন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন বিরাট আয়োজনের সাথে দ্বৈতবনে যাত্রা করলেন। তাঁদের সাথে তাঁদের স্ত্রীরা তো গেলেনই, তা ছাড়াও শত শত নর্তকী, গায়ক, বাদ্যকার, দাস-দাসী ও বিরাট সৈন্যদল, রথ, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি চললো।

দ্বৈতবনের কাছা-কাছি এসে দুর্যোধনের আদেশে তাঁর লোকেরা সেখানে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী করলেন। দুর্যোধন ও তাঁর প্রিয় সঙ্গীরা সেই বাড়ীতে থেকে গোয়ালাদের পাঠানো দুধ, দই, ছানা এবং নানারকম মিষ্টান্ন খেয়ে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতে লাগলেন।

এই সময়ে কুবের ভবন থেকে গন্ধর্বরাজ চিত্র সেন জল ক্রীড়ার জন্য দ্বৈতবনের সরোবরে এসে দুর্যোধনের লোকদের সরোবরের কাছ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এই খবর শুনে দুর্যোধন বিরাট এক সৈন্যদল গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

গন্ধর্বরাজ দুর্যোধনের ঔদ্ধত্যে ভীষণ রেগে তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিলেন কৌরবসেনাদের ধ্বংস করে তাদের রাজাকে সপরিবারে বন্দী করে আনতে। তুমুল যুদ্ধ হলো। দুর্যোধনেরা হেরে গিয়ে গন্ধর্বদের হাতে বন্দী হলেন। কিছু কিছু সৈন্য পালিয়ে গিয়ে পাণ্ডবদের কাছে হাজির হলো। ভীম তাদের মুখে দুর্যোধনদের দুর্গতির কথা শুনে আনন্দে নাচতে লাগলেন। কিন্তু ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠির বললেন, 'কৌরবেরা এখন বিপদে পড়েছে, যত যাই হোক তারা আমাদের ভাই। এখন আমাদের উচিত তাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাওয়া। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের বংশের বধুদের গন্ধর্বরা হরণ করে কুল ধর্মের অপমান করেছে। পার্থ, তুমি এখনি চিত্রসেনের কাছে যাও। তিনি তোমার বন্ধু। হয়তো তোমাকে দেখেই তিনি কৌরবদের ছেড়ে দেবেন। আর তিনি তোমার অনুরোধে যদি দুর্যোধনদের মুক্তি না দেন তাহলে বল প্রয়োগে তাঁকে পরাজিত করবে। আমি এখন পূজায় ব্যস্ত আছি তা নইলে তোমাদের নেতৃত্ব দিতাম।'

ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলেন। তাঁদের

দেখে কুরু সৈন্যরা আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলো। গন্ধর্ব সেনাদের কাছে নিয়ে অর্জুন দুর্যোধনদের মুক্ত করে দিতে বললেন। গন্ধর্বরা তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিলে ক্রুদ্ধ অর্জুন তাঁর ভাইদের নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু করে দিলেন। চোখের নিমেষে হাজার হাজার গন্ধর্বসৈন্য নিহত হতে দেখে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন গদা হাতে নিজে যুদ্ধ করতে এলেন, অর্জুনের বাণে তাঁর গদা দু'টুকরো হয়ে গেলো। চিত্রসেন তখন মায়া বলে অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন ভীষণ ক্রোধে তাঁর প্রতিশব্দভেদী বাণ ছুঁড়তে উদ্যত হলে চিত্রসেন সামনে এসে বললেন, 'সব্যসাচী, আমি তোমার সখা চিত্রসেন।'

অর্জুন চিত্রসেনকে দুর্বল দেখে যুদ্ধ থামালেন এবং বললেন, 'গন্ধর্ব রাজ, আমাকে বল, তুমি কেন দুর্যোধনদের ও তাঁদের বধুদের বন্দী করেছো?'

চিত্রসেন বললেন, 'প্রিয় ধনঞ্জয়, দুর্যোধনেরা কর্ণ ও শকুনিকে নিয়ে তোমাদের উপহাস করার জন্য দ্বৈত বনে এসেছে জানতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য পাঠিয়েছেন।'

এরপর চিত্রসেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর অনুরোধে দুর্যোধনদের মুক্তি দিলেন।

চিত্রসেন বিদায় নিয়ে সুরলোকে চলে গেলেন। কৌরবেরা স্ত্রী পুত্রের সাথে এক হয়ে পাণ্ডবদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বললেন, 'ভাই, মনে কোন গ্লানি রেখোনা, নিরাপদে রাজ্যে ফিরে যাও।'

দুর্যোধন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে লজ্জায় দুঃখে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে অসুস্থ, অশক্ত মানুষের মত হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

দুর্বাসার পারণ

পাণ্ডবেরা যখন কাম্যক বনে বাস করছিলেন তখন একদিন দুর্বাসা মুনি তাঁর দশহাজার শিষ্য নিয়ে দুর্যোধনের অতিথি হলেন। দুর্বাসা ভয়ংকর রাগী ও খামখেয়ালী ঋষি, কথায় কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, যখন যা ইচ্ছা তাই আদেশ করেন। কোনদিন হয়তো মধ্যরাত্রে খাদ্য চাইতেন, আবার খাদ্য আনলে তা খেতেন না, ভর্ৎসনা করতেন। এসব সত্ত্বেও দুর্যোধন তাঁকে প্রাণপণ সেবা করে তুষ্ট করলেন। বিদায়কালে দুর্বাসা দুর্যোধনকে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করতে বললেন। দুর্যোধন আগে থেকেই মতলব করে রেখেছিলেন কি চাইবেন। তাই বললেন, 'ভগবান, আপনি এই দশহাজার শিষ্য নিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ ভাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করুন, আমার অনুরোধ তাঁদের সকলের খাওয়া শেষে দ্রৌপদী যখন খাওয়া শেষ করে বিশ্রাম নেবেন তখন আপনি যাবেন।'

দুর্বাসা এই কথায় রাজী হলেন।

এরপর একদিন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর ভোজনের পর দুর্বাসা তাঁর অযুত শিষ্য নিয়ে কাম্যকবনে পাণ্ডবদের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা ক্ষুধার্ত। যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রণাম করে অনুরোধ করলেন, প্রভু আপনারা স্নান আহ্নিক করে আসুন, খাবার প্রস্তুত থাকবে।

দুর্বাসা তাঁর সৈন্যদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে গেলেন। খাবারের আয়োজন কিভাবে হবে এই চিন্তায় দ্রৌপদী আকুল হয়ে কৃষ্ণের স্তব

করে বললেন, 'হে দুঃখহারী মধুসূদন তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর।'

দ্রৌপদীর প্রিয় সখা কৃষ্ণ তখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। দুর্বাসার আগমনের কথা জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'কৃষ্ণা আমিও ক্ষুধার্ত, তোমার অন্ন পাত্রটি নিয়ে এসো।' দ্রৌপদী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমার খাওয়া শেষ হবার পর সে পাত্র শূন্য হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণ বললেন, 'এখন পরিহাসের সময় নেই, তুমি দ্রুত পাত্রটি নিয়ে এসো।'

দ্রৌপদী থালা নিয়ে আসার পর দেখা গেলো থালার এক কোণে একটুখানি শাক-ভাত লেগে আছে। কৃষ্ণ সেই অন্নটুকু খেয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, 'সমগ্র বিশ্বের আত্মা তৃপ্ত হোক।' তারপর তিনি সহদেবকে বললেন, যাও, ভোজনের জন্য মুনিদের ডেকে আনো।

ওদিকে মুনিরা স্নান করে উঠতেই অনুভব করলেন তাঁদের পেট এমন ভরে গেছে যে গুরুভোজনের ঢেকুর উঠছে। তাঁরা দুর্বাসাকে বললেন, 'প্রভু আমাদের পক্ষে আর খাওয়া অসম্ভব।'

দুর্বাসারও ঐ একই অবস্থা। তিনি চিন্তা করলেন রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরকে বৃথা কষ্ট না দিয়ে নদীতীর থেকেই চলে যাওয়া ভালো, এতে লজ্জার হাত থেকেও বাঁচা যাবে।

সহদেব এসে খবর দিলেন নদীতীর শূণ্য। কৃষ্ণ বললেন, 'ভয় নেই, রাগী স্বভাব দুর্বাসার খুব শিক্ষা হয়েছে, তিনি আর কখনও তোমাদের বিব্রত করতে আসবেন না।'

কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদীর প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অন্ত রইল না।

দ্রৌপদী হরণ ও জয়দ্রথের নিগ্রহ

একদিন পঞ্চপাণ্ডব মৃগয়ায় গেছেন। আশ্রমে শুধু দ্রৌপদী ও ঋষি ধৌম্য রয়েছেন। সেই সময়ে সিন্ধুর রাজা জয়দ্রথ (ধৃতরাষ্ট্রের মেয়ে দুঃশলার স্বামী) তাঁদের আশ্রমের পাশের পথ দিয়ে শাল্ব দেশে যাচ্ছিলেন। পাণ্ডবদের আশ্রমের সামনে একটি ফুলে ভরা কদমগাছের ডাল নুইয়ে দ্রৌপদী তখন কদমফুল তুলছিলেন। তাঁকে দেখে জয়দ্রথ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর সখা কোটিকাস্যকে বললেন, 'বন আলো করে কে ঐ মেয়ে? এত রূপ নিয়ে তাঁর অমন ভিখারিণীর দশাই বা কেন? তুমি তাঁর পরিচয় জেনে এসো।'

কোটিকাস্য দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে নিজের ও জয়দ্রথের পরিচয় দিলেন এবং দ্রৌপদীর পরিচয় জানতে চাইলেন।

দ্রৌপদী বললেন, আমি পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী কৃষ্ণা। আপনার বন্ধু সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্ত্রী দুঃশলা আমার ননদ। দয়া করে আপনারা এই আশ্রমে অতিথি হন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনাদের পেয়ে খুব খুশি হবেন।

জয়দ্রথ রথ থেকে নেমে দ্রৌপদীকে বললেন, 'সুন্দরী, আমি অতিথি হতে চাইনা, তোমার অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানে এসেছি। পাণ্ডবেরা হীন ভিখারী, তারা তোমার যোগ্য নয়। তুমি আমার রথে ওঠো, তোমার রূপের ছটায় সিন্ধুর রাজপ্রাসাদ আলো হয়ে উঠবে।'

রাগে দ্রৌপদীর নীলপদ্মের মত মুখ রক্তিম হয়ে গেলো। তিনি তীব্রভাষায় জয়দ্রথকে বললেন, 'তুমি অতি নীচ, আমার দেবতুল্য স্বামীরা তোমাকে কুকুরের মত মেরে তাড়াবে।'

জয়দ্রথ দ্রৌপদীর কথায় কান না দিয়ে তাঁকে জোর করে রথে তুলে ঝড়ের বেগে রথ ছুটিয়ে দিলেন। ধৌম্য তাঁকে বাধা দিতে না পেরে তাঁর সৈনাদের সাথে মিশে পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন।

পাণ্ডবেরা মৃগয়া শেষ করে বনে ফিরে এসে দেখলেন বনভূমি যেন শোকে অসাড়, পাখিরা স্তব্ধ হয়ে গেছে, ফুলেরা বিবর্ণ ও লতাগুল্ম বেদনায় নেতিয়ে পড়েছে। এ সমস্ত দুর্লক্ষণে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন, দ্রৌপদীর বালিকা পরিচারিকাটি মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছে।

পাণ্ডবদের দেখে বালিকা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠে জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণের সমস্ত ঘটনা এক নিঃশ্বাসে বলে দিল। তার কথা শেষ হবার আগেই পাণ্ডবেরা ঝড়ের মত বেগে জয়দ্রথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন, কিছু দূরে গিয়েই তাদের দেখতে পেলেন। জয়দ্রথ দূর থেকে পাণ্ডবদের রথের ধ্বজা দেখে ভয় পেয়ে দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়লেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। ভীম তাঁকে বললেন, 'আপনি কৃষ্ণাকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান, আমরা জয়দ্রথকে উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মহাবাহু ভীম, মনে রেখো জয়দ্রথ দুরাত্মা হলেও সে আমাদের ভগ্নী দুঃশলার স্বামী, তাঁকে বধ কোর না।'

ভীম আর অর্জুন অরণ্যে প্রবেশ করে জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন, ভীমের প্রহারে জয়দ্রথ মৃতপ্রায় হলেও তাঁকে তিনি যুধিষ্ঠিরের কথা স্মরণ করে প্রাণে মারলেন না।

ওদিকে নকুল ও সহদেবের শরাঘাতে জয়দ্রথের সৈন্যদের অধিকাংশই প্রাণ হারালো এবং বাকীরা যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে বাঁচলো।

ভীম তাঁর অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দিয়ে জয়দ্রথের মাথার চুল জায়গায় জায়গায় কামিয়ে তাঁর চেহারা কিম্ভুতকিমাকার করে ফেললেন এবং তাঁকে বেঁধে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন।

ভীমের আদেশে জয়দ্রথ নিজেকে পাণ্ডবদের দাস বলে স্বীকার করলেন এবং যুধিষ্ঠিরের পায়ে পড়ে মুক্তি ভিক্ষা নিলেন।

কর্ণের কবচকুণ্ডল দান

পাণ্ডবেরা যাতে চিরজয়ী হতে পারে এজন্য দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের জন্মগত কবচকুণ্ডল নেবেন বলে ঠিক করলেন। সূর্যদেব একথা জানতে পেরে কর্ণকে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিয়ে বললেন, 'কর্ণ শোন, দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তোমার কাছে কবচকুণ্ডল চাইবেন, তুমি কখনও তাকে তা দিও না। কবচকুণ্ডল হারালে তোমার আয়ুক্ষয় হবে।'

কর্ণ তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'জ্যোতির্ময় দেবতা, আপনি কে?'

সূর্য বললেন, 'আমি সূর্য, তোমার প্রতি সন্তান-স্নেহের বশেই একথা বলছি।'

কর্ণ বললেন, 'প্রভু, আপনার স্নেহে আমি ধন্য বোধ করছি। কিন্তু আমার ব্রত এই, যে কোন ব্রাহ্মণ প্রার্থীর জন্য আমি নিজের জীবন পর্যন্ত দান করতে পারি। ইন্দ্র যদি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশেও আমাকে ছলনা করে পাণ্ডবদের কল্যাণের জন্য কবচকুণ্ডল প্রার্থনা

করেন, আমি অবশ্যই তা দেবো। এতে আমার প্রাণের ক্ষতি হলেও ইন্দ্রেরও কলংক হবে।'

প্রতিদিনের মত কর্ণ দুপুর বেলা নদীতে স্নান করে উঠে সূর্যের স্তব করছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইন্দ্র তাঁর কাছে এসে বললেন, 'কর্ণ তুমি যদি সত্যিই দাতা হয়ে থাকো তাহলে তোমার ঐ জন্মগত কবচকুণ্ডল আমাকে দান কর।'

কর্ণ বললেন, 'আপনি ধনরত্ন, জমি, গরু ইত্যাদি যা চান সব আমি দেবো। কিন্তু এই কবচকুণ্ডল আমার জীবন মৃত্যুর সাথে জড়িত, দয়া করে এটি চাইবেন না।'

কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কিছুই নেবেন না শুনে কর্ণ হেসে উঠে বললেন, 'দেবরাজ, আমি আপনাকে আগেই চিনতে পেরেছি। ঠিক আছে, আপনি আমার কবচকুণ্ডল নিয়ে তৃপ্ত হন, তবে আমাকে দয়া করে একটি বর দান করুন।'

ইন্দ্র বললেন, 'কর্ণ, তুমি মহাদাতা। আমার বজ্র ছাড়া আর যে কোন বর চাও আমি দেব।'

কর্ণ তখন ইন্দ্রের অব্যর্থ শক্তি অস্ত্র প্রার্থনা করলেন। ইন্দ্র একটু চিন্তা করে বললেন, 'শক্তি অস্ত্র আমি তোমাকে দেবো। কিন্তু এই অস্ত্রে তুমি অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবদের চার ভাইকে বধ করতে পারবে, আর মাত্র একবার এটি ব্যবহার করার সাথে সাথেই অস্ত্রটি আমার কাছে ফিরে আসবে।'

কর্ণ বললেন, 'কিন্তু আমি অর্জুনকে কেন বধ করতে পারবো না?'

ইন্দ্র উত্তর দিলেন—'কারণ যিনি বিষ্ণু ও হরি সেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহায়।'

কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে শক্তি অস্ত্র নিয়ে কবচকুণ্ডল কেটে তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

যুধিষ্ঠির ও যক্ষ

একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে পঞ্চপাণ্ডবকে বললেন যে, 'একটি দুরন্ত হরিণ এসে আমার অরণি ও মন্থটি (দু'টুকরো কাঠ যা ঘষে আগুন জ্বালা হয়) তার শিংয়ে বাধিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনারা দয়া করে অরণি ও মন্থটি উদ্ধার করে দিন তা নইলে আমি পূজার জন্য আগুন জ্বালাতে পারবো না।'

যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের নিয়ে হরিণের পেছনে ছুটলেন। তাঁরা বহু শর ছুঁড়েও হরিণকে বধ করতে পারলেন না। সে যেন মায়া বলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পাণ্ডবেরা হরিণের পেছনে দৌড়ে যেমন ক্লান্ত হয়েছেন, তাঁদের পিপাসাও পেয়েছে তেমনি। তাঁরা একটা বট গাছের ছায়ায় অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন। নকুল সেই গাছের উঁচু ডালে চড়ে কোথাও জল আছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলেন। তাঁর চোখে পড়লো একটু দূরে নানারকম জলজ গাছ। সারসের ডাকও তাঁর কানে এলো।

নকুল গাছ থেকে নেমে জল আনার জন্য যাত্রা করলেন। জলাশয়ের কাছে গিয়ে যেই তিনি জলপান করতে যাবেন তখন শুনলেন কে যেন অদৃশ্য থেকে বলছে, 'এই সরোবর আমার। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তারপর এই জলপান করতে পারবে।'

ক্ষত্রিয়ের ছেলে নকুল সে কথায় কান না দিয়ে যেই মাত্র জল খেতে গেলেন তখুনি প্রাণহীন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

নকুলের দেরী দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠালেন। সহদেবও

অদৃশ্য থেকে নিষেধ শুনলেন এবং তা অগ্রাহ্য করে জল খেতে গিয়ে প্রাণ হারালেন। এরপর একে একে ভীম ও অর্জুন সেখানে এসে একই ভাবে প্রাণ হারালেন।

অবশেষে যুধিষ্ঠির নিজেই ভাইদের খোঁজে সেই সরোবরের ধারে এলেন এবং ভাইদের মৃতদেহ দেখে শোকে যেন পাথর হয়ে গেলেন। চারজনের শরীরে অস্ত্রের কোন আঘাত নেই, কোন হিংস্র জন্তুর নখ বা দাঁতের আঘাত নেই। যুধিষ্ঠির বুঝলেন কোন অদৃশ্য শক্তি এঁদের হত্যা করেছে।

পিপাসায় অধীর হয়ে যুধিষ্ঠির সেই সরোবরের টলটলে নীল জলে নেমে জল পান করতে গেলে আকাশবানী শুনলেন, 'যুধিষ্ঠির, আমি বক। আমিই তোমার ভাইদের প্রাণ নিয়েছি। এখন তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান কর তাহলে তোমারও মৃত্যু হবে।'

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে বললেন, 'প্রভু আপনি যেই হোন, আপনার অসীম শক্তি। তা নইলে আমার মহাবীর চার ভাইকে আপনি হত্যা করতে পারতেন না। বলুন কে আপনি?'

তখন সূর্যের মত উজ্জ্বল এক যক্ষ এক পায়ে দাঁড়িয়ে দেখা দিয়ে বললেন, 'তুমি ধর্মজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তারপর জলপান করবে।'

যুধিষ্ঠির যক্ষের প্রস্তাবে রাজী হলে যক্ষ তাঁকে এই প্রশ্নগুলো করলেন এবং যুধিষ্ঠির তাঁর এই উত্তরগুলো দিলেন। যেমন—যক্ষ—সূর্যকে কে উর্দ্ধে রেখেছেন? সূর্যের চারদিকে কে ভ্রমণ করেন? কে তাঁকে অস্তে পাঠান? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির—ব্রহ্ম সূর্যকে উর্দ্ধে রেখেছেন, দেবতারা তাঁর চতুর্দিকে

ভ্রমন করেন, ধর্ম তাঁকে অন্তে পাঠান, তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

যক্ষ—ব্রাহ্মণের দেবত্ব হয় কিভাবে? কোন্ ধর্মের বলে তাঁরা সাধু? তাঁরা মানুষ হন কেন? কেন অসাধু হন?

যুধিষ্ঠির—বেদ পাঠ করে ব্রাহ্মণেরা দেবত্ব অর্জন করেন, সাধুতা তাঁদের তপস্যার ফল, তাঁদের মৃত্যু হয় বলেই তাঁরা মানুষ, আর তাঁরা পরনিন্দা করলে অসাধু হন।

যক্ষ—ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? সাধুধর্ম কি? মানুষ ভাব কি? অসাধু ভাব কাকে বলে?

যুধিষ্ঠির—ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব তার অস্ত্র নিপুণতায়। যজ্ঞই হচ্ছে সাধু-ধর্ম, ভয় হলো মানুষ ভাব, শরণাগতকে (আশ্রয় প্রার্থী) ত্যাগ করা অসাধুভাব।

যক্ষ—পৃথিবীর চেয়ে গুরুভার কে? আকাশের চেয়ে উঁচু কি? বায়ুর চেয়ে কে দ্রুতগামী? ঘাসের চেয়ে কিসের সংখ্যা বেশী?

যুধিষ্ঠির—মা পৃথিবীর চেয়ে গুরুভার, বাবা আকাশের চেয়ে উঁচু, মন বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী, চিন্তার সংখ্যা ঘাসের চেয়ে অনেক বেশী।

যক্ষ—কে ঘুমের সময়ও চোখ বোঁজে না? জন্মেও কে নড়ে না? কার হৃদয় নেই? কে বেগ দিয়ে বৃদ্ধি পায়?

যুধিষ্ঠির—মাছ ঘুমিয়েও চোখ বোঁজে না, ডিম জন্মেও নড়ে না, পাষাণের হৃদয় নেই, নদী বেগের সাহায্যে বৃদ্ধি পায়।

যক্ষ—প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূর্ষু এদের বন্ধু কারা?

যুধিষ্ঠির—প্রবাসীর বন্ধু সঙ্গী, গৃহবাসীর বন্ধু স্ত্রী, আতুরের মিত্র চিকিৎসক, মুমূর্ষুর বন্ধু দান।

যক্ষ—কি ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়? কি ত্যাগ করলে

শোক হয় না ? কি ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয় ? কি ত্যাগ করলে সুখী হয় ?

যুধিষ্ঠির—অভিমান ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, ক্রোধ ত্যাগ করলে ধনী হয়, লোভ ত্যাগ করলে মানুষ সুখী হয়।

এবার যক্ষ প্রশ্ন করলেন, বার্তা কি ? পন্থা কি ? আশ্চর্য কি ? সুখী কে ? আমার এই চার প্রশ্ন দিয়ে তুমি জলপান কর।

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'সময় যেন পাচক রূপে (রাধুনি) এই পৃথিবীর কড়াইতে করে সমস্ত প্রাণীকে রান্না করছে, সূর্য হলো তার রান্নার আগুন, মাস ঋতু হলো তার দর্বী বা হাতা খুন্তি, এই হলো "বার্তা।"

মহাপুরুষেরা যে পন্থা অবলম্বন করেন সেটাই "পন্থা"।

প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মরছে অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য জেনেও মানুষ চিরদিন বেঁচে থাকতে চায় এটাই "আশ্চর্য।"

যার ঋণ নেই, দিনান্তে যে সৎ উপার্জনের অর্থে শাক-ভাত খেতে পায় সে-ই সুখী।'

যক্ষ খুশি হয়ে বললেন, 'তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছো। এখন বল, পুরুষ কে ? সর্বধনেশ্বর কে ?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'যাঁর পুণ্য কাজ স্বর্গ ও পৃথিবীর কল্যাণ করে তিনিই পুরুষ। আর প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, অতীত, ভবিষৎ এইসব বিপরীত বিষয়গুলোকে যিনি একই সমান মনে করেন তিনিই সর্বধনেশ্বর।'

যক্ষ বললেন, 'রাজা যুধিষ্ঠির, তোমার চার ভাইয়ের মধ্যে তুমি কার প্রাণ ফিরে পেতে চাও ?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'প্রভু, আপনি নকুলের প্রাণ ফিরিয়ে দিন।'

যক্ষ বললেন, 'আশ্চর্য'। ভীম ও অর্জুন তোমার সহোদর ভাই, তাছাড়া অর্জুন তোমার সবচেয়ে বড় সহায় এবং ভীমের শক্তি সাহসের জন্যই তোমরা নিশ্চিন্তে বনে রয়েছো। অথচ এদের প্রাণ ফিরিয়ে না চেয়ে নকুলের জীবন চাইছো?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'কুন্তী ও মাদ্রী দু'জনেই আমার মা। 'কুন্তীর ছেলে আমি বেঁচে রয়েছি। নকুলের প্রাণ ফিরে পেলে মাদ্রীরও একটি ছেলে থাকে।'

যক্ষ বললেন, 'ভারতশ্রেষ্ঠ রাজা, তোমার পুণ্য, জ্ঞান ও সত্য বলে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার চার ভাইয়েরই প্রাণ আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

চার ভাই যেন ঘুম থেকে সজীব দেহে জেগে উঠলেন। যুধিষ্ঠির যক্ষকে বললেন, 'প্রভু, আমার মনে হচ্ছে আপনি কোন দেবতা, হয়তো আমাদের পিতাই এসেছেন যক্ষের রূপ ধরে।'

যক্ষ বললেন, 'ঠিকই ধরেছো বৎস, আমি তোমার জনক ধর্ম। আমার প্রসাদেই তুমি জন্মলাভ করেছো। তুমি বর প্রার্থনা কর।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'যে ব্রাহ্মণের অরণি ও মন্থের জন্য আমরা হরিণের পেছনে ছুটে এসেছিলাম তাঁর পূজার আগুন যেন নিভে না যায় এই বর দিন।'

ধর্ম বললেন, 'তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য আমিই হরিণ হয়ে অরণি চুরি করেছিলাম, এখন তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। পুত্র, অন্য বর চাও।

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমাদের বনবাসের বারো বছর কেটে গেছে। এখন এক বছর আমাদের অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। এই বরদান করুন যাতে যেখানেই থাকি কেউ যেন আমাদের চিনতে না পারে।'

ধর্ম বললেন, তোমরা বন ত্যাগ করে বিরাট রাজার নগরে গিয়ে অজ্ঞাত বাস করো। কেউ তোমাদের চিনতে পারবে না।

পঞ্চপাণ্ডব ধর্মকে প্রণাম করে আশ্রমে ফিরে এলেন এবং ব্রাহ্মণকে অরণি ও মন্থ ফিরিয়ে দিলেন।

বিরাট পর্ব

যক্ষরূপী ধর্মের উপদেশ মত পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাস করবার উদ্দেশ্যে বিরাটের রাজ্যে যাবার জন্য তৈরী হলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মৎস্য দেশের রাজা শক্তিমান, ধার্মিক ও দয়ালু। তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন। আমরা তাঁর কাছে ছদ্মবেশে কর্মচারী হয়ে থাকবো।'

অর্জুন করুণ হেসে বললেন, 'আপনি একজন আত্মমর্যাদাবান সম্রাট, আপনার যোগ্য কোন কাজ কি আছে?'

যুধিষ্ঠির বললেন, বিরাট রাজা পাশা খেলা খুবই পছন্দ করেন। আমি কংক নাম নিয়ে তাঁর সভায় ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে যাবো এবং আমাকে তাঁর পাশা খেলার সঙ্গী করতে অনুরোধ জানাবো। যদি তিনি আমার পরিচয় জানতে চান তো বলব, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সখা ছিলাম।'

ভীম বললেন, 'আমি, 'বল্লভ' নাম নিয়ে বিরাট রাজের পাক-শালায় পাচকের (রাঁধুনি) কাজ নেবো। আমার এই বিরাট দেহ দেখে যদি কেউ সন্দেহ করে তাহলে বলবো আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের

পাচক ছিলাম, আর আমার দেহে প্রচণ্ড শক্তির জন্য তাঁর হাতী ও ষাঁড় ক্ষেপে গেলে সেসব দমন করার কাজও আমাকে করতে হতো। কিন্তু সব্যসাচী, তুমি কি করবে?'

অর্জুন বললেন, 'ইন্দ্রলোকে থাকতে আমি গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের কাছে নৃত্যগীত শিখেছি। আমি মেয়ের সাজে বিরাট রাজের অন্তঃপুরে মেয়েদের নাচগান শেখাবার কাজ নেব। নিজের পরিচয় দেব, আমি "বৃহন্নলা," পাণ্ডবরানী দ্রৌপদীর নর্তকী ছিলাম।

নকুল বললেন, 'আমি 'গ্রন্থিক' নাম নিয়ে বিরাট রাজার ঘোড়া দেখাশোনা ও ঘোড়ার চিকিৎসার দায়িত্ব চাইবো। বলব, আগে আমি যুধিষ্ঠিরের ঘোড়ার চিকিৎসক ছিলাম।

সহদেব বললেন, 'আমি গরুর চিকিৎসা এবং গরুর বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ জানি। নিজেকে 'তন্তিপাল' নামে পরিচয় দিয়ে বিরাট রাজার গরুদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেবো বলে ঠিক করেছি।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমাদের ফুলের মতো কোমল প্রিয়তমা দ্রৌপদী যেমন গুণবতী তেমনি অভিমানী, তিনি কি করে পরের কাজ করবেন?'

দ্রৌপদী মধুর হেসে বললেন, 'রাজা, আমি বিরাট রাজার রানীর মালিনীর কাজ নেবো। মালিনীর কাজ ফুলের মালা, ফুলের গহনা তৈরী করা, চুলের নানারকম বিন্যাস করা। এসব হাল্কা কাজ করতে আমার একটুও কষ্ট হবে না।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'কল্যাণী কৃষ্ণা, ঈশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন এই আশীর্বাদ করি।'

পাণ্ডবদের সব কথাবার্তা ঠিক হয়ে যাবার পর পুরোহিত ধৌম্য

অন্যান্য ব্রাহ্মণদের নিয়ে পাঞ্চাল রাজ্যে চলে গেলেন। কাউকে জানানো হলো না পাণ্ডবেরা কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন।

বহু বন, পর্বত, নগর, গ্রাম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পথ চলে পাণ্ডবেরা যখন মৎস্য রাজ্যে পৌঁছুলেন তখন তাঁদের দেহ ধূলায় ধূসর, পরণের কাপড় মলিন। তাঁদের হাতের ধনুর্বাণ ও কোমরে তলোয়ার দেখে নগরের লোকেরা তাঁদের ব্যাধ বলে মনে করলো।

রাজধানীতে ঢোকার আগে অর্জুন বললেন, 'আমরা যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজপুরীতে যাই তাহলে রাজার প্রহরীরা বাধা দেবে। তাছাড়া আমার এই গাণ্ডীব ধনু দেখা মাত্রই মৎস্যরাজ বিরাট আমাকে চিনে ফেলবেন। তার চেয়ে শ্মশানের কাছে যে বিরাট শমী বৃক্ষ রয়েছে তার সবচেয়ে উঁচু ডালে আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো বড় একখানা কাপড়ে মুড়ে লুকিয়ে রাখি। কেউ যদি প্রশ্ন করে তাহলে বলবো, আমাদের দেশের নিয়ম অনুসারে আমরা আমাদের একজন আপন জনের মৃতদেহ এখানে রাখছি। এতে ভালোই হবে। প্রেতাত্মার ভয়ে কেউ আর ঐ গাছে উঠবে না।'

নকুল শমী বৃক্ষে উঠে অস্ত্রশস্ত্র গুলো গাছের চূড়ায় খুব সাবধানে বেঁধে রাখলেন। তারপর পাণ্ডবেরা একে একে মৎস্যরাজার পুরীতে প্রবেশ করলেন।

বিরাট রাজা পঞ্চপাণ্ডবকে আদৌ চিনতে পারলেন না। তাঁরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে রাজার কাছে এসে পছন্দমত কাজ প্রার্থনা করলেন এবং রাজা তাদের কাজ দিলেন। বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরকে তাঁর এত ভালো লাগলো যে তিনি 'রাজসভার সবাইকে ডেকে বললেন, 'আজ থেকে কংক আমার প্রিয় সখা, তোমরা একে রাজার মত সম্মান করবে।'

দ্রৌপদী যখন অতি সাধারণ বেশে বিরাট রাজার মহিষী সুদেষ্ণার কাছে মালিনীর কাজের জন্য এলেন তখন তাঁর শরীরের পদ্ম সৌরভে অবাক হয়ে রানী দেখলেন, নীল পদ্মের মত এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে, মলিন কাপড়ে তাকে যেন কুয়াশায় ঢাকা চাঁদের মত করুণ লাবণ্যে মাখা বলে মনে হচ্ছে।

সুদেষ্ণা খুব স্নেহের সাথে দ্রৌপদীকে বললেন, 'কে তুমি? তুমি কি কোন অপ্সরা? তোমার এত রূপ। মালিনীর কাজ কি তোমাকে সাজে?'

দ্রৌপদী বললেন, 'আমি সত্যিই মালিনী। চুলের পরিচর্যা, খোঁপা বাঁধা, চন্দনের সাজ করা, ফুলের সবরকমের গহনা তৈরী করাতে আমার সুনাম আছে বলে আমি পাণ্ডব মহিষী কৃষ্ণা আর কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার প্রিয় দাসী হতে পেরেছিলাম। তাঁরা আমাকে সৌখিন বেশভূষা, অলংকার আর ভালো খাবার দিতেন। ছোট বোনের মত আদর করতেন।'

সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর কথা শুনে বললেন, 'তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু তোমার এত রূপ দেখে একটু ভয় হচ্ছে, কারণ এমন রূপের জন্যই বোধহয় ঘর-সংসার আর রাজ্যে আগুন লাগে।'

দ্রৌপদী বিনয়ের সাথে বললেন, 'মহারানী আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমার পাঁচজন মহাশক্তিমান গন্ধর্ব স্বামী আছেন, তাঁরাই আমাকে রক্ষা করবেন। তবে মালিনীর কাজ নেবার আগে আমার শর্ত এই যে আমি কারুর এঁটো খাবার বা বাসন ছোঁব না, কোন পুরুষের কাজ করবো না এবং কারুর পায়ে হাত দেবো না।'

সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর শর্তে রাজী হয়ে তাঁকে মালিনীর কাজ দিলেন।

যুধিষ্ঠির বিরাট রাজা ও তাঁর পুত্রদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। মহর্ষি বৃহদশ্বের কাছ থেকে পাওয়া পাশা খেলার সব গোপন কৌশল ব্যবহার করে পাশা খেলে তিনি প্রচুর ধনরত্ন পেতেন ; সে সবই তিনি গোপনে দ্রৌপদীকে উপহার দিতেন। মোটকথা, দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সব সময়েই একটা গোপন যোগাযোগ বজায় রইলো।

চার মাস কেটে গেলো। মৎস্য রাজধানীতে ব্রহ্মার পূজা উপলক্ষে এক মহোৎসবের আয়োজন হলো। উৎসবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে মল্লবীরেরা (কুস্তিগীর) এলেন, ভীম তাঁদের মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে অনেক প্রশংসা পেলেন। এছাড়া বাঘ, সিংহ ও হাতীর সাথে ভীমের যুদ্ধ দেখে সবাই এত মুগ্ধ হলেন যে তাঁকে রাশি রাশি পুরস্কার দিলেন এবং সবার মুখেই তাঁর নাম শোনা যেতে লাগলো।

উৎসবের দিনগুলোতে বৃহন্নলাররূপী অর্জুন তাঁর নাচ-গানে রাজবাড়ীর এবং অতিথি মহিলাদের আনন্দ দিলেন। নকুল এবং সহদেবও রাজার ঘোড়া এবং গো-সম্পদের উন্নতি করে প্রচুর পুরস্কার পেলেন। কিন্তু কৃষ্ণার মনে সব সময়েই দুঃখের ছায়া। মহাবীর পঞ্চপাণ্ডবের, বিশেষ করে সাব্যসাচী অর্জুনের এই হীন পরিণতি তাঁর বুকে সর্বক্ষণ কাঁটার মত বিঁধছে।

দ্রৌপদী ভীম ও কীচক

রাণী সুদেষ্ণার ভাই কীচক ছিলেন বিরাট রাজার সেনাপতি। সুদেষ্ণার প্রাসাদে একদিন অপরূপা দ্রৌপদীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দ্রৌপদী কীচকের মনের ভাব বুঝতে পেরে সেখান থেকে অন্যদিকে চলে গেলেন।

কিন্তু নির্লজ্জ কীচক তাঁর বোন সুদেষ্ণাকে বললেন, 'আজ আমার প্রাসাদে অনেক রকম সুস্বাদু খাবার আর খুব দামী পানীয় তৈরী হয়েছে। তুমি তোমার মালিনীকে পাঠিয়ে দিও, তার হাতে সেসব দেবো।'

সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কীচকের প্রাসাদে যাবার কথা বলতে তিনি উত্তর দিলেন, 'মহারাণী, সেনাপতি কীচকের হাবভাব খুবই খারাপ, আমি কখনই তাঁর কাছে যাবো না।'

যতই হোক কীচক সুদেষ্ণার ভাই। তিনি মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হয়ে দ্রৌপদীর হাতে একটি বড় সোনার পেয়ালা দিয়ে বললেন, 'আমার কাজ নিয়ে গেলে কীচক তোমার কোনই অসম্মান করবেন না।'

সোনার পেয়ালা হাতে দ্রৌপদীকে দেখে কীচক মহাখুশি হয়ে তাঁর রূপের প্রশংসা করতে লাগলেন। দ্রৌপদী তাঁর কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'আমি রাণীর জন্য পানীয় নিতে এসেছি।'

কীচক বললেন, 'দাসীর হাতে আমি সেসব পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর

তোমার জন্য আমি এইসব মূল্যবান কাপড় আর অলংকার রেখেছি, এগুলো পরে তুমি আমার সংগে বসে সুস্বাদু খাবার ও মধুমাধবী সুরা খেয়ে আনন্দ কর।'

দ্রৌপদী তাঁর বিপদ অনুমান করে মনে মনে সূর্যদেবকে ডাকতে ডাকতে দ্রুত সেখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করতেই কীচক তাঁর হাত টেনে ধরলেন। অমনি সূর্যদেবের পাঠানো এক অদৃশ্য রাক্ষস এসে কীচককে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। এই সুযোগে দ্রৌপদী ছুটে এসে বিরাট রাজার সভায় ঢুকে পড়লো। কীচক পেছনে পেছনে ছুটে এসে সবার সামনে দ্রৌপদীর চুল টেনে ধরে তাঁকে লাথি মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য রাক্ষস কীচককে প্রচণ্ড লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিলো।

ভীম দ্রৌপদীর অপমান দেখে রাগে লাফিয়ে উঠতেই যুধিষ্ঠির তাঁকে ইসারায় থামিয়ে দিলেন। দ্রৌপদী রক্তলাল চোখে তাঁদের দিকে এক পলক তাকিয়ে বিরাট রাজার সামনে দাঁড়ালেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আপনি রাজা হয়ে বসে বসে নারীর এই অপমান দেখলেন? কীচককে কোন শাস্তি দিলেন না।'

রাজা বললেন, 'মালিনী, আমি তোমাদের ঝগড়ার কারণ না জেনে কি করে বিচার করবো?'

রাগে অপমানে কাঁপতে কাঁপতে যুধিষ্ঠির বললেন, 'মালিনী, তুমি রাণী সুদেষ্ণার কাছে যাও। মনে হয়, তোমার গন্ধর্ব স্বামীদের প্রতিশোধ নেবার সময় এখনও আসেনি।'

সেই রাতে দ্রৌপদী একা ঘরে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলেন, তারপর ভীমের ঘরে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'চোখের সামনে আমার এতবড় অপমান দেখার পরও তোমার চোখে ঘুম এলো কি করে? তুমি বেঁচে থাকতে কীচকের লাথি খেয়ে আমাকে তা সহ্য করে থাকতে হবে? যুধিষ্ঠির তো আছেন তাঁর ধর্ম আর পাশা খেলার আমোদ নিয়ে, মহাবীর ভীম রাঁধুনী সেজে হাতা খুন্তির সাথে যুদ্ধ করছেন, সব্যসাচী এখন নপুংসক বৃহন্নলা হয়ে রাজপুরীর সুন্দরীদের মন জোগাচ্ছেন। আর আমি। পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদী যে কখনও কুন্তী দেবী ছাড়া আর কারও সেবা করেনি এখন রাণী সুদেষ্ণার জন্য চন্দন ঘষে ঘষে তার হাতে কড়া পড়েছে, মালা গেঁথে গেঁথে সুঁচের খোঁচায় আঙুল ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। বুঝেছি, তোমাদের মত কাপুরুষ যার স্বামী মৃত্যু ছাড়া তার কোন পথ নেই।'

ভীম দ্রৌপদীর কান্নায় কাতর হয়ে বললেন, 'যাজ্ঞসেনী, ভেবেছিলাম আর দুই সপ্তাহ পর আমাদের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হলে কীচককে তার যোগ্য শাস্তি দেবো। কিন্তু এখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তুমি আগামীকাল রাতে কৌশলে কীচককে তার নাচঘরে আমন্ত্রণ জানিয়ে একা রাখবে।'

দ্রৌপদীর কথামত কীচক তাঁর নাচ ঘরের সব আলো নিবিয়ে

একা বসে দ্রৌপদীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে অন্ধকার নাচ ঘরে ভীম ক্ষুধার্ত সিংহের মত এসে ঢুকলেন। কীচক তাঁকে দ্রৌপদী ভেবে বললেন, 'মালিনী এসেছো? আমি ঠিক করেছি তোমাকে একটা বিরাট প্রাসাদে আমার রাণী করে রাখবো।'

কীচকের কথা শেষ হবার আগেই ভীম তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কীচক কিছুক্ষণ বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভীমের শক্তির কাছে টিকতে পারলেন না। ভীম তাঁকে আছড়ে আছড়ে হত্যা করলেন এবং তাঁর হাত-পা এমন করে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন যে কীচককে একটা তালগোল পাকানো মাংসপিণ্ড অথবা কচ্ছপের মতো দেখতে হলো।

কীচককে হত্যা করে ভীম নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। আর দ্রৌপদী সকলকে জানিয়ে দিলেন, 'আমার গন্ধর্ব স্বামীরা কীচককে তার পাপের শাস্তি দিয়েছে।'

পরদিন কীচকের ভাই ও বন্ধুরা শোকে অপমানে ক্ষেপে গিয়ে ঠিক করলো, যে নারীর জন্য কীচককে এ ভাবে মরতে হলো কীচকের চিতার আগুনে তারা তাকেও পুড়িয়ে মারবে। তারা সদলবলে দ্রৌপদীকে ধরে শশ্মানে নিয়ে চললো। এই খবর পেয়ে ভীম তাঁর রাঁধুনীর পোশাক ছেড়ে অন্য পথে শশ্মানে গিয়ে বিরাট এক গাছ উপড়ে নিয়ে দুরাত্মাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারা ভয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'পালাও! পালাও! মালিনীর গন্ধর্ব স্বামী আমাদের বধ করতে এসেছে!'

চোখের নিমেষে অনেক লোক মারা গেলো, অনেকে পালিয়ে বাঁচলো।

ভীম কৃষ্ণাকে বললেন, 'কল্যাণী তোমার আদেশ আমি পালন

করেছি। আর তেরদিন পর আমাদের এই অপমানের জীবন শেষ হবে। দ্রৌপদী হাসিমুখে ভীমকে প্রণাম করে বললেন, 'গন্ধর্বদেব নমস্কার।'

রাজ অন্তঃপুরে গিয়ে দ্রৌপদী দেখলেন বৃহন্নলা বেশী অর্জুন সেখানে রাজকুমারী উত্তরা ও তাঁর সখিদের নাচ শেখাচ্ছেন। অর্জুন তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি করে ছাড়া পেলে? আর যারা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তাদেরই বা হত্যা করলো কে?'

দ্রৌপদী করুণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'বৃহন্নলা, তুমি তো এই সুন্দরী কুমারীদের নিয়ে সুখেই আছো, দুঃখিনী মালিনীর কথায় তোমার কাজ কি।'

অর্জুন সে কথায় দুঃখিত হয়ে বললেন, 'কৃষ্ণা, জেনে রেখো এই পশুর জীবন-যাপন করে বৃহন্নলাও বড় কষ্টে রয়েছে।'

রাণী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে আদেশ দিলেন, 'এই মুহূর্তে তুমি রাজ-পুরী ছেড়ে চলে যাও। তোমার জন্য আমার ভাই নিহত হয়েছে, তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা আমাদের প্রাণে আতংক জাগিয়েছে।'

দ্রৌপদী বললেন, 'আমি আর তেরদিন এখানেই থাকবো। তারপর আমার স্বামীরা এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আপনাদের ভয় নেই; অকারণে তাঁরা কারুর কোন ক্ষতি করেন না।'

দুর্যোধনদের যন্ত্রণা

ওদিকে হস্তিনাপুরে দুর্যোধনেরাও চুপ করে বসে নেই। পাণ্ডবেরা কোথায় অজ্ঞাতবাস করছেন তা জানার জন্য বনে, পর্বতে, গ্রামে নগরে অনেক চর পাঠিয়েও কোন খোঁজ না পেয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

দুর্যোধন সভার সকলকে বললেন, 'পাণ্ডবেরা যদি তাঁদের অজ্ঞাত বাসের সময় পেরিয়ে যেতে পারেন আমাদের জন্য তা হবে ভীষণ ক্ষতিকর।'

দুঃশাসন বললেন, 'আমার মনে হয় পাণ্ডবেরা আর বেঁচে নেই। ঘোর বনে হিংস্র পশুরা তাঁদের হত্যা করেছে, অথবা কোন ভয়ংকর শত্রুর হাতে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।'

দুঃশাসনের কথায় বিরক্ত হয়ে দ্রোণ বললেন, 'তুমি ছেলে মানুষের মত কথা বলছো। পাণ্ডবদের মত সৎ ও বীরদের কখনও ওভাবে মৃত্যু হয় না। তাঁরা নিশ্চয়ই ধৈর্যের সাথে কাল কাটাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। এখন তোমরাই বরং নিজেদের কর্তব্য নিয়ে চিন্তা কর।'

ভীষ্ম এবং কৃপাচার্যাও দ্রোণের মতকে সমর্থন করলেন। ভীষ্ম বললেন, 'তোমাদের উচিত আগে নিজেদের সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি করা। তারপর অবস্থা বুঝে যুদ্ধ অথবা সন্ধি একটা বেছে নেবে।'

ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা তখন দুর্যোধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মৎস্য দেশের যোদ্ধারা তাঁকে বহুবার যুদ্ধে হারিয়েছে।

কিন্তু মৎস্যরাজের দুর্ধর্ষ সেনাপতি কীচকের জন্য তিনি তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেননি। এবার তিনি সেই সুযোগ নেবার আশায় বললেন, 'আমার মতে এখন রাজা দুর্যোধনের উচিত মৎস্য-রাজ বিরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে তাঁর ধন সম্পদ এবং বিশাল গো-সম্পদ হরণ করা তারপর তাঁর রাজ্য দখল করা।'

কর্ণ সুশর্মার কথা সমর্থন করে বললেন, 'আমাদের মিত্র রাজা সুশর্মার প্রস্তাব অবশ্যই সবার জন্য মঙ্গলজনক হবে।'

দুর্যোধনের ও তাই বিশ্বাস হলো।

সুশর্মার পরাজয়

পাণ্ডবদের নির্বাসনের যেদিন তেরো বছর পুরো হলো সেই দিন সুশর্মা তাঁর সৈন্যদল নিয়ে বিরাটের বহু হাজার গরু হরণ করলেন। একজন গোপ দ্রুত রাজসভায় গিয়ে এই খবর দিতেই রাজা বিরাট তাঁর সৈন্যদের তৈরী হতে আদেশ দিলেন। বিরাটের ইচ্ছায় যুধিষ্ঠির ও ভীমকে যুদ্ধসাজ পরে মৎস্যরাজের বাহিনীর সাথে যেতে হলো। নকুল ও সহদেব তাঁদের সাথে গেলেন।

দুই দলে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো। এক সময়ে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বিরাটকে পরাজিত ও বন্দী করে নিজের রথে তুলে ফেললেন। বিরাটের সৈন্যরা ভয়ে পালাতে লাগলো। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, 'মহাবাহু ভীম, রাজা বিরাট আমাদের আশ্রয়দাতা এবং পরম বন্ধু।

তুমি এখুনি তাঁকে উদ্ধার কর।'

ভীম ঝড়ের বেগে রথ ছুটিয়ে সুশর্মাকে ধরে ফেললেন। তারপর প্রচণ্ড যুদ্ধ করে সুশর্মাকে পরাজিত ও বন্দী করলেন। নকুল ও সহদেবের কাছে সুশর্মার সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ হেরে গেলো।

ভীম এবং বিরাট চেয়েছিলেন সুশর্মাকে বধ করতে। কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে ক্ষমা করে মুক্তি দিলেন।

পরদিন বিরাট যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আপনাদের শক্তি ও যুদ্ধ কৌশলে আমি জয়ী হয়েছি। আপনারাই এখন মৎস্যরাজ্যের আসল রাজা। বলুন আপনারা কি চান? রাজ্য না ধন রত্ন?' যুধিষ্ঠির বললেন, 'আপনার ভালোবাসা ও বন্ধুত্বই আমাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। আপনি ক্ষমাশীল এবং ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে প্রজা পালন করবেন এই আমার অনুরোধ।'

উত্তর ও বৃহন্নলা

বিরাট যখন যুধিষ্ঠিরদের নিয়ে সুশর্মার সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে নিয়ে মৎস্য দেশের উত্তর অঞ্চল আক্রমণ করলেন। সেখানকার গোপদের তাড়িয়ে দিয়ে মৎস্যরাজের ষাট হাজার গরু হরণ করলেন।

গোপদের প্রধান রথ নিয়ে দ্রুত রাজধানীতে এসে এই খবর দিয়ে বড় রাজকুমার উত্তরকে বলল, 'কুমার, আমাদের বড় বিপদ। মহারাজ যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন, আপনিই আমাদের রক্ষা করুন।'

কিশোর উত্তর বললেন, 'রথ চালাবার মত ভালো সারথি পেলে এখনই আমি ধনুর্বাণ নিয়ে এমন তেজে যুদ্ধ করতাম যে কৌরবেরা আমাকে মহাবীর অর্জুন ভেবে ভয়ে পালিয়ে যেতো।' কিন্তু রাজ্যে এখন কোন সারথি নেই।'

উত্তরের মুখে কয়েকবার এইভাবে অর্জুনের নাম শুনে দ্রৌপদী বললেন, 'কুমার উত্তর, এই বৃহন্নলা এক সময়ে অর্জুনের সারথি ছিলেন। রথ চালাতে এবং অস্ত্র চালনায় ইনি অর্জুনের মতই পটু। আপনার ছোট বোন উত্তরা যদি অনুমতি দেন তাহলে বৃহন্নলা অবশ্যই আপনার সারথি হবেন।'

উত্তরের কথা শুনে রাজকুমারী উত্তরা তখুনি অর্জুনের কাছে গিয়ে তাঁকে সারথি হয়ে যুদ্ধে যেতে রাজী করালেন।

অর্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশের ওপরেই যুদ্ধের বর্ম পরে উত্তরের রথের রাশ ধরে যাত্রা করলেন। যাত্রার আগে উত্তরা বললো, বৃহন্নলা তুমি কৌরবদের হারিয়ে তাদের সুন্দর সুন্দর কাপড় নিয়ে এসো, আমি সেগুলো দিয়ে পুতুলের পোশাক বানাবো।'

অর্জুন রথ ছুটিয়ে শশ্মানের কাছাকাছি এসেছেন। উত্তরের চোখে পড়লো কৌরব সৈন্যের বিরাট সমাবেশ, তাদের হুংকারে আকাশ-বাতাস থর থর করে কাঁপছে। উত্তর ভয় পেয়ে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'বৃহন্নলা, আমি ভীষ্ম দ্রোণদের মত মহারথীদের সাথে যুদ্ধ করার যোগ্য নই, চল আমরা ফিরে যাই।'

অর্জুন তাঁর কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, কুমার তুমি নিজেকে অর্জুনের সাথে তুলনা করে খুব অহংকার প্রকাশ করেছিলে, এখন ভয় পেলে চলবে কেন?'

এই কথা শুনে উত্তর রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালাতে চাইলে

অর্জুন তাঁকে ধরে রথে উঠালেন। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে কৌরবেরা হাসতে লাগলো। বিশেষ করে অর্জুনের বৃহন্নলার সাজের ওপর যুদ্ধ সাজ এবং কিশোর উত্তরের পালানো এইসব তাদের জন্য মজার ব্যাপার হয়ে উঠলো।

এবার অর্জুন কঠোর হলেন। উত্তরকে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে না। তুমি শুধু রথের রাশ ধরে থাকো, যুদ্ধ আমিই করবো।'

অর্জুনের নির্দেশে উত্তর রথ নিয়ে শমী বৃক্ষের কাছে গিয়ে গাছের চূড়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামালেন। অর্জুন সেই অস্ত্রের মোড়ক খুলে ফেলার সাথে সাথে সূর্য কিরণের মত ঝকঝকে উজ্জ্বল সব অস্ত্র দেখে উত্তর অবাক হয়ে বললেন, 'বৃহন্নলা তুমি কে? কি করে তুমি এইসব দিব্য অস্ত্রের খোঁজ পেলে?'

অর্জুন তাঁকে অস্ত্রগুলো দেখিয়ে বললেন, 'কুমার দেখ, এই সোনার কাজ করা এক হাজার সোনালী গোসাপ আঁকা এই ধনুকের নাম গাণ্ডীব। এটি খাণ্ডব বন দাহনের সময় বরুণ দেবের কাছ থেকে অর্জুন পেয়েছিলেন। এই অপূর্ব ধনুকটি যুধিষ্ঠিরের, আর সোনার কাজ করা ধনু ও বিশাল গদা ভীমের। সোনার পতঙ্গ আঁকা ধনু নকুলের আর সূর্য আঁকা ধনু সহদেবের। আর এখানে যত বাণ, খড়্গ, বর্শা, ভল্ল, তূণীর দেখছো সবই পঞ্চপাণ্ডবদের।

উত্তর মুগ্ধ হয়ে অস্ত্রগুলো দেখতে দেখতে জানতে চাইলেন, 'পাণ্ডবেরা কোথায়? তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র এখানে এলো কি করে?'

অর্জুন বললেন, 'কুমার, তোমরা জানো না যে আমিই অর্জুন, তোমার বাবার পাশা খেলার সাথী কংক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, রাজবাড়ীর পাচক বল্লভ হচ্ছেন ভীম, আর অশ্বশালার প্রধান নকুল, সহদেব হচ্ছেন

গো-শালার প্রধান। আমাদের স্ত্রী দ্রৌপদী রাণী সুদেষ্ণার মালিনী, যাঁকে অপমান করার জন্য তোমার মামা কীচককে ভীম সেনের হাতে মরতে হয়েছে।'

উত্তর বললেন, 'আপনাকে আমি অবিশ্বাস করছি না। দয়া করে অর্জুনের যে দশটি নাম আছে যদি সেগুলো আপনি বলতে পারেন তাহলে পুরোপুরি বিশ্বাস করে ধন্য হই।'

অর্জুন বললেন, 'তাহলে শোন, আমি বহুদেশ জয় করে ধন অর্জন করেছি বলে আমার নাম ধনঞ্জয় যুদ্ধে আমি চির বিজয়ী তাই আমার নাম বিজয়, আমার রথের ঘোড়াগুলো শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র তাই আমার নাম শ্বেত বাহন, উত্তর ও পূর্ব ফালগুনী নক্ষত্র যোগে আমার জন্ম বলে রাজজ্যোতিষী নাম দিয়েছিলেম ফালগুনী। দানবদের সাথে যুদ্ধ করার সময় দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে সূর্যের মত উজ্জ্বল একটি কিরীট (মুকুট) দিয়েছিলেন বলে আমার আর এক নাম কিরীটি। যুদ্ধের সময় কোন বীভৎস কাজ করাকে আমি ঘৃণা করি বলে আমাকে বীভৎসু নামে ডাকা হয়, আমার দুই হাতেই ধনু চালাবার সমান ক্ষমতা বলে পেয়েছি সব্যসাচী নাম, আমার চরিত্রের নির্মলতার জন্য সবাই আমাকে চেনে অর্জুন (অকলংক শুভ্র) নামে। শত্রুকে জয় করে আমি জিষ্ণু, আর আমার গায়ের রং কালো বলে আমার বাবা আদর করে কৃষ্ণ বলে ডাকতেন। এই দশটি নাম ছাড়াও আমার মার কুন্তী ও পৃথা নামটির জন্য আমাকে লোকে কখনও কৌন্তেয়, কখনও পার্থ বলে ডাকে।'

অর্জুনের কথা শুনে উত্তর তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মহাবাহু, এখন থেকে আপনার আদেশই আমার সবকিছু। দয়া করে শুধু এইটুকু বলুন, আপনি এই ক্লীব নপুংসক হয়ে

কেন জীবন কাটাচ্ছেন ?'

অর্জুন উত্তর দিলেন, 'ধর্মরাজের সত্য পালনের জন্য আমরা ছদ্মবেশে একবছর অজ্ঞাত বাস করেছি। এখন আর তার দরকার নেই, একবছর কেটে গেছে।'

অর্জুন তাঁর ছদ্মবেশ ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ যুদ্ধ সাজে সাজলেন তারপর অস্ত্রগুলোকে প্রণাম করে রথে উঠে উত্তরের রথের সিংহ ধ্বজ নামিয়ে নিজের কপিধ্বজ বসালেন এবং গাণ্ডীব ধনুতে টংকার দিলেন। সেই ভয়ংকর টংকার ধ্বনি শুনে কৌরবেরা বুঝে গেলো পার্থই তাঁদের সাথে যুদ্ধে নেমেছেন।

দ্রোণ বললেন, 'দুর্যোধন, সাবধান হও। গরুগুলোকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে দিয়ে এসো, আমরা কঠিন যুদ্ধের জন্য ব্যূহতৈরী করি।'
দুর্যোধন সে কথায় হা-হা করে হেসে বললেন, 'তেরো বছর পুরো হবার আগেই অর্জুন ধরা পড়ে গেছে। আর যুদ্ধ কিসের! আবার তাদের এক যুগ বনবাসে থাকতে হবে।'

ভীষ্ম বললেন, 'পাণ্ডবদের জ্ঞানকে অত তুচ্ছ কোর না। তিথি ও নক্ষত্রের হিসাবে অবশ্যই তেরো বছর পার হয়ে গেছে।'

ভীষ্মের কথায় কর্ণ ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'অর্জুনকে আজ আমার হাতে মরতেই হবে। পরশুরামের কাছে পাওয়া কুঠার দিয়ে আমি তাকে হত্যা করবো।'

কৃপাচার্য বললেন, 'রাধেয় কর্ণ (রাধার পুত্র), তুমি বড় নিষ্ঠুর! যুদ্ধ আর হত্যা ছাড়া কিছু ভাবতে পারো না। মনে রেখো, অর্জুনকে হত্যার শক্তি আমাদের কারুরই নেই।'

অশ্বত্থামাও বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন, 'কর্ণ, তুমি বীর একথা ঠিক। কিন্তু তোমার নীচ চক্রান্তের জন্যই রাজবধূ কৃষ্ণাকে অপ-

মানিতা হতে হয়েছিলো। এবার নিজের ভাগ্যের জন্য তৈরী হও।'

ভীষ্ম দেখলেন কর্ণও অশ্বত্থমার মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে আসছে। তিনি দু'জনকে শান্ত করে বললেন, 'সামনে আমাদের বিপদ, এখন নিজেদের মিলেমিশে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে হবে।'

হঠাৎ অর্জুনের শঙ্খধ্বনিতে আকাশ যেন চৌচীর হয়ে গেলো। দু'টি তীক্ষ্ণ বাণ ছুটে এসে দ্রোণের পায়ের কাছে পড়লো। দ্রোণাচার্য বললেন, 'তোমরা দেখো আমার প্রিয় শিষ্য কিভাবে আমাকে তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন।'

অর্জুন রথের ধ্বজা উড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ, দ্রোণ, বিকর্ণ ও অশ্বত্থামা এগিয়ে এলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন। ভীষ্ম মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে রক্ত-বমি করতে শুরু করলে অর্জুন নিজেই তাঁকে যত্ন করে রথে তুলে দিয়ে সারথিকে চলে যেতে বললেন।

এবার দুর্যোধন এলেন। ইন্দ্রের কাছে পাওয়া অস্ত্র দিয়ে অর্জুন চোখের নিমেষে দুর্যোধনকে আহত করে মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর উত্তরকে বললেন, 'কুমার তুমি এই সব রাজপুরুষদের সুন্দর ও রঙিন কাপড়গুলো খুলে নাও, রাজকুমারী উত্তরা এসব তাঁর পুতুলদের পরাবেন।'

অর্জুন পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণকে প্রণাম করে বললেন, 'খুব শীগগিরই আমরা রাজ্যে ফিরে গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করবো।'

অর্জুনের নির্দেশে উত্তর রথ নিয়ে রাজধানীর পথে সেই শমী বৃক্ষের কাছে এসে থামলেন। অস্ত্রগুলো আবার তাঁরা আগের মত

করে লুকিয়ে রেখে রথ নিয়ে যাত্রা করলেন। পথে অর্জুন উত্তরকে বললেন, 'কুমার, আমি না বলা পর্যন্ত তুমি রাজা বিরাটকে আমাদের পরিচয় দিও না। বরং তাঁকে এই কথা বলবে যে, তুমি নিজেই কৌরবদের পরাজিত করে গো ধন উদ্ধার করেছো।'

পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশ

পঞ্চপাণ্ডবের পরিচয় জানতে পেরে রাজা বিরাট যেমন অবাক তেমনি খুশি হলেন। দ্রুপদ রাজকন্যা রূপবতী দ্রৌপদীকে এতদিন দাসীর মত দেখেছেন বলে রাণী সুদেষ্ণা ভীষণ লজ্জা পেলেন।

বিরাট রাণী সুদেষ্ণার সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ সভার সবাইকে জানালেন, 'আমি পাণ্ডবদের আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধার জন্য রাজকুমারী উত্তরাকে সব্যসাচী অর্জুনের হাতে তুলে দিতে চাই। তিনিই হতে পারেন আমার মেয়ের যোগ্য স্বামী।'

অর্জুন এই কথা শুনে হাসিমুখে বললেন, 'মহারাজ, আপনার মেয়ে উত্তরাতো আমারও মেয়ে। তাকে আমার ছেলে অভিমন্যুর সাথে বিয়ে দিয়ে পুত্রবধু করতে পারলে আমি সুখী হব।

রাজা বিরাট অর্জুনের প্রস্তাবে মহা খুশি হয়ে বিয়ের উৎসবের আয়োজন করার আদেশ দিলেন। রাজধানীর কাছাকাছি উপপ্লব্য নগরে বিয়ের উৎসবের ব্যবস্থা হলো। পাণ্ডবেরা এবং বিরাট রাজারা সব আত্মীয় পরিজন নিয়ে সেখানে গেলেন। দ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, কৃতবর্মা ও সাত্যকি এলেন অভিমন্যু ও তাঁর মা সুভদ্রাকে

সাথে নিয়ে। এক অক্ষৌহিনী সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এলেন দ্রুপদ রাজ, তাঁর দুই ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে।

প্রায় একমাস ধরে বিয়ের ধুমধাম চলতে লাগলো। বিয়ের আসরে রাণী সুদেষ্ণা, রাজপুরীর সব সুন্দরী বধু ও মেয়েরা অপরূপ সাজে সেজে উপস্থিত হলেন। কিন্তু শ্যামলাবরণ দ্রৌপদীর রূপে, লাবন্যে এবং ব্যবহারের সৌন্দর্যে সেখানে সবার রূপ যেন ম্লান হয়ে গেলো।

কৃষ্ণের সামনে উত্তরা ও অভিমন্যুর বিয়ের অনুষ্ঠান হলো। বিরাট অভিমন্যুকে বহু হাজার হাতী, ঘোড়া ও ধনরত্ন যৌতুক দিলেন।

উদযোগ পর্ব

পাণ্ডবদের রাজ্য উদ্ধারের মন্ত্রণা

উত্তরা অভিমন্যুর বিয়ের উৎসব শেষ হবার পর পাণ্ডবেরা বিরাটের রাজসভায় বসলেন। উপপ্লব্যনগরের সেই সভায় রাজা বিরাট, দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, বিরাটের ছেলেরা, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণ সভার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা সকলে জানেন, দুর্যোধনের শঠতা ও ষড়যন্ত্রের ফলে পাণ্ডবেরা আজ তেরো বছর রাজ্যহারা। তাঁদের বহু দুঃখ-কষ্টের দিন কেটে গেছে, এখন তাঁদের রাজ্য ফিরে পাবার সময় এসেছে। কিন্তু আমরা জানিনা দুর্যোধন এ বিষয়ে কি ভাবছেন। আমাদের উচিত কৌরবদের সাথে পাণ্ডবদের বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করা। এজন্য কোন বুদ্ধিমান ও সুবিবেচক ব্রাহ্মণকে দূত হিসেবে হস্তিনাপুরে পাঠানো উচিত, যাঁর কথায় দুর্যোধন পাণ্ডবদের তাঁদের রাজ্য নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে দ্রুপদ বললেন, 'বাসুদেব কৃষ্ণ খুবই উপযুক্ত

উপদেশ দিয়েছেন। তবে দুর্যোধনের চরিত্র আমরা সকলেই জানি। তিনি কখনই আপোসে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন না। আমার পুরোহিতকে দূত হিসেবে পাঠানো চলে। ধর্মরাজ বলে দেবেন তাঁকে কি বলতে হবে। পাণ্ডবেরা আমার জামাতা, তাঁদের প্রতি আমারও একটা উপদেশ রয়েছে, তা হচ্ছে তাঁরা এই সাথে মিত্র রাজাদের কাছে সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য দূত পাঠান।'

কৃষ্ণ বললেন, 'দ্রুপদরাজ, আপনি বয়সে প্রবীন। ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ ও কৃপ আপনাকে বন্ধু বলে মনে করেন। পাণ্ডবদের জন্য মঙ্গলজনক হয় এমন বার্তা আপনিই পুরোহিতের কাছে বলে দিন। আমরা এখানে বিয়ের নিমন্ত্রণে এসেছিলাম, বিয়ের উৎসব শেষ হয়ে গেছে, এখন আমরা খুশী মনে দেশে ফিরে যাচ্ছি। দুর্যোধন যদি নির্বোধের মত যুদ্ধই চায় তাহলে আমাদের ডেকে পাঠাবেন, আমরা সব সময়ই পাণ্ডবদের জন্য তৈরী থাকবো।'

দ্রুপদ তাঁর পুরোহিতকে শান্তির বার্তা নিয়ে হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে বিশেষ করে বলে দিলেন, যাতে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, কৃপ, দ্রোণ ও ভীষ্মকে এমন ভাবে বোঝান যাতে তাঁরাই দুর্যোধনকে শান্তি ও সন্ধির পথে আনতে পারেন।'

দ্রুপদের পুরোহিত হস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও ভীষ্ম তাঁকে খুব সম্মানের সাথে সেবা-যত্ন করলেন এবং পাণ্ডবদের খবর বার্তা জানতে চাইলেন।

পুরোহিত ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি ধার্মিক ও জ্ঞানী। অথচ আপনার ছেলে দুর্যোধনের নিষ্ঠুর শঠতার জন্য পাণ্ডবেরা রাজ্য-হারা হয়ে তেরো বছর কষ্টে জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁরা তবুও কৌরব-দের বন্ধুত্ব চান। আপনি দুর্যোধনকে উপদেশ দিন পাণ্ডবদের রাজ্য

ফিরিয়ে দিয়ে শান্তি স্থাপন করতে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'বিপ্রশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবেরা আমারও স্নেহের পাত্র। তাঁদের দুঃখে আমিও দুঃখ বোধ করি।'

ভীষ্ম বললেন, 'অবশ্যই তাঁদের এখন নিজেদের রাজ্য ফিরে পাবার সময় হয়েছে।'

কর্ণ ভীষ্মকে বাধা দিয়ে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, যুধিষ্ঠির নিজের দোষেই ভাইদের ও স্ত্রীকে নিয়ে কষ্ট ভোগ করছে। এতে দুর্যোধনের দোষ কোথায়? আপনি তাদের বলে দেবেন দুর্যোধন তাঁদের এক টুকরো জমিও দেবেন না, রাজ্য তো দূরের কথা।'

ভীষ্ম কর্ণকে ধমক দিয়ে বললে, 'রাধেয়, বৃথা অহংকার দেখিও না। মৎস্যরাজের গরু উদ্ধার করার সময় অর্জুনের হাতে আমরা ছয়রথী যে হেরে গিয়েছিলাম সে কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি? তোমরা যদি এখনও পাণ্ডবদের সাথে শত্রুতা করতে চাও তাহলে শীগগিরই আমাদের সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে মরতে হবে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'কর্ণের এত দম্ভ কিসের! অর্জুনের বীরত্বের কথা আমাদের মনে রাখাই হবে বুদ্ধির কাজ। ব্রাহ্মণ, আপনি রাজা দ্রুপদের কাছে ফিরে যান এবং তাঁকে বলুন শীগগিরই আমি সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের কাছে খবর দিয়ে পাঠাবো।'

দ্বারকায় অর্জুন ও দুর্যোধন

যুধিষ্ঠির বিভিন্ন দেশের রাজাদের কাছে আসন্ন যুদ্ধের জন্য সবরকমের সহযোগিতা প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। অর্জুন নিজে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য যাত্রা করলেন।

গুপ্তচরের মুখে অর্জুনের দ্বারকা যাত্রার খবর পেয়ে দুর্যোধন তাঁর আগেই দ্বারকা পৌঁছুবার জন্য দ্রুতগামী রথ নিয়ে ঝড়ের বেগে যাত্রা করলেন।

কৃষ্ণের প্রাসাদে পৌঁছে অর্জুন ও দুর্যোধন একই সঙ্গে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে দেখলেন বাসুদেব ঘুমিয়ে রয়েছেন। দুর্যোধন কৃষ্ণের শিয়রের মূল্যবান আসনটিতে বসলেন। অর্জুন তাঁর পায়ের দিকের আসনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঘুম ভেঙ্গে কৃষ্ণ প্রথমে পায়ের কাছে অর্জুনকেই দেখতে পেলেন, তারপর মাথার দিকে বসা দুর্যোধনকে তাঁর চোখে পড়লো। বাসুদেব তাঁদের স্বাগত জানিয়ে আসবার কারণ জানতে চাইলেন।

দুর্যোধন হাসিমুখে বললেন, 'মাধব, আমার ইচ্ছা আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও। অর্জুনের মত আমিও তোমার আত্মীয়। তোমার ঘরে আমিই আগে ঢুকেছি, সে হিসেবে আমার দাবীই বেশী।'

কৃষ্ণ বললেন, 'কুরুবীর, তুমি আমার ঘরে আগে ঢুকেছো একথা আমি অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু অর্জুনকেই আমি প্রথমে দেখতে

পেয়েছি। পার্থ আমাদের দু জনের চেয়েই বয়সে ছোট, স্নেহের পাত্র। এজন্য পার্থের সঙ্গেই আমি আগে কথা বলব। তবে তারও আগে তোমরা দু'জনেই জেনে রাখো, আমি যুদ্ধ চাই না, যুদ্ধের হিংস্র নৃশংসতাকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। অর্জুন শোন, আমার দশ কোটি দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা আছে। তুমি সেই সৈন্যবাহিনী চাও, না যুদ্ধবিমুখ আমাকেই চাও? ভালো করে ভেবে দেখো, যুদ্ধে আমি কিন্তু অস্ত্র ধারণ করবো না।'

অর্জুন বললেন, 'প্রিয় মাধব, আমি শুধু তোমাকেই চাই।'

দুর্যোধন দশকোটি নারায়ণী যোদ্ধা নিলেন এবং এই ভেবে মহা-খুশী হলেন যে, যুদ্ধে অস্ত্র এবং সৈন্যবলই প্রধান সহায়।

এরপর দুর্যোধন কৃষ্ণের ভাই বলরামের সাহায্য চাইলে বলরাম বললেন, 'যুবরাজ দুর্যোধন, তুমি এবং অর্জুন দু'জনেই আমাদের আত্মীয়। অর্জুন আমাদের বোন সুভদ্রার স্বামী, আবার কৃষ্ণের ছেলে শাম্বের সাথে তোমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এ অবস্থায় আমি কারুরই বিপক্ষে যেতে পারি না। তাছাড়া আমি চাই তোমরা শান্তির কথা চিন্তা করে মিলেমিশে থাকো, কুরুপাণ্ডবে মহা মিলন হোক।'

দুর্যোধন দ্বারকা থেকে ভোজরাজ্যে এসে রাজা কৃতবর্মার কাছ থেকে তাঁর সহায়তা এবং এক অক্ষৌহিনী সৈন্য লাভ করলেন।

দুর্যোধন চলে যাবার পর কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যুদ্ধ করবো না জেনেও কেন তুমি দশকোটি নারায়ণী সেনার বদলে আমাকেই চাইলে ধনঞ্জয়?

অর্জুন উত্তর দিলেন, 'কেশব কৃষ্ণ, এই যুদ্ধ আমরাও চাইনি, কৌরবেরা এতে আমাদের বাধ্য করেছে। তোমার যেমন শক্তি তেমনি যশ আছে। ইচ্ছা করলে চোখের নিমেষে কুরুপাণ্ডব দুই

বংশকেই ধ্বংস করে দিতে পারো। কিন্তু মাধব, আমি তোমার ধ্বংসের শক্তি চাই না, শুধু তোমার যশের কণা মাত্র পেলেই ধন্য হবো। আমি নিজেও শক্তিমান যোদ্ধা, তারওপর ইন্দ্রলোক থেকে দিব্য অস্ত্র লাভ করেছি। সখা, আমার চিরদিনের সাধ যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমার রথের সারথি হবে। এ আমার জন্য স্পর্ধা হলেও তুমি দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দিও না।'

কৃষ্ণ মধুর হেসে বললেন, 'ফালগুনী, এই স্পর্ধা একমাত্র তোমাকেই সাজে।'

যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ পেয়ে মদ্রদেশের রাজাশল্য তাঁর বিরাট সৈন্যদল ও বীর ছেলেদের নিয়ে উপপ্লব্য নগরে যাত্রা করেছেন এই খবর পেয়ে দুর্যোধন পথের মাঝে তাঁর জন্য একটি চমৎকার প্রাসাদ তৈরী করে সেখানে সবরকমের আরাম ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করলেন।

দুর্যোধন নিজে গোপনে থেকে তাঁর লোকজনদের দিয়ে শল্যের সেবা যত্ন এবং নানারকম সুখ ও আনন্দের বন্যা বইয়ে দিলেন। শল্য কিন্তু ধরে নিয়েছিলেন পাণ্ডবেরাই তাঁর জন্য এই সুন্দর বাড়ীটি তৈরী করে এত যত্ন ও আনন্দের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের যে কর্মচারী আমাদের জন্য এই অপূর্ব বাড়ীটি তৈরী করে সবরকমের আরাম ও আনন্দের আয়োজন করেছে তাকে ডেকে আনো আমি তাকে পুরস্কার দেবো।'

এই কথা শুনে দুর্যোধন আড়াল থেকে সামনে এসে বললেন, 'মহারাজ, আপনার জন্য এই প্রাসাদ এবং সবরকমের সুব্যবস্থা আমার নির্দেশেই করা হয়েছে।'

শল্য খুশী হয়ে বললেন, 'কৌরবশ্রেষ্ঠ, বল তুমি আমার কাছে কি

চাও ? আমি অবশ্যই তোমার আশা পূর্ণ করবো।'

দুর্যোধন বললেন, 'আপনার কথাই সত্যি হোক। আমার ইচ্ছা যুদ্ধে আপনি আমার সমস্ত সেনার নেতৃত্ব করুন।'

শল্য আর কি করবেন। বাধ্য হয়েই তাঁকে দুর্যোধনের অনুরোধে রাজী হতে হলো।

উপপ্লব্য নগরে পৌঁছে শল্য যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের সব কথা বললেন। ধর্মরাজ এতে একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, 'দুর্যোধনকে আপনি যে কথা দিয়েছেন অবশ্যই তা রক্ষা করবেন। তবে আমারও একটি অনুরোধ রয়েছে তা হচ্ছে কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের যখন রথ নিয়ে যুদ্ধ হবে তখন আপনি কর্ণের সারথি হবেন এবং যেভাবে হোক অর্জুনকে রক্ষা করবেন। আপনি আমাদের মামা, আমাদের মা কুন্তীর জন্য হলেও এটুকু আপনাকে করতেই হবে।'

শল্য বললেন, 'যুধিষ্ঠির, তুমি আমার পরম স্নেহের পাত্র। তোমার ইচ্ছা আমি নিশ্চয়ই পূর্ণ করবো। দ্যূতসভায় দুর্যোধনেরা কৃষ্ণাকে যে অপমান করেছে, শঠতা করে তোমাদের যে দুর্দশায় ফেলেছে তাতে কুন্তীর ভাই হিসেবে আমার কর্তব্য ছিলো আসন্ন যুদ্ধে তোমাদের পক্ষ হয়ে তাদের ধ্বংস করা। ধূর্ত দুর্যোধন কৌশলে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করেছে, তবু আমি কর্ণের সারথি হয়ে তাকে এমন সব কথা বলব যাতে তার মনোবল ভেঙ্গে যায়।'

ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ঠিকই জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে সম্পূর্ণ বিনা দোষে শুধু মাত্র কর্ণ শকুনি ও দুর্যোধনের অকারণ বিদ্বেষের জন্য পাণ্ডবদের এত কষ্ট। তার ওপর এখনও দুর্যোধন তাদের অস্ত্র ফিরিয়ে না দিয়ে যুদ্ধের জন্য তোড়জোড় করছে। তিনি সঞ্জয়কে ডেকে বললেন, 'সঞ্জয়, তুমি উপপ্লব্য নগরে গিয়ে পাণ্ডবদের বলবে, আমি তাদের আপন সন্তানের মতই স্নেহ করি, আমি চাই না তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হোক, অশান্তি হোক।'

সঞ্জয় উপপ্লব্য নগরে পৌঁছোলে যুধিষ্ঠিরেরা তাঁকে দেখে খুবই খুশী হলেন। তাঁর মুখে ধৃতরাষ্ট্রের খবর শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, 'প্রিয় সঞ্জয়, তোমার মুখে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথা মনে হচ্ছে আমি যেন পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্রকেই দেখছি। কিন্তু তিনি জ্ঞানী ও সুবিবেচক হয়েও কেন তাঁর ছেলেদের যুদ্ধের পথ থেকে সরিয়ে আনছেন না? তাঁরা যদি যুদ্ধ চান তাহলে আমি এক তরফা কি করে শান্তি স্থাপন করতে পারি?'

সঞ্জয় বললেন, 'ধর্মরাজ, আপনি জ্ঞানী ও অজাত শত্রু। আপনিই শান্তির উপায় ঠিক করুন। আপনারা পাঁচভাই দেবতার মত পবিত্র, ইন্দ্রের মত শক্তিমান। আমরা জানি কোন অবস্থাতেই আপনারা ধর্মত্যাগ করতে পারেন না।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'সঞ্জয়, এই সভায় আমার আপনজনেরা সবাই রয়েছেন, তুমি তাঁদের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা জানিয়ে দাও।'

সঞ্জয় সভার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমি জানি তাঁর এই প্রস্তাব আপনারা আনন্দের সাথে গ্রহণ করবেন। মহাবীর এবং ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদের কাছে আমার অনুরোধ যুদ্ধের মত হীন কাজকে আপনারা ঘৃণার সাথে ত্যাগ করুন, আপনাদের ফুলের মত পবিত্র চরিত্রে যেন এক বিন্দু পাপের কালিও না লাগে। যুদ্ধে যদি কৌরবেরা ধ্বংস হয় তবে আত্মীয় হত্যার শোক আপনাদের জন্যও ভয়ানক দুঃখের কারণ হবে। মোট কথা যুদ্ধে যে পক্ষেরই জয় হোক না কেন কোন পক্ষের জন্য তা কল্যাণ বয়ে আনবে না। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রুপদ রাজার কাছে হাতজোড় করে এই ভিক্ষা চাই, তাঁরা পাণ্ডবদের সন্ধি ও শান্তির জন্য উপদেশ দেবেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'সঞ্জয়, আমি যুদ্ধ চাই একথা তো কখনও বলিনি, তবে কেন তুমি বার বার সন্ধির কথা তুলছো? বিনা যুদ্ধে যদি নিজের রাজ্য ফিরে পাই তাহলে যুদ্ধের কথা চিন্তা করাও তো অর্থহীন। কিন্তু আমার অবাক লাগছে এই ভেবে যে, ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে শান্তির বার্তা আর সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু কই! আমাদের রাজ্য নেবার জন্য তো তিনি আমন্ত্রণ জানাননি। সঞ্জয় আমাদের দুঃখ ও অপমান সবই তো তোমার জানা, তোমার অনুরোধে আমি সমস্তই ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু দুর্যোধন তার আগে আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন, ইন্দ্রপ্রস্থ আবার আমার হোক। একমাত্র এই শর্তেই আমি সব ক্ষমা করতে পারি, সব দুঃখ বেদনা ভুলে যেতে পারি।'

সঞ্জয় বললেন, 'ধর্মরাজ, কৌরবেরা যদি আপনার রাজ্য না ফিরিয়ে দেয়, তবু ক্ষমাই হওয়া উচিত আপনার ধর্ম। হয়তো আপনার বন্ধু ও অমাত্যেরা আপনাকে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দেবেন, তাহলে তাঁদের

হাতেই সব ছেড়ে দিয়ে পুণ্যের পথে চলে যান।

যুধিষ্ঠির বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সঞ্জয়, আমি যদি কখনও অধর্মের কাজ করি তখন তুমি ধর্মের উপদেশ দিও। আমি ভগবান বাসুদেবের উপদেশ মত চলি, তিনি যে উপদেশ দেবেন তা-ই হবে কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষের জন্য মঙ্গলজনক। আমি তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করছি।'

কৃষ্ণ বললেন, 'যুধিষ্ঠির ক্ষমাশীল ও শান্তি প্রিয়। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা লোভী ও পাপাত্মা। অতএব বিবাদ হবেই। যুধিষ্ঠির ধার্মিক হলেও তিনি ক্ষত্রিয় রাজা। ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উদ্ধার করাটা তার জন্য পুণ্যেরই কাজ। যুদ্ধে যদি পাণ্ডবেরা মৃত্যুবরণ করেন তা হবে বীরের মৃত্যু আর যদি দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি এঁদের বধ করতে পারেন তাহলে এঁরা দস্যু হত্যার পুণ্যলাভ করবেন। ধৃতরাষ্ট্রের সভায় যেদিন লক্ষীরূপিনী দ্রৌপদী চরম লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন সেদিন ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম এঁরা কেন চুপ করেছিলেন? সেই অপমানের দৃশ্য তো সঞ্জয়, তুমিও দেখেছিলে। এখন সব ভুলে কি করে পাণ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছো বলতে পারো, এখন যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে বলি শান্তির পথে এগিয়ে আসতে তিনি কি আমার কথা শুনবেন?'

সঞ্জয় লজ্জিত ভাবে 'না' সূচক মাথা নাড়লেন। তখন কৃষ্ণ গম্ভীর-ভাবে বললেন, 'সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রকে বলো, পাণ্ডবেরা অবশ্যই শান্তি চায়, তবে প্রয়োজনে যুদ্ধকেও তারা ভয় করবে না।'

হস্তিনাপুরে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'মহারাজ, আপনি দুর্যো-ধনের জন্য স্নেহে এমনই অন্ধ যে পাণ্ডবদের ওপর তার একের পর এক অন্যায়কে মেনে নিচ্ছেন। এতে পৃথিবীময় আপনার অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকজন নীচমনা লোকের বুদ্ধিতে চলে আজ আপনি আপনার সুনাম, ন্যায় বুদ্ধি, ধর্ম বুদ্ধি হারিয়ে এমন অবস্থায়

দাঁড়িয়েছেন যে এখন এই বিরাট রাজ্য রক্ষা করার কোন শক্তিই আপনার নেই। অথচ মনে মনে আপনি যুদ্ধই চান। যাই হোক, আমি পথের শ্রমে বড় ক্লান্ত, অনুমতি দিন বিশ্রাম করতে যাই। কাল কথা হবে।'

সঞ্জয় চলে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, 'বিদুর, তুমি আমাকে এমন সৎপরামর্শ দাও, যাতে সবদিক রক্ষা পায়।'

বিদুর বললেন ? 'মহারাজ, আপনি যদি দুর্যোধনের সম্বন্ধে মোহে অন্ধ না হতেন তাহলে ঠিকই বুঝতেন পাণ্ডবেরা কতখানি সৎ ও ন্যায়-পরায়ণ, এবং যুধিষ্ঠিরই একমাত্র পৃথিবীর সম্রাট হবার যোগ্য। আমি বলব, এখনও সময় আছে, এখনও আপনি তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে চরম সর্বনাশের হাত থেকে কৌরবদের রক্ষা করুন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'তুমি সত্যিকারের জ্ঞানীর মতই উপদেশ দিয়েছো। আমিও পাণ্ডবদের সঙ্গে ন্যায়সংগত ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু দুর্যোধন সামনে এলেই আমার সব শুভবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। আসলে মানুষের ভাগ্যই শক্তিমান, নিয়তিকে কে রোধ করতে পারে ?'

হস্তিনাপুর রাজসভায় বিতর্ক

পরদিন রাজসভায় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সঞ্জয় উপপ্লব্য নগরে যুধিষ্ঠির-দের সঙ্গে তাঁর যে সব কথাবার্তা হয়েছিলো সব বিস্তারিতভাবে জানালেন। তাঁর সব কথা শুনে পিতামহ ভীষ্ম বললেন, 'আমি ধর্মজ্ঞ ঋষিদের কাছে শুনেছি কৃষ্ণ ও অর্জুন দু'জনে পূর্বজন্মে নর ও

নারায়ণ নামে দুই ঋষি ছিলেন। এজন্মেও তাঁদের পরাজিত করার মত কোন দেবতা অথবা দানব পৃথিবীতে জন্মায়নি। প্রিয় দুর্যোধন, তুমি ঐ নীচ কর্ণ, পাপী শকুনি ও নির্বোধ দুঃশাসনের পরামর্শ না শুনে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও, তাদের সাথে শান্তি স্থাপন কর।'

ভীষ্মের কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে কর্ণ বললেন, 'পিতামহ, কবে আপনি আমাকে নীচ কাজ করতে দেখেছেন? মনে রাখবেন আমার প্রতিজ্ঞা যুদ্ধে আমি পাণ্ডবদের বধ করবই। আশাকরি এটা কোন নীচ কাজ বলে মনে করবেন না।'

দ্রোণাচার্য বললেন, 'রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম অতি সৎ উপদেশ দিয়েছেন। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাণ্ডবদের রাজ্যে ফিরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। পার্থের সমান ধনুর্ধর পৃথিবীতে নেই একথা ভুলে গেলে চলবে না।'

ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণের কথায় কান না দিয়ে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি পাণ্ডবদের কাছে আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর কথা বলনি? যুদ্ধে তাঁদের কোন্ কোন্ রাজা সাহায্য করবেন? তাঁদের যুদ্ধের প্রস্তুতিই বা কেমন?'

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে সঞ্জয়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

বিদুর মন্তব্য করলেন, 'পাণ্ডবদের ধীর অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অসীম বলবীর্য এবং যুদ্ধে কৌরবদের পরিণতির চিন্তা সঞ্জয়কে ভয়ানক চিন্তিত করেছে।

কিছুক্ষণ পর সুস্থ হয়ে উঠে সঞ্জয় বললেন, 'রাজা, আপনি ও আপনার পুত্ররা পাণ্ডবদের যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা জানতে চান? তাহলে শুনুন, যুধিষ্ঠিরের মহাতেজী ভাইরা, মহাবীর দ্রুপদ, তাঁর ছেলে

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, কেকয় রাজার ছেলেরা, বৃষ্ণিবংশীয় বীর সাত্যকি, দ্রৌপদীর পাঁচজন বীর ছেলে, শিশুপালের ছেলে ধৃষ্টকেতু ও শরভ, জরাসন্ধের দুই ছেলে সহদেব ও জয়সেন এবং সবার উপরে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ—এঁরা সবাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহায়। অতএব পাণ্ডবদের যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা আর নতুন করে বলার নেই বলেই আমি মনে করি।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'আমি ভীমকেই সবচেয়ে ভয় করি। সে ক্ষমাহীন, ঠাট্টার সময়ও হাসে না। এই পিঙ্গল চোখ ভীমের গদাঘাতেই হয়তো আমার ছেলেরা শেষ হয়ে যাবে। নিয়তি! পাণ্ডবেরা জয়ী হবে জেনেও আমার ছেলেরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে, এযে কি ভয়ংকর! আমি জানি ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপ এই তিনজন বীর কৌরবের সহায়, তাঁরা আমার ছেলেদের নেতৃত্ব দেবেন কিন্তু পাণ্ডবদের মত সারথি, যোদ্ধা এবং দিব্য অস্ত্র আমাদের নেই। যুদ্ধ করাকে আমি আদৌ উচিত মনে করছি না। আপনারা ভেবে দেখুন, শান্তি এখন আমাদের কতবড় কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আমি চাই কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে মিলন হোক, সে মিলনের বাঁশীর সুর হস্তিনাপুর থেকে ইন্দ্রপ্রস্থে ছড়িয়ে পড়ুক।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ দু'চোখ থেকে দরদর করে জল ঝরে পড়তে লাগলো।

দুর্যোধন বললেন, 'পিতা, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? তেরো বছর বনে থেকে পাণ্ডবেরা এখন সহায় সম্বলহীন। তাদের বিরাট রাজ্য, বিশাল সৈন্যবাহিনী এখন আমাদের হাতে। এইসব রাজ্যের রাজারাও আমাদের দলে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, জয়দ্রথ ও ভগদত্তের মত মহারথীরা আমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন। আপনি ভীমকে ভয় পান, অথচ গদাযুদ্ধে আমি তো ভীমের চেয়েও

শক্তিমান। এ ছাড়া আমাদের যে দশকোটি সংশপ্তক সৈন্যবাহিনী (যে সৈন্যবাহিনী মরণপণ যুদ্ধ করে অর্থাৎ Suicidal Squad) রয়েছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে হয় তারা অর্জুনকে বধ করবে না হয় নিজেরা অর্জুনের হাতে মরবে। পাণ্ডবদের মাত্র সাত অক্ষৌহিনী সেনা, আর আমাদের এগারো অক্ষৌহিনী। মোট কথা পাণ্ডবেরা সবদিক থেকেই আমাদের তুলনায় হীন ও দুর্বল।'

ধৃতরাষ্ট্র বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার ছেলে প্রলাপ বকছে। এ কখনই ধর্মরাজকে জয় করতে পারবে না। আমরা সকলেই যুদ্ধের বিপক্ষে। দুর্যোধন তুমি যুদ্ধের চিন্তা বাদ দাও, পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও।'

দুর্যোধন উদ্ধতভাবে উত্তর দিলেন, 'মহারাজ জেনে রাখুন, আমি কারুর ভরসায় যুদ্ধ করতে চাই না। আমার রাজ্য, ধনসম্পদ, জীবন সব শেষ হয়ে গেলেও আমি পাণ্ডবদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবো না।'

দুর্যোধনের কথায় সভার সকলেই হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করাতে তিনি চীৎকার করে ঘোষণা করলেন, 'রাজ্য দূরে থাক, সুঁচের আগায় যতটুকু মাটি ধরে, বিনা যুদ্ধে সেটুকুও আমি পাণ্ডবদের দেব না।'

ধৃতরাষ্ট্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করলাম। যাঁরা তার হয়ে যুদ্ধ করবে, তাঁদের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। পাণ্ডবেরা পরোক্ষভাবে দেবতাদের সন্তান, দেবতাদের আশিসে আর সাহায্যে তারা জয়ী হবেই।'

দুর্যোধন বললেন, 'তাই যদি হতো তাহলে পাণ্ডবেরা এতকাল বনে জঙ্গলে পড়ে থাকতো না। তাছাড়া দেবতার আশিস আমিও পেয়েছি। মন্ত্রবলে আমি আগুন নেবাতে পারি, শিলাবৃষ্টি ও ঝড়

থামাতে পারি, জলকে থামিয়ে দিয়ে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারি। আমি যা উচ্চারণ করি তাই সত্য হয় বলে আমাকে লোকে "সত্যবাক" বলে।'

কর্ণও নিজের বলবীর্যের কথা বলে অহংকার প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, 'কর্ণ, যম তোমাকে গ্রাস করতে তৈরী হয়েছেন। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের আঘাতে তোমার ইন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া শক্তি অস্ত্র ছাই হয়ে যাবে, অর্জুনের বাণের মুখে তোমার সর্পমুখ বাণ এক মুহূর্তও টিঁকবে না। স্বয়ং বাসুদেবই অর্জুনকে রক্ষা করবেন।'

কর্ণ ভীষণ রেগে বললেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি যতক্ষণ পিতামহ ভীষ্ম বেঁচে রইবেন ততক্ষণ আমি তাঁর সাথে যুদ্ধ কিংবা সভায় থাকবো না। তবে তাঁর মৃত্যুর পর পৃথিবীর রাজারা আমার ক্ষমতা, আমার শক্তি দেখবেন।'

এই বলে কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করে সভা থেকে চলে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দুর্যোধনকে অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু দুর্যোধন সেসব কথা কানেও তুললেন না।

কৃষ্ণের অভিমত ও দ্রৌপদীর ক্ষোভ

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে চলে যাবার পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, তুমি ছাড়া এই বিপদ থেকে কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। ধৃতরাষ্ট্র শান্তি চান কিন্তু আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা বলেন না। মাধব, আমি আমার মা আর আমার প্রিয়জনদের প্রতি কোন কর্তব্যই

করতে পারছি না। এ দুঃখ আমি আর বইতে পারি না। দ্রুপদ, বিরাট, বলরাম সবাই আমাদের সহায়, সবার ওপরে তুমি রয়েছো তবু আমি কৌরবদের কাছে মাত্র পাঁচখানা গ্রাম চেয়েছিলাম, রাজ্য নয় শুধু পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে আমরা স্বাধীন জীবন গড়তে চেয়েছিলাম, শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্যোধন তাতেও রাজী হয়নি, এখন আমি স্থির করেছি, রাজ্য উদ্ধারের জন্য যুদ্ধে নিহত হব সেও ভালো তবু এই ভিখারীর জীবন সহ্য করবো না। মাধব, তুমি আমাকে পথের নির্দেশ দাও। কৃষ্ণ বললেন, ধর্মরাজ, যাতে আপনাদের দুই পক্ষেরই কল্যাণ হয় এমন চেষ্টা করার জন্যই আমি হস্তিনাপুরে যাবো বলে ঠিক করেছি।

যুধিষ্ঠির চিন্তিত হয়ে বললেন, 'যদি পাপাত্মা দুর্যোধন কেশব কৃষ্ণের কথা না রাখে!'

কৃষ্ণ হেসে উঠে বললেন, 'তাই যদি হয় তাহলে যুদ্ধ! আপনারা মনে মনে যুদ্ধের জন্যই তৈরী হোন।'

ভীম বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'মধুসূদন তুমি হস্তিনাপুরে গিয়ে শান্তির পক্ষেই কথা বলো। আমরা না হয় শান্তির জন্য হীনতাকেই মেনে নেবো। তবু ভরত বংশ যেন নষ্ট না হয়। আমি অর্জুন এবং ধর্মরাজ—আমরা সবাই শান্তির স্বপক্ষে।'

ভীমের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো। হাসির সুরেই তিনি বললেন, 'হায় ভীম। তোমার সেই গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করার, দুঃশাসনের বুক চিরে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলার প্রতিজ্ঞা কোথায় গেলো? বৃকোদর ভীম, তোমার এই গ্লানি এবং অবসাদ তোমার অযোগ্য, ক্ষত্রিয়ের জন্য লজ্জার ব্যাপার, তুমি এত দুর্বল হলে কি করে?'

ভীম বন্যঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, 'মধুসূদন, তুমি আমাদের প্রভু ও বন্ধু, তোমার অন্যায় কথা তাই সহ্য করলাম। যদি ঘোর যুদ্ধ শুরু হয় তখন তুমি আমার আসল রূপ দেখতে পাবে। একমাত্র ভরত বংশ যাতে ধ্বংস না হয় সেজন্যই আমি শান্তির কথা বলেছিলাম।'

কৃষ্ণ ভীমকে মিষ্টি কথায় শান্ত করে অর্জুনের মতামত জানতে চাইলে অর্জুন বললেন, তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মতকেই সমর্থন করেন।

নকুল হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, 'মাধব, বনবাসের ও অজ্ঞাত-বাসের সময় আমাদের বুকের ভেতর প্রতিশোধের যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিলো এখন তা এমন মৃদু হয়ে গেলো কেন? তোমার দয়াতে আমাদের সাত অক্ষৌহিনী সেনা প্রস্তুত হয়েছে, ভীমার্জুনের বীরত্বের কথায় জগতের বীরশ্রেষ্ঠরা ভীত হন, সবার ওপরে তুমি আমাদের সহায়। তবু কেন আমরা শান্তি ভিক্ষা চাইছি?

সহদেবও তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'ধর্মরাজ ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের ক্লীবের জীবন মেনে নিতে বলছেন, কিন্তু আমরা খাঁটি ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধ চাই। কৃষ্ণার সেই ভীষণ অপমানের পর দুর্যোধন যে এখনও বেঁচে আছে এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে পাণ্ডব-দের জন্য। ধর্মরাজ, ভীম ও অর্জুন ধর্ম নিয়েই থাকুন আমি ধর্মত্যাগ করে যুদ্ধ করবো।'

সহদেবের কথা শুনে সাত্যকি ও সভার অন্যেরা 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করলেন।

এরপর পদ্মপাপড়ির মত দু'চোখ ভরা জল নিয়ে কৃষ্ণের সামনে এসে বললেন, প্রিয় সখা, দ্যূতসভায় আমার সেই অপমানের কথা

মনে করে তুমি অন্ততঃ শান্তির স্বপক্ষে কথা বোল না। মাধব, যজ্ঞবেদী থেকে জন্ম বলে আমি পাঞ্চাল রাজকন্যা যাজ্ঞসেনী, পঞ্চ পাণ্ডবের স্ত্রী, সবার ওপর তোমার প্রিয়সখী। তোমরা বেঁচে থাকতে হস্তিনাপুরে প্রকাশ্য রাজসভায় আমি চরম লাঞ্ছিত হয়েছি, দুঃশাসন যখন আমার বস্ত্র হরণ করতে চেষ্টা করেছিল তখন আমার স্বামীরা পুতুলের মত নির্বিকার দাঁড়িয়েছিলো, আর আমি তোমাকেই স্মরণ করে বলেছিলাম, লজ্জাহারী মধুসূদন আমাকে এই লজ্জা থেকে রক্ষা কর। তারপরও ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে আমি পাণ্ডবদের জন্য মুক্তি ভিক্ষা করে নিয়েছি। ধিক্! ধিক্ পঞ্চপাণ্ডবের ধর্মের দোহাইকে। কৃষ্ণা আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর ঘন চুলের লম্বা বেনী কৃষ্ণের সামনে তুলে ধরে বললেন, হস্তিনাপুরের সভায় কৌরবদের সাথে কথা বলার সময় তুমি এই বেণীর কথা স্মরণ কোর। আমার এই বেণী ধরে টেনে দুঃশাসন আমাকে অন্তঃপুর থেকে দ্যূতসভায় নিয়ে এসেছিলো। আমার স্বামীরা যদি সেই অপমানের প্রতিশোধ না নেয় তাহলে আমি পাঞ্চাল রাজ্যে গিয়ে আমার পিতা দ্রুপদ, ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর আশ্রয় নেব। তাঁরা তাঁদের যাজ্ঞসেনীর অপমানের প্রতিশোধ নেবে। তেরো বছর আমি বুকের ভেতর আগুনের কুণ্ড নিয়ে কাটাচ্ছি, আর এখনও আমাকে পঞ্চপাণ্ডবের মুখে ধর্মের কথা শুনতে হবে?

দ্রৌপদী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হয়ে বললেন, 'কৃষ্ণা শান্ত হও, তোমার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি সবরকম ব্যবস্থা করব। কথা দিচ্ছি, কৌরবেরা সবংশে ধ্বংস হবে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মৃতদেহ দেখে তাদের স্ত্রীরা হাহাকার করবে। শীগগিরই তুমি পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী হবার গৌরব লাভ করবে।'

কৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন

কার্তিক মাস। হেমন্তের এক স্নিগ্ধ প্রভাতে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে যাত্রার জন্য তৈরী হলেন। স্নান ও পূজা সেরে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন, সূর্য ও আগুনকে স্তব করলেন। তারপর সাত্যকিকে তাঁর গরুড় ধ্বজ রথে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং সমস্ত শক্তি অস্ত্র তুলে দিতে বললেন। ঋষি বশিষ্ঠ, বামদেব, নারদ, শুক্রাচার্য প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিরা তাঁকে বিদায় জানাতে এলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মাধব, তুমি শান্তি বার্তা নিয়ে যাচ্ছো, সঙ্গে তাহলে এত অস্ত্র কেন?'

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'শত্রুকে আমি কখনই অবজ্ঞা এবং বিশ্বাস করি না।'

যুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'মাধব তুমি আমাদের মা কুন্তীকে আমাদের হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরো।'

পার্থ বললেন, 'দুর্যোধন যদি তোমাকে সামান্যতম অবজ্ঞাও করে তাহলে তাকে আমার হাতে মরার জন্য তৈরী হতে বলো।'

পার্থের কথা শুনে ভীম আনন্দে উল্লাসে গর্জন করে উঠলেন, সেই গর্জনে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো, সৈন্যেরা জয়ধ্বনি করতে লাগলো।

কৃষ্ণের সারথি দারুক রথের রাশ ধরার পর নারদ, মৈত্রেয়, দেবল, ব্যাসদেব পরশুরাম কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, কৌরবসভায় তোমার

ভাষণ শোনার জন্য আমরাও ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকবো।

দারুক ঝড়ের বেগে রথ ছুটিয়ে দিলো।

কৃষ্ণ আসছেন শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ছেলেদের ডেকে কৃষ্ণের জন্য রাজকীয় সম্বর্ধনা ও তার আসার পথে পথে নানারকম খাবার বিশ্রাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। তিনি নিজে কৃষ্ণকে তাঁর রাজকোষের মহামূল্যবান ধনরত্ন, সোনার রথ, উৎকৃষ্ট হাতী, ঘোড়া এবং দাসদাসী উপহার দেবেন বলে ঠিক করলেন।

এতসব আয়োজন দেখে বিদুর বললেন, 'মহারাজ, আপনি যে কৃষ্ণকে উপহারের ছলনায় উৎকোচ দিয়ে বশ করতে চাইছেন এটা বুঝতে তার এক পলও দেরী হবে না। যেক্ষেত্রে পঞ্চপাণ্ডবকে মাত্র পাঁচখানা গ্রাম দিতে আপনি রাজী নন সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ কখনই আপনার এসব উপহার নেবেন না সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন।'

দুর্যোধন বললেন, 'বিদুর ঠিকই বলেছেন। অযথা তাঁকে উপহারের নামে উৎকোচ দিতে চেষ্টা করার কোন মানে হয় না। তাঁকে রাজকীয় সম্মান দেখানোই আমি যথেষ্ট বলে মনে করছি। এজন্য মহারাজের নির্দেশ মত আমরা রাজধানীকে পতাকা ও ফুলে সাজিয়েছি। রাজকুমার রাজকুমারীরা তাঁর চলার পথে ঝারি সুগন্ধ জল ছিটিয়ে ও ফুল ছড়িয়ে তাঁকে বরণ করবে।'

ভীষ্ম বললেন, 'তোমরা যদি এতসব সম্মান সম্বর্ধনার আয়োজন না করে শুধু মাত্র কৃষ্ণের উপদেশ মেনে নাও তাতেই তিনি সুখী হবেন।'

দুর্যোধন বললেন, 'কৃষ্ণ যতই বলুন না কেন আমি কখনই পাণ্ডবদের সাথে মিলিত হব না। আপনারা শুনুন, আমি ঠিক করেছি সম্বর্ধনার ছলে কৃষ্ণকে আমি বন্দী করে রাখবো। তাহলে যাদবেরা,

পাণ্ডবেরা এবং সমস্ত পৃথিবী আমার বশে আসবে।' দুর্যোধনের কথা শুনে বিদুর ও ভীষ্ম শিউরে উঠলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'বাবা দুর্যোধন, এমন ভয়ংকর চিন্তা মনেও ঠাঁই দিও না। তার চেয়ে আমার এই 'বিমল মণি' যা দিনরাতে সমানভাবে আলো ছড়ায়, এটি কৃষ্ণের পায়ে নিবেদন করে শান্তি প্রার্থনা কর। হৃষিকেশ কৃষ্ণ দূত হয়ে আসছেন, তিনি আমাদের পরম আত্মীয়ও বটে।'

দুর্যোধন এ কথা শুনে অট্টহাসি হেসে বললেন, 'শান্তি! আত্মীয়! কৃষ্ণপাণ্ডবদের পক্ষের লোক, সে আবার কিসের আত্মীয়?'

ভীষ্ম ভীষণ রেগে সভা ত্যাগ করে চলে যাবার আগে বলে গেলেন, কৃষ্ণকে বন্দী করার চেষ্টা করলে দুর্যোধন তার অমাত্যদের নিয়ে ধ্বংস হবে।

পরদিন সকালে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে পৌঁছালেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে গেলেন রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা, রাজপুত্র ও রাজকন্যারা।

কৃষ্ণ রাজপুরীতে এলে প্রথমেই তাঁকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় আনা হলো। সভার সকলে এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজেও আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকে সম্মান জানালেন।

কৃষ্ণ কিছুক্ষণ ধৃতরাষ্ট্রের সাথে কথাবার্তা বলে তারপর তাঁর পিসিমা কুন্তীদেবীর সাথে দেখা করার জন্যে বিদুরের প্রাসাদে গেলেন।

কুন্তীদেবী কৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মাধব, বল আমার ছেলেরা কেমন আছে? ওরা ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছিলো তবু আমি ওদের রাজসুখে মানুষ করে-

ছিলাম, আমার সেই সুখে লালিত ছেলেরা কি করে বনবাসের কষ্ট সইছে? কৃষ্ণ তুমি আমার দুঃখী ছেলেদের কথা, আমার লক্ষী-স্বরূপা বধূ দ্রৌপদীর কথা বল! তারা কেমন আছে? তাদের আমি কবে বুকে নিতে পারবো? কবে দু'চোখ ভরে দেখতে পাবো?'

কৃষ্ণ সকলের কুশল জানিয়ে তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, 'মা, আপনার মত মহীয়সী যাদের মা তাঁরা সব অবস্থাতেই কল্যাণে থাকেন। অল্প দিনের মধ্যেই আপনি আপনার ছেলেদের বিজয়ী ও পৃথিবীর রাজা হিসাবে দেখবেন।'

কুন্তীর কাছ থেকে কৃষ্ণ দুর্যোধনের প্রাসাদে গেলেন। সেখানে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি ও অনেক মিত্র রাজাদের নিয়ে কৃষ্ণকে সম্বর্ধনা জানালেন এবং নানারকম রাজকীয় খাবার ও পানীয় দিয়ে তাঁকে আপ্যায়িত করতে চাইলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ সেসবের কিছুই ছুঁয়ে দেখলেন না। এতে দুর্যোধন দুঃখিত হয়ে বললেন, 'মাধব, তুমি শুধু পাণ্ডবদেরই নও, আমারও আত্মীয়। তবে কেন আমাকে এমন পর ভাবছো? আমার দেওয়া কিছুই নিচ্ছো না!'

বাসুদেব তার মেঘনীল হাত উঁচু করে বললেন, 'আজ আমি আত্মীয় নয়, দূত হিসাবে এসেছি। দৌত্য কাজ সফল না হওয়া পর্যন্ত খাবার অথবা পূজা কোনটাই আমি নিতে পারি না। প্রিয় দুর্যোধন, আমি জানি তুমি আমার আত্মীয় হলেও আমাকে শত্রু বলেই মনে কর, কাজেই আমার জন্য তোমার দেওয়া খাবার কখনই গ্রহণ করা উচিত নয়। আমি ঠিক করেছি এ রাজ্যে একমাত্র বিদুরের দেওয়া খাবারই খাবো এবং তাঁর কাছেই রাত্রি কাটাবো।'

রাত্রে বিদুর কৃষ্ণের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। কৃষ্ণ

তাঁর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বললেন, 'দুর্যোধনের দুষ্ট স্বভাব ও মূর্খতার কথা জেনেও আমি এসেছি। কারণ আমি চাই কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হোক। তবে দুর্যোধন যদি আমার সাথে কোন কুমতলব খাটাতে চায় তবে তাকে ধ্বংসের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।'

পরদিন ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে কৃষ্ণ রাজসভায় এলেন। তাঁর পরনে হলুদ বেশ, গলায় কৌস্তভমণির মালা দুলছে। ধৃতরাষ্ট্র বসতে অনুরোধ করলে কৃষ্ণ বললেন, 'রাজা, এই সভায় নারদ, বশিষ্ঠ, পরশুরাম, মৈত্রেয় প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিরা অদৃশ্য ভাবে উপস্থিত রয়েছেন। আগে তাঁদের সম্বর্ধনা করে আসন দিন তারপর আমি বসবো।'

ভীষ্মের আদেশে ভৃত্যেরা মহামূল্যবান আসন এনে দিলে সকলে ঋষিদের প্রণাম জানিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন। এরপর কৃষ্ণ তাঁর নিজের আসনে বসলেন। বিদুর তাঁর পাশের আসনটিতে বসলেন।

কৃষ্ণের ভাষণ

সভা নীরব হবার পর শ্রীকৃষ্ণ মেঘের গুরুগুরু ধ্বনির মত গম্ভীর অথচ মধুর স্বরে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন, 'ভরত শ্রেষ্ঠ, আমি কুরু পাণ্ডবের মধ্যে মিলনের রাখী বন্ধন করে ভরত বংশকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছি। আমি জেনেছি আপনার রাজ্যলোভী ছেলেরা এমন এক মহাযুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে যাতে পাণ্ডবেরাই

শুধু নন তাঁরা নিজেরাও বিনষ্ট হবেন। দুর্যোধনের উদ্যোগে আজ পৃথিবীর সমস্ত রাজারা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রে শান দিচ্ছেন। তাঁরা যুদ্ধের নেশায় বিপক্ষ দলের সৈন্য ধ্বংস করবেন, নিরীহ প্রজা, জনপদ ও অবলা পশুদের শেষ করবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো শান্তিকামী, তারা যুদ্ধ চায় না। আপনি প্রজাদের এই নির্মম ধ্বংসেয় হাত থেকে রক্ষা করুন। মহারাজ, পিতৃহীন পাণ্ডবেরা আপনাকেই চিরকাল পিতা বলে জেনে এসেছেন, আপনার আদেশেই তারা তেরো বছর রাজ্য-হারা হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করছেন। এবার আপনি তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে পিতার কর্তব্য পালন করুন।'

শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ নীরবে তাঁর পদ্মপলাশ দু'টি চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'এই সভায় উপস্থিত সমস্ত রাজা এবং রাজপুরুষেরাই দুর্যোধনের সেই নিষ্ঠুর কাজ জতুগৃহ দাহের কথা জানেন, কপট পাশা খেলার পাপের কথা জানেন, দ্রৌপদীর চরম অপমানও আপনারা অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছেন। কৌরবদের এত অন্যায় সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির আজও তাঁদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাঁর ভাইরাও যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁদের পক্ষ থেকে আমি এই সভাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, সুবিচার পেলে পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রকে যেমন সেবা করতে আগ্রহী, তেমনি আর যদি কোন অন্যায় হয় তাহলে যুদ্ধে কৌরবদের চরম শাস্তি দিতেও তাঁরা প্রস্তুত। এখন মহাজ্ঞানী ধৃতরাষ্ট্র চিন্তা করে দেখুন তিনি কি করবেন।'

সভায় উপস্থিত রাজারা সকলেই মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণের ভাষণ শুনলেন, কিন্তু তাঁর সমর্থনে কেউ কিছু বললেন না। তখন জামদগ্ন্য পরশুরাম বললেন, 'রাজা ধৃতরাষ্ট্র, নর ও নারায়ণ ঋষিই কৃষ্ণ ও অর্জুন হয়ে জন্মেছেন। আপনি তাঁদের সাথে বিরোধে যাবেন না।'

মহর্ষি কণ্ব কললেন, 'দুর্যোধন, তুমি বলবান একথা সত্যি। কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণ চক্রাগদাধর বিষ্ণু। তুমি তাঁকে আশ্রয় করে নিজেকে রক্ষা কর, কৌরব বংশকে বাঁচাও এতে সবারই মঙ্গল হবে।'

দুর্যোধন কণ্বের দিকে চেয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর নিজের উরুতে চাপড় মেরে বললেন, 'মহর্ষি, আমার ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। দয়া করে আপনার প্রলাপ বন্ধ করুন।'

সভার সকলে দুর্যোধনের অশিষ্ট ব্যবহারে লজ্জায় মাথা নীচু করলেন।

নারদ বললেন, 'বৎস দুর্যোধন, জ্ঞানী এবং ধর্মমতি লোকের উপদেশ অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়। আমিও বলছি, তুমি যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ কর।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'ভগবান নারদের উপদেশ অমান্য করার মত দুর্বুদ্ধি নিশ্চয়ই আমার ছেলের হবে না। কৃষ্ণ, তুমিও দুর্যোধনকে বোঝাও।'

কৃষ্ণ দুর্যোধনকে মিষ্টি করে বললেন, 'পুরুষ শ্রেষ্ঠ, তুমি গুণবান ও বুদ্ধিমান। আমার অনুরোধ, তুমি তোমার পিতা এবং এই সভার প্রবীণদের উপদেশ মেনে নাও। তুমি পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধ চাও, কিন্তু তুমি কি জানো না ধনঞ্জয়কে পরাজিত করার শক্তি কোন দেবতারও নেই? তাছাড়া আসন্ন যুদ্ধে আমি যে ক্ষেত্রে অর্জুনের সাথে থাকবো সেক্ষেত্রে তুমি কি করে জয়ের আশা কর? শোন দুর্যোধন, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি কৌরব কুলের সর্বনাশ ঘটিও না, লোকে যেন তোমাকে কুল হত্যাকারী না বলে।'

সভার সকলেই দুর্যোধনকে উপদেশ দিলেন কৃষ্ণকে যেন তিনি

অমর্যদা না করেন। কিন্তু দুর্যোধন তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কৃষ্ণকে বললেন, 'কেশব, তুমি পাণ্ডবদের প্রতি মোহে অন্ধ বলেই আমাকে অন্যায়ভাবে দোষী করছো। তা নইলে আমি তো শত চেষ্টা করেও নিজের দোষ খুঁজে পাই না। যুধিষ্ঠির পাশা খেলার নেশায় পড়ে রাজ্য হারিয়েছেন, নিজের স্ত্রীকে পণ রেখে খেলে তাঁর অপমানের কারণ ঘটিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আমি কেন দোষী হলাম? পিতার আদেশে আমি তো তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। যুধিষ্ঠির আবার কেন পাশা খেলার আমন্ত্রণে এসে সব হারালেন? কেউ তো তাঁকে জোর করে খেলতে বাধ্য করেনি। তবে কেন তুমি এবং অন্যেরা আমাকেই পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করছো? মাধব, তুমি পাণ্ডবদের বলে দিও, তাঁদের শক্তি অথবা দিব্যাস্ত্রের ভয়ে আমি ভীত নই। যুদ্ধে বীরের মৃত্যুশয্যায় শুতে পারাকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। আমার এই বাক্য "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী" তুমি তাঁদের জানিয়ে দিও।'

কৃষ্ণের ক্ষমা সুন্দর বিশাল দু'টি চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেও তাঁর ঠোঁটে তীক্ষ্ণ হাসি যেন ছুরির ফলার মত ঝিলিক দিয়ে গেলো। তবু তিনি সংযত কণ্ঠে বললেন, 'চমৎকার! তুমি ও তোমার প্রিয় সহচরেরা যুদ্ধে বীর শয্যাই লাভ করবে। দুর্যোধন, এত নীচ তুমি! পাণ্ডবদের খ্যাতি ও ধনসম্পদ দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে শকুনির সাথে ষড়যন্ত্র করে পাশার দান চুরি করে তুমি যুধিষ্ঠিরকে খেলায় হারিয়েছো। তুমি ছাড়া আর কে নিজের কুলবধূকে প্রকাশ্য সভায় অপমান করতে পারে? কুৎসিত ইঙ্গিত করতে পারে? বারনাবতে জতুগৃহ তৈরী করে মা সহ পাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার মত নৃশংস চেষ্টা কে করেছিলো? এর পরও বলবে তুমি অপরাধী নও? এখনও তুমি পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে

না দিয়ে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রে শান দিচ্ছো। ঠিক আছে, খুব শীগ্‌গিরই তুমি রাজ্য ও প্রাণ দুই-ই হারাবে।'

কৃষ্ণের কথা শুনে সভার সকলে শিউরে উঠলেন। দুর্যোধন রেগে সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

কৃষ্ণ বললেন, 'কুরুবংশের প্রবীণেরা কি করে এই মূর্খকে রাজার ক্ষমতা দিলেন। দুরাত্মা রাজা কংসের কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। কংস তার পিতা উগ্রসেন বেঁচে থাকতেই জোর করে সিংহাসন দখল করেছিলো। আমি কংসকে বধ করে আবার তার পিতা উগ্রসেনকে ভোজরাজ্যের সিংহাসনে বসিয়েছি এবং প্রজাদের কংসের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আপনার দুর্বলতার জন্যই আজ ভরতবংশ শেষ হতে চলেছে।'

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে বিদুরকে বললেন গান্ধারীকে ডেকে আনতে, এখন যদি তিনিই পারেন দুর্যোধনকে বোঝাতে।

গান্ধারী সব কিছু শুনে স্বামীকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'ছেলেকে পাপিষ্ঠ জেনেও তুমি তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছো, এখন তার ফল ভোগ করছো।'

বিদুর দুর্যোধনকে রাজসভায় ডেকে আনলে গান্ধারী তাঁকে যথা সম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বাবা দুর্যোধন, তুমি তোমার গুরুজনদের অনুরোধ রাখো। পাণ্ডবেরা তোমার ভাই। তাঁরা সত্যনিষ্ঠ এবং মহাবীর। তাদের সাথে মিলিত হলে তোমার সুখ সম্পদ আরও বাড়বে। বাবা, লোভ ত্যাগ করে উদার হও, শান্ত হও, এতে তুমি সুখী হবে।

দুর্যোধন মায়ের কথা কানে তোলারও প্রয়োজন মনে না করে ঝড়ের বেগে সভা থেকে বেরিয়ে শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের কাছে

গেলেন এবং বললেন, 'কৃষ্ণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা তাঁকে বন্দী করবো, তারপর তাঁর সঙ্গে আসা যাদব সৈন্যদের যুদ্ধে নিহত করবো।'

কৃষ্ণের সংহার মূর্তি

সাত্যকি দুর্যোধনের হীন মতলব বুঝতে পেরে সভায় এসে কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে সেকথা জানিয়ে দিয়ে বললেন, 'নির্বোধ বালক যেমন কাপড় দিয়ে জ্বলন্ত আগুনকে ঢেকে রাখতে চায় দুর্যোধনও তেমনি কৃষ্ণকে বন্দী করতে চাইছে।'

কৃষ্ণ হিম কঠিন স্বরে বললেন, 'রাজা, আমি অনুমতি দিচ্ছি দুর্যোধন যা ইচ্ছা করুক।'

ঠিক তখুনি দুর্যোধন অস্ত্র ও তাঁর সহচরদের নিয়ে কৃষ্ণকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সভায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে কৃষ্ণ বললেন, 'দুর্যোধন তুমি অন্ধ, তাই মনে করছো আমি এক, সেই সাহসে আমাকে বন্দী করতে চাও।' চেয়ে দেখ, পাণ্ডবেরা, অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশের বীরেরা, সূর্যদেব, রুদ্র শিব, বসুরা, মহর্ষি ও দেবর্ষিরা সকলেই আমার সাথে আছেন। কৃষ্ণ কথা শেষ করে হা-হা করে হেসে উঠলেন। অমনি তাঁর সুনীল কপালে ব্রহ্মা, বুকে শিব, মুখ থেকে অগ্নি দেব এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্র এবং বহু দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, হলধর বলরাম এবং পঞ্চপাণ্ডব বের হয়ে এলেন। তাঁদের সবার হাতেই ভয়ংকর সব অস্ত্রশস্ত্র। আর সহস্র চরণ, শত বাহু ও সহস্র

নয়ন শ্রীকৃষ্ণের সেই সংহার মূর্তি (ধ্বংসের রূপ) দেখে সভার সকলে ভয়ে চোখ বুঁজলেন। শুধু ধৃতরাষ্ট্র (যদিও অন্ধ) ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয়, বিদুর ও মুনি ঋষিরা দু'চোখ ভরে কৃষ্ণের সেই পরম রূপ দেখলেন। দেবতা ও ঋষিরা কৃষ্ণকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু তুমি ক্ষমা কর, তোমার ঐ সংহার রূপ সংবরণ কর, তা নইলে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।'

কৃষ্ণ তাঁর আগের রূপে ফিরে এলেন এবং সাত্যকি ও বিদুরকে নিয়ে সভা ত্যাগ করলেন। দেবর্ষি ও মহর্ষিরাও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণের সাথে সাথে ভীষ্ম ও দ্রোণ এলেন তাঁকে বিদায় জানাতে। কর্ণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে ডেকে রথে তুলে নিলেন। সাত্যকি রথে ওঠার পর দারুক রথ ছুটিয়ে দিলো।

কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ

ছুটন্ত রথে বসে কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, 'রাধেয় কর্ণ, তুমি হয়তো নিজেও জানো না, সারথি অধিরথ তোমার বাবা নন, রাধাও তোমার মা নন। তুমি কুন্তীর প্রথম ছেলে এবং ধর্মের নিয়মে রাজা পাণ্ডুই তোমার বাবা।'

কৃষ্ণের কথা শুনে কর্ণের মুখ শক্ত হলো। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, 'কর্ণ, তুমি সূতপুত্র নও, নীচ কুলে তোমার জন্ম হয়নি, তুমিই প্রথম পাণ্ডব, রাজা হবার অধিকার একমাত্র তোমারই। তুমি আজ আমার সঙ্গে উপপ্লব্য নগরে চলো। আমি তোমাকে সবার

সামনে কৌন্তেয় এবং প্রথম পাণ্ডব বলে জানিয়ে দেবো। তোমার পাঁচ ভাই, কৃষ্ণা, সুভদ্রা, অভিমন্যু ও কৃষ্ণার ছেলেরা তোমার চরণ সেবা করবে। আমরা তোমাকে পৃথিবীর রাজা বলে ঘোষণা করবো।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ হয়ে তোমার পেছনে শ্বেতচামর হাতে দাঁড়াবেন, ভীমসেন তোমার মাথায় রাজছত্র ধরবেন, অর্জুন হবেন তোমার রথের সারথি, নকুল ও সহদেব সর্বক্ষণ তোমার পাশে পাশে থাকবেন।'

কর্ণের মুখ করুণ হাসিতে ভরে গেলো। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'মাধব, তুমি যা বললে সবই আমি জানি। আমার জন্মকাহিনীও আমার অজানা নয়। কিন্তু আমার সেই গর্ভধারিণী মা তো কলংকের ভয়ে আমাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর স্ত্রী রাধা আমাকে বুকে করে মানুষ করেছেন। লোকে আমাকে সূতপুত্র বলে নীচু চোখে দেখে। তুমিও তো আমাকে কুন্তীর ছেলে জেনেও "রাধেয়" বলেই ডাকলে। মধুসূদন, এখন আর সম্ভব নয়। শুধু প্রথম পাণ্ডবের সম্মানই নয়, আমি সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও পিতা অধিরথ ও মাতা রাধার পরিচয় মুছে ফেলতে পারব না। আমি সূতবংশেই বিয়ে করেছি, আমার সন্তানাদিও সূতবংশীয় নামেই পরিচিত। তোমার কাছে আমার ভিক্ষা, কখনই আমার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ কোর না। তাহলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র জেনে কখনই নিজে রাজপদ নেবেন না। আমি চাই যুধিষ্ঠিরই রাজ্য লাভ করুন। কেশব, আমাকে আশীর্বাদ কর যেন যুদ্ধক্ষেত্রেই মরণ লাভ করি।'

কৃষ্ণ মৃদু হাস্যে বললেন, 'কর্ণ তুমি বিচিত্র। সে যাক তুমি ফিরে গিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপকে বলো এই অগ্রহায়ণ মাস অতি শুভকাল। যুদ্ধ কিংবা আনন্দের জন্য হেমন্ত বড় সুন্দর ঋতু। সাতদিন পরে

অমাবস্যা, সেই দিন সংগ্রাম আরম্ভ হবে। কৌরবদের ও তাঁদের অনুগামী রাজাদের বলো যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুই হবে তাঁদের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিণতি।'

কৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্ণ যখন বিষাদ ভরা মনে রথ থেকে নামলেন তখন তাঁর চির রুক্ষ চোখ দু'টি জলে ভরে গেছে।

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ

বিদুরের কাছে কৌরব সভার সব কথা শুনে কুন্তী চিন্তায় পড়লেন। ভাবলেন, যুদ্ধ তাহলে হবেই। দুর্যোধনের পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ইত্যাদি মহারথীরা থাকলেও তাঁরা মনে মনে পাণ্ডবদের ভালোবাসেন। কিন্তু যুদ্ধবাজ কর্ণ বড় নিষ্ঠুর, তার জন্য আমার ভয়। কিন্তু সেতো আমারই ছেলে, আজ যদি আমি মায়ের দাবী নিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, সে কি আমার কথা রাখবে না?

এইসব চিন্তাভাবনা করে কুন্তী ভরা দুপুরে গঙ্গানদীর তীরে গেলেন। সূর্যের সন্তান দাতা কর্ণ তখন পুব দিকে মুখ তুলে সূর্যের বন্দনা করছিলেন। কুন্তী তাঁর পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর পূজা শেষ করে কর্ণ যখন মুখ ফেরালেন তখন তাঁর চোখে পড়লো রোদে ঝলসে যাওয়া পদ্মফুলের মালার মত এক নারী দাঁড়িয়ে। তিনি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'দেবী, আপনি কে? আমার কাছে কি চান?'

কুন্তী বললেন, 'আমি পাণ্ডুরাজ মহিষী কুন্তী।'

মুহূর্তে কর্ণের সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেলো। তবু তিনি শান্ত সুরে বললেন, 'আপনি কুন্তী? অর্জুনের মা?'

কর্ণের কথায় কুন্তীর দু চোখ জলে ভরে গেলো। তিনি স্নেহভরা সুরে বললেন, 'বাবা কর্ণ, আমি তো শুধু অর্জুনের মা নই, তোমারও মা।'

কর্ণ নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

কুন্তী ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ আমিই তোমার মা। তুমি রাধার ছেলে "রাধেয়" নও, কুন্তীর ছেলে "কৌন্তেয়," রাজাপাণ্ডুর ছেলে প্রথম পাণ্ডব। বাবা, তুমি আমার কুমারী জীবনের সন্তান, দেবতাশ্রেষ্ঠ সূর্যের প্রসাদে তোমার জন্ম।'

কর্ণ বললেন, 'কিন্তু এতদিন পরে কেন এই পরিচয় নিয়ে এলেন? কি আপনার উদ্দেশ্য?'

কুন্তী চোখের জলে ভেসে বললেন, 'তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাইতে এসেছি বাবা।'

কর্ণ অবাক হয়ে বললেন, 'ভিক্ষা! আমার কাছে! আমার পৌরুষ আর ধর্ম ছাড়া যা চান তাই আমি আপনার পায়ে সঁপে দেবো।'

কুন্তী তখনও অঝোরে কাঁদছেন কর্ণ কোমল সুরে বললেন, 'বলুন, কি আপনার ইচ্ছা, আমি জীবনের বিনিময়ে হলেও দিতে রাজী আছি।'

কুন্তী বললেন, 'বাবা! আমি তোমাকে বুকে করে ফিরিয়ে নেবো বলে এসেছি। তুমি আমার প্রথম ছেলে, এতদিন আপন ভাইদের চিনতে পারোনি বলে দুর্যোধনের সাথে থেকেছো। আমি তোমাকে পঞ্চপাণ্ডবের সাথে প্রথম পাণ্ডব হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবো।'

সেই মুহূর্তে 'কর্ণ তাঁর পিতা সূর্যের বাণী শুনলেন, 'কর্ণ, তুমি তোমার মা কুন্তীর কথা শোন, তোমার মঙ্গল হবে।'

সূর্যের উপদেশে কর্ণ এতটুকুও নরম না হয়ে কুন্তীকে বললেন, 'কলংকের ভয়ে যে শিশুকে আপনি জলে বিসর্জন দিয়েছিলেন, রাধাই তাকে বুকে করে এতবড় করে তুলেছেন। আমি ক্ষত্রিয়ের সম্মান পাইনি কিন্তু অধিরথ ও রাধার বুকের স্নেহসুধা পেয়েছি। দেবী, আপনি আজ গর্ভে ধারণ করার দাবীতে আমাকে তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চান? কিন্তু আমি তো আপনাকে আমার রাধা মায়ের অধিকারের এক কণাও দিতে পারবো না। আমি জানি, আজ আপনি কেবল পঞ্চপাণ্ডবের স্বার্থে আমাকে ফিরিয়ে নিতে চান। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর ছেলেরা আমাকে নীচ সূতবংশীয় জেনেও রাজার সম্মান দিয়েছেন, আমি কখনই তাঁদের ত্যাগ করতে পারবো না। তবে আপনার ইচ্ছাও আমি আংশিক পূরণ করবো। আসন্ন যুদ্ধে হয় আমি অর্জুনকে বধ করবো, না হয় অর্জুনের হাতে মরবো। আপনার অন্য চারটি ছেলেকে বধ করার ইচ্ছা আমি ত্যাগ করলাম। দেবী, যুদ্ধে আমি অথবা অর্জুন যেই মরি না কেন, আপনার পাঁচটি ছেলেই তো বেঁচে রইবে।'

কুন্তী কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে কর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কর্ণ, বাবা আমার! আশীর্বাদ করি তোমার যশ, তোমার ধর্ম তোমাকে গৌরব দান করুক।'

কর্ণ কুন্তীকে প্রণাম করে বললেন, 'মা! এই আশীর্বাদ করুন যেন বীরের মরণ মরতে পারি।'

ততক্ষণে দুপুরের রোদ ম্লান হয়ে বিকেলের বিষণ্ণ ছায়া নেমেছে। শান্ত নদীর তীর ধরে কর্ণ ও কুন্তী দু'জনে দু'দিকে চলে গেলেন।

কুন্তীর বুকে কান্নার সাথে আনন্দের জোয়ার বইছে। কর্ণের মুখে তিনি 'মা' ডাক শুনেছেন। কর্ণের মনেও অদ্ভুত এক অনুভূতি, ইনিই কুন্তী। অর্জুনের মা! পঞ্চপাণ্ডবের মা! শুধু কি তাই? দেবী প্রতিমার মত ঐ মা তো তাঁরও মা।

কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন ও পাণ্ডবদের যুদ্ধসজ্জা

উপপ্লব্য নগরে ফিরে এসে কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবের কাছে তাঁর দৌত্যের বিবরণ জানিয়ে বললেন, 'মহারাজ আমি বহু চেষ্টা করেও কৌরবদের শান্তির পথে আনতে পারিনি, দুর্যোধন ও তাঁর অমাত্যরা যুদ্ধ চায়। মনে হয় কৌরবপক্ষের রাজারা এখন নিজেদের সর্বনাশ সাধনের জন্য কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করেছেন।'

যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের বললেন, 'তোমরা কেশবের কথা শুনলে, এখন তোমরা সেনা বিভাগ কর। সাত অক্ষৌহিনী এখানে সমবেত হয়েছে, তাদের নায়ক দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, চেকিতান ও ভীমসেন। এখন তোমরা বল, কে এদের নেতা অর্থাৎ যুদ্ধের সর্বাধি-নায়ক হবার যোগ্য।'

সহদেব মৎস্যরাজ বিরাটের নাম করলেন। নকুল প্রস্তাব করলেন দ্রুপদের নাম। কারণ তিনি পঞ্চপাণ্ডবের শ্বশুর এবং বীর। অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপতি হবার যোগ্য বলে ঘোষণা করলেন। ভীমের মতে রামের মত রূপবান ও ন্যায়নিষ্ঠ বীর শিখণ্ডীই সেনাপতি হবার যোগ্য।

যুধিষ্ঠির এই মতবিভেদ দেখে বললেন, 'কৃষ্ণই আমাদের জীবন-মরণের নিয়ন্তা, কেশব, তুমিই বল কে আমাদের সেনাপতি হবেন। এখন রাত্রি হয়েছে, আগামী প্রভাতে আমরা অধিবাস (অস্ত্রপূজা) ও কৌতুক মঙ্গল (রাখিবন্ধন) করে যুদ্ধযাত্রা করব।'

কৃষ্ণ বললেন, 'এতক্ষণ যাঁদের নাম করা হল তাঁরা সকলেই সেনাপতি হবার যোগ্য, তাঁদের যে কোন একজন কৌরবদের বিনষ্ট করতে পারবেন। তবে আমি সকল দিক বিবেচনা করে ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপতি মনোনীত করছি।'

কৃষ্ণের কথায় পঞ্চপাণ্ডবসহ সমস্ত রাজারাই আনন্দিত হলেন।

স্থির হল দ্রৌপদী ও অন্যান্য মেয়েরা উপপ্লব্য নগরেই থাকবেন।

মহাসমারোহে যুদ্ধের আয়োজন শুরু হলো। চারদিকে সাজ সাজ রব। সৈন্যেরা কোলাহল করতে লাগলো, হাতির বৃংহিত, ঘোড়ার হ্রেষা, রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ, শঙ্খ ও দুন্দুভির প্রচণ্ড শব্দে আকাশ বাতাস তোলপাড় হলো। মহাসমুদ্রের কল্লোল যেন বাঁধ ভেঙ্গে দশ দিক ভাসিয়ে দেবে বলে গর্জন করছে বলে মনে হতে লাগলো।

পাণ্ডবেরা তাঁদের সৈন্য বাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির শ্মশান, দেবমন্দির, তপোবন, আশ্রম ও তীর্থ ক্ষেত্র বাদ দিয়ে যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাঠ পাওয়া যায় এমন সমতল জায়গায় সৈন্যবাহিনীকে শিবির তৈরী করতে বললেন।

কৃষ্ণ পবিত্র হিরন্বতী নদীর কাছে রাজাদের জন্য শিবির তৈরী করালেন। প্রত্যেক শিবিরে বহু কর্মী, চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্র ও প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে বৈদ্য, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, মধু, ঘি, অন্যান্য খাবার, ধূপধুনা, খাবার জল, ঘাস, তুষ ও কয়লা রাখা হলো।

যুদ্ধের আয়োজন শেষ হবার পর যুধিষ্ঠির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

'যে ক্ষতি ও রক্তপাত রোধ করার জন্য আমি একদিন যুদ্ধের বদলে বনবাসকে বেছে নিয়েছিলাম, আজ সেই মহাক্ষতিই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা আমাদের গুরুজন, পরম আপনজন তাঁদের বধ করে আমাদের কেমন বিজয় হবে বাসুদেব?'

অর্জুন বললেন, 'ধর্মরাজ দুঃখ করবেন না। কৃষ্ণ কখনও অধর্মের উপদেশ দেন না। যুদ্ধই আমাদের কর্তব্য।'

কৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছো পার্থ।'

যুধিষ্ঠির, দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সহদেব এই পাঁচজনকে যুধিষ্ঠির সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্বাধিনায়ক ও অর্জুনকে প্রধান সেনাপতি এবং কৃষ্ণকে অর্জুনের অভিভাবক ও সারথি নিযুক্ত করলেন।

কৌরব যুদ্ধ সজ্জা

কৃষ্ণ হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পর দুর্যোধন তাঁর মহারথদের বললেন, 'আসলে কৃষ্ণ যুদ্ধই চান, ভীম অর্জুনও তাঁর মতে চলেন। দ্রুপদ ও বিরাটের সাথে আমার শত্রুতা, তাঁরা পাণ্ডবের পক্ষে। অতএব কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে। আপনারা যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করুন। কুরুক্ষেত্রে বহু সহস্র শিবির স্থাপন করুন, শিবিরের মধ্যে যাবতীয় অস্ত্র, খাদ্য জল কাঠ প্রভৃতি রসদ থাকবে। খাদ্য আনবার পথ যেন শত্রুরা বন্ধ করতে না পারে।'

আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পর দুর্যোধন কৃতাঞ্জলী হয়ে ভীষ্মকে

বললেন, 'পিতামহ, আপনি শুক্রাচার্য তুল্য যুদ্ধ নিপুণ, এই মহাযুদ্ধে আপনি সেনাপতি হয়ে আমাদের ধন্য করুন।

ভীষ্ম বললেন, "মহাবাহু আমার কাছে তোমরা যেমন পাণ্ডবেরাও তেমন, তবু প্রতিজ্ঞা করছি আমি তোমার জন্যই যুদ্ধ করব। তবে কর্ণও মহাবীর, তিনি সর্বদা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন, সেক্ষেত্রে তাঁকেই এই যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করা চলে।"

কর্ণ বললেন, 'ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করবো না, এঁর মৃত্যুর পর অর্জুনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে।'

দুর্যোধন যথাবিধি উপহার ও অর্ঘ্য দিয়ে ভীষ্মকে প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করলেন, শত সহস্র ভেরী ও শংখ গর্জন করে উঠলো। এই সময়ে প্রকৃতিতে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিল, হেমন্তের নির্মেঘ নীল আকাশ চিরে বজ্রপাত হল, ভূমিকম্পে বসুমতী কেঁপে উঠলো, যোদ্ধারা দুর্বল বোধ করলেন।

তারপর ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে দুর্যোধন তাঁর সুবিশাল সৈন্যবাহিনী ও মিত্র রাজাদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

পরদিন প্রভাতে দুর্যোধন মহারথদের জিজ্ঞেস করলেন, ঐ বিশাল পাণ্ডববাহিনী তাঁরা কত কালের মধ্যে বিনষ্ট করতে পারেন।

ভীষ্ম বললেন, 'আমি প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য ও এক সহস্র রথীকে বধ করব, এতে একমাসে সম্পূর্ণ পাণ্ডববাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

দ্রোণ বললেন, 'আমি বৃদ্ধ ও স্থবির, আমার শক্তি কমে গেছে, তবু ভীষ্মের মত একমাসেই পারব বলে মনে করি।'

কৃপ বললেন, 'আমি দুইমাসে পারি।'

অশ্বত্থামা বললেন, 'আমি দশদিনে পারব।'

কর্ণ তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, 'আমার জন্য পাঁচদিন সময়ই যথেষ্ট।'

কর্ণের কথায় ভীষ্ম হেসে উঠে বললেন, 'রাধেয়, এখনও পর্যন্ত শঙ্খ চক্রধারী বাসুদেবের রথে অর্জুনের মুখোমুখি হওনি তাই এমন কথা বলতে পারছো।'

কৌরবদলের রাজারা সুগন্ধি জলে স্নান করে সাদা পোষাক ও সাদাফুলের মালা পরে পূজা করলেন। তারপর দুর্যোধনের আদেশে পাণ্ডবদের দিকে যাত্রা করলেন।

দ্রোণাচার্য প্রথম দলের, ভীষ্ম দ্বিতীয় এবং দুর্যোধন তৃতীয় দলের প্রধান হয়ে চললেন।

অন্যদিকে যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবপক্ষের বীরেরাও যুদ্ধ সাজে সেজে কৌরবদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

দুইপক্ষের কোটি কোটি সৈন্যের সিংহগর্জনে, ভেরী ও শঙ্খের ধ্বনিতে পৃথিবী শিউরে উঠলো।

ভীষ্ম পর্ব

যুদ্ধের নিয়ম বন্ধন

পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম অংশে পূবমুখো হয়ে সৈন্য সন্নিবেশ করলেন। যাতে নিজেদের পক্ষ চিনতে অসুবিধা না হয় সেজন্য যুধিষ্ঠির তাঁর বিভিন্ন সৈন্যদলের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করলেন ও বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দিলেন।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য শংখ আর অর্জুন তাঁর দেবদত্ত শংখ-ধ্বনি করে যুদ্ধের সূচনা ঘোষণা করলেন।

কুরুক্ষেত্রের বিপুল সৈন্যবাহিনী দেখে মনে হলো পৃথিবীর অন্য কোথাও বুঝি শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক ছাড়া কোন সমর্থ পুরুষ নেই। সমস্ত শক্ত সমর্থ পুরুষেরা এই কুরুক্ষেত্রেই সমবেত হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হবার আগে উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই সব নিয়মাবলী ঠিক করা হলো।

(১) যুদ্ধ বিরতির সময় দুই দলের মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকবে।

(২) একপক্ষ কথার মাধ্যমে যুদ্ধ করলে অন্যপক্ষকেও তাই করতে হবে।

(৩) যারা সৈন্যদল থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের হত্যা করা চলবে না।

(৪) যুদ্ধ হতে হবে সমানে সমানে, অর্থাৎ রথীর সাথে রথীর, গজারোহীর সাথে গজারোহীর, অশ্বারোহীর সাথে অশ্বারোহীর এবং পদাতিকের সাথে পদাতিক যুদ্ধ করবে।

(৫) বিপক্ষকে না জানিয়ে আক্রমণ করা যাবে না।

(৬) অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত, শরণাগত, যুদ্ধে বিমুখ, অস্ত্রহীন লোককে কখনও মারা চলবে না।

(৭) চারণদল, ভার বহনকারী, অস্ত্রবাহক এবং ভেরী শিঙ্গা বাদকদের কখনও আঘাত করা যাবে না।

ব্যাসদেব ও ধৃতরাষ্ট্র

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হবার পর থেকে ধৃতরাষ্ট্রের মনে শান্তি নেই। দুর্যোধনেরা কুরুক্ষেত্রে চলে গেছেন, তাঁদের পতন হবেই এই চিন্তায় অন্ধরাজা খুবই দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় মহামুনি ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'শোন পুত্র, তোমার ছেলেদের ধ্বংসের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। নিয়তিই তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে; তুমি শোক করে কি করবে! তবে তুমি যদি এই মহাযুদ্ধ দেখতে চাও তাহলে আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করতে পারি যার বলে তুমি এখানে বসে এই দৃষ্টিহীন চোখ দিয়েও

যুদ্ধ দেখতে পাবে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'পিতা আমি অন্ধ। পৃথিবীর রূপলাবণ্য কিছুই দেখিনি, দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রিয়জনের মৃত্যু দেখার ইচ্ছা আমার নেই। তবে আপনার দয়াতে এই যুদ্ধের বিবরণ শুনতে পেলে কিছুটা স্বস্তি পাবো।

ব্যাস বললেন, 'সঞ্জয় আমার বরে দিব্যচক্ষু লাভ করবেন, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা ইনি এখানে বসেই দেখতে পাবেন এবং তোমাকে বলবেন। আর আমিও কুরুপাণ্ডবের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সহ মহাযুদ্ধের সমস্ত কীর্তি কথা লিপিবদ্ধ করে জগতে অমর করে রাখবো, যাকে লোকে জানবে "মহাভারত" নামে।'

ধৃতরাষ্ট্রকে অধীর হতে দেখে ব্যাসদেব আরও বললেন, 'পুত্র ধৈর্য ধর, যা ঘটবে সবই নিয়তির খেলা, সবই দৈবের ইচ্ছায় ঘটবে। তবে মনে রেখো, যেখানেই ধর্ম সেখানেই জয় হবে। এই যুদ্ধে সীমাহীন লোকক্ষয় হবে, রক্তের সাগর বয়ে যাবে, আমি তার ভয়ংকর সব কুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। অথচ তুমি কি ইচ্ছা করলে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারতে না? পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারতে না? তুমি এত দুর্বল!'

ধৃতরাষ্ট্র কাতর স্বরে বললেন, 'পিতা, আমি আপনার অক্ষম সন্তান, কিন্তু ধর্মে আমার অসীম ভক্তি আছে। আমার পুত্ররা উদ্ধত ও অবাধ্য বলেই আজ তাদের এই পরিণতি ঘটতে চলেছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দান করে চলে গেলেন।

পরদিন উষাকালে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যেরা যুদ্ধের উন্মাদনা নিয়ে জেগে উঠলো। প্রতিদিন ভোরের প্রার্থনায় দ্রোণাচার্য ও পিতামহ ভীষ্ম বলতেন, 'পাণ্ডুকুলের জয় হোক।' আজও সেই প্রার্থনাই তাঁরা করলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেহেতু তাঁদের কৌরবপক্ষের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করতে হলো।

পিতামহ ভীষ্ম সাদা উষ্ণীষ ও বর্ম পরে দুধসাদা ঘোড়াযুক্ত সোনার রথে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর বার্ধক্য যেন উজ্জ্বল সৌন্দর্য ও তেজের আড়ালে লুকিয়ে গেলো। তিনি কুরুপক্ষের রাজাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠরা শুনুন, আজ আমাদের জন্য স্বর্গের দরজা খুলে গেলো। এই পথে আমরা স্বর্গলোকে, ব্রহ্মলোকে যেতে পারবো। রোগশয্যায় শুয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুই ক্ষত্রিয়দের জন্য গৌরবের।'

ভীষ্মের কথা শুনে রাজারা নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে যাত্রা করলেন।

কৌরববাহিনীর 'সর্বতো মুখ' ভয়ংকর ব্যূহদেখে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হয়ে পার্থকে বললেন, 'ধনঞ্জয় দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশ অনুসারে সূচী মুখব্যূহ তৈরী কর। কারণ কৌরবদের তুলনায় আমাদের সৈন্য অনেক কম।'

অর্জুন জানালেন তিনি বজ্রপানি ইন্দ্রের কাছে শেখা 'অচল' ও

'বজ্র' ব্যূহ তৈরী করেছেন।

দুই বিপক্ষদল পরস্পরের দিকে এগোতে লাগলো। ভীষ্মের ব্যূহ ও কৌরবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে যুধিষ্ঠির হতাশ হয়ে বললেন, 'অর্জুন, এই ব্যূহ থেকে নিস্তার পাবার কোন উপায় কি আমাদের জানা আছে।'

অর্জুন উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমাদের উপায় সত্য, ধর্ম ও উদারতা। যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়, দেবর্ষি নারদ বলেছেন, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।'

এরপর যুধিষ্ঠিরের মাথার ওপর হাতির দাঁতের বাঁটযুক্ত শাদা রাজছত্র ধরা হলো, যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিদের প্রণাম করে সূর্যের মত উজ্জ্বল অথচ ধীর গম্ভীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

কৃষ্ণের উপদেশ মত যাত্রার আগে অর্জুন মহাশক্তি দেবী দুর্গার বন্দনা করলেন। দুর্গা দৈববাণী করলেন, 'সব্যসাচী তুমি অবশ্যই জয়ী হবে।'

ভগবত গীতা

কৃষ্ণ অর্জুনের কপিধ্বজ রথ নিয়ে শংখধ্বনি করতে করতে যুদ্ধরত সেনা-বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। অর্জুন দেখলেন, দুই পক্ষেই তাঁর প্রিয়জন এবং গুরুজনেরা রয়েছেন। কৌরবপক্ষে পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রভৃতিকে দেখে অর্জুন দুর্বল বোধ করলেন। কৃষ্ণকে বললেন, 'প্রিয় মাধব, আমার সাথে যাঁদের রক্তের

সম্বন্ধ, যিনি আমার পরমগুরু তাঁরা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার দু'হাত অবশ হয়ে আসছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে, হাত থেকে গাণ্ডীব ধনু খসে পড়তে চাইছে। কৃষ্ণ, আমি বিজয় চাই না, আপনজনদের বধ করে আমার কোন সুখ হবে? হায়! রাজ্যের লোভে আমরা এ কোন মহাপাপ করতে চলেছি!'

অর্জুন ধনুর্বাণ মাটিতে ফেলে অবশ ভাবে বসে পড়লেন।

অর্জুনের বিষাদ দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'পার্থ, এই বিপদের সময় তুমি ক্লীবের মত আচরণ করছো কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে হৃদয়ের আবেগকে কখনই প্রশ্রয় দিতে নেই, যে তা দেয় সে কাপুরুষ।'

অর্জুন বললেন, 'বাসুদেব, ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার কাছে ঈশ্বরের মত, তাঁদের হত্যা করার আগে আমারই মৃত্যু হোক।

প্রভু, তুমি আমার শুধু সখা নও আমার পথ প্রদর্শক, তুমি আমাকে ধর্মের পথে নিয়ে চল।'

কৃষ্ণ বললেন, 'পার্থ তুমি বুদ্ধিমান হয়েও কি করে যাঁরা শোকের অযোগ্য তাঁদের জন্য শোক করছো! মনে রেখো যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি জীবিত অথবা মৃত কারুর জন্যই শোক করেন না। কারণ তাঁরা জানেন মানুষ যেমন ছেঁড়া কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় পরে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহকে ত্যাগ করে নতুন শরীর লাভ করেন। জন্মালে মরতে হবে এবং মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির পুণর্জন্ম হবে এই অমোঘ বিষয় নিয়ে শোক করা তোমাকে সাজে না। কারণ তুমি শুধু বীরই নও, তুমি জ্ঞানীও বটে।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলে চললেন, 'হে ভারত (ভরত বংশীয় পুরুষ)! তোমার স্বধর্ম বিচার করে এই দ্বিধা ত্যাগ কর, কারণ ধর্মযুদ্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ ক্ষত্রিয়ের জন্য আর কিছু নেই। যদি তুমি

এই ধর্মযুদ্ধ পরিত্যাগ কর তাহলে স্বধর্ম ও কীর্তি হারিয়ে পাপগ্রস্ত হবে। যদি এই যুদ্ধে হত হও তবে স্বর্গলাভ করবে, জয়ী হলে সসাগরা পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে। অতএব হে কৌন্তেয়, জয়ের আশায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। মনে রেখো, কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে নয়। এই ত্রিলোকে আমার কিছুই কর্তব্য নেই, তবু আমি কর্মে নিযুক্ত আছি। শোন সব্যসাচী, যখন যখন ধর্মে গ্লানি আসে ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে এই ধরাতলে অবতার রূপে অবতীর্ণ হই।'

শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ দেবার পর অর্জুনের অনুরোধে নিজের বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাঞ্চিতদেহে পার্থ কম্পিত দু'হাত অঞ্জলীবদ্ধ করে বললেন, 'বল, কে তুমি ভীষণ? হে দেবেশ, তোমায় প্রণাম, তোমাকে জানতে চাই।'

বিশ্বরূপ কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এখানে যে যোদ্ধারা তোমার বিপক্ষে সমবেত হয়েছে, তুমি না মারলেও তারা মরবে, আগেই তারা আমার হাতে নিহত হয়েছে, সব্যসাচী, তুমি উপলক্ষ মাত্র। ওঠো, যশো লাভ কর, শত্রু জয় করে জয়ের টীকা ললাটে ধারণ কর।'

অর্জুন বললেন, 'প্রভু, তোমাকে সহস্র প্রণাম। মূর্খ আমি তোমার মহিমা না জেনে তোমাকে কৃষ্ণ, সখা, মাধব নামে ডেকেছি, কত পরিহাস, কত উপহাস করেছি, আমাকে ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও, তোমার পূর্বরূপ ধারণ কর।'

জনার্দন কৃষ্ণ তাঁর চির ক্ষমাসুন্দর পূর্বরূপ ধারণ করলেন। তারপর আরও অনেক উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার প্রিয়। সব ধর্ম

ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে স্মরণ করে চল, আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করবো, শোক পরিত্যাগ কর।'

অর্জুন কৃতাঞ্জলী হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "পরম প্রিয়, তোমার প্রসাদে আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি, আমার সন্দেহ দূর হয়েছে, তোমার আদেশ শিরে ধারণ করে আমার যাত্রা শুরু হোক"।*

---

* মহাভারতের এই অংশ অর্থাৎ অর্জুন ও কৃষ্ণের কথপোকথন ও কৃষ্ণের উপদেশাবলী ভগবদ্‌গীতা নামে প্রসিদ্ধ।

যুধিষ্ঠিরের শিষ্টাচার

যুদ্ধপাগল বিশাল সেনাবাহিনী দেখে যুধিষ্ঠিরের মনে হলো যেন দুই মহাসাগর ভীষণ গর্জনে পরস্পরকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। তিনি অস্ত্র রেখে রথ থেকে নামলেন এবং দু'হাতে প্রণামের ভঙ্গি নিয়ে ভীষ্মের দিকে এগোতে লাগলেন। তাঁকে এভাবে চলতে দেখে সৈন্যরা অবাক হয়ে নানা কথা বলাবলি করতে লাগলো।

কৃষ্ণ হাসিমুখে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, যুধিষ্ঠির প্রকৃত বীর ও ধর্মপ্রাণ বলেই তাঁর পিতামহ ভীষ্ম ও অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে তারপর যুদ্ধ শুরু করবেন।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের পায়ে মাথা রেখে বললেন, 'পিতামহ আমি আপনার কাছে যুদ্ধের অনুমতি নিতে এসেছি।'

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'তুমি আমার স্নেহের ধন, আশীর্বাদ করি যুদ্ধে জয়ী হও। আমার মন্দ ভাগ্য তাই ধৃতরাষ্ট্রের

কাছে প্রতিজ্ঞা রাখার জন্য তোমার বিপক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছি।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'কিন্তু আপনি তো চিরজয়ী, আপনার মৃত্যুও আপনার ইচ্ছার অধীন। আমি কোন্ উপায়ে আপনাকে জয় করবো বলে দিন।'

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে হেসে উঠে বললেন, 'আমাকে জয় করার মত কোন বীর তো দেখি না। তাছাড়া এখনও আমার মরার সময়ও হয়নি। সময় হলে তখন আবার এসো।'

দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে যুধিষ্ঠির আশীর্বাদ চাইলে তিনি বললেন, 'আশীর্বাদ করি জয়ী হও। কিন্তু আমাকে বধ করার যোগ্য বীর কোন পক্ষেই নেই। তবে যদি কোন অসাধারণ সত্যবাদী ও বিশ্বাসী পুরুষের মুখ থেকে কোন দুঃসংবাদ শুনে আমি অস্ত্র ফেলে দিয়ে মরণ কামনা করি তখনই আমাকে হত্যা করা সম্ভব।'

এরপর যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যকে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। শল্য খুশি হয়ে বললেন, 'ঘটনাচক্রে আমি কৌরবদল ভুক্ত হয়েছি, তবে তোমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি বল?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'উপপ্লব্যনগরে আপনি আমাকে বর দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধকালে কর্ণের তেজ বিনষ্ট করবেন, সেই বরই আমাকে দেবেন।'

শল্য বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তোমার ইচ্ছা আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো।

কৌরবদের সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে যুধিষ্ঠির ভাইদের কাছে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, 'শুনেছি তুমি ভীষ্ম জীবিত থাকতে অস্ত্রধারণ করবে না। তাহলে যতদিন তিনি না মরছেন ততদিন পাণ্ডবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করো। তারপর না হয় কৌরবপক্ষে ফিরে যেও।'

কর্ণ উত্তর দিলেন, 'কেশব, আমি কোনক্রমেই দুর্যোধনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আমি অকৃতজ্ঞ হতে পারি না।' যুদ্ধবাজ অথচ সত্যনিষ্ঠ কর্ণের কাছ থেকে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন।

এরপর যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্যের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বললেন, 'বিপক্ষদলের কোন যোদ্ধা যদি আমাদের পক্ষে আসতে চান তাকে আমি সাদরে বরণ করব।'

সহসা ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র যুযুৎসু বলে উঠলেন, 'আমি—আমি আপনাদের পক্ষে আসতে চাই, ধার্তরাষ্ট্রদের অপরিণামদর্শিতার ফল তাঁরাই ভোগ করুন।'

যুধিষ্ঠির তাঁকে আহ্বান করে বললেন, 'স্বাগতম যুযুৎসু। বাসুদেব ও আমরা সবাই তোমাকে পেয়ে আনন্দিত। বিশেষ করে এই যুদ্ধের পর কুরুবংশের একমাত্র তুমিই বেঁচে থেকে ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ডদান ও বংশ রক্ষা করতে পারবে ভেবে বড় শান্তি অনুভব করছি।'

ভাইদের ত্যাগ করে যুযুৎসু পাণ্ডবদের দিকে চলে এলেন। যুধিষ্ঠির আবার রণসাজ পরে রথে উঠলেন।

রণবাদ্য বেজে উঠলো, বীর যোদ্ধারা সিংহগর্জন করে যুদ্ধের সূচনা করলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন

ভীষ্মের নেতৃত্বে কৌরব সেনাবাহিনী আর ভীমের নেতৃত্বে পাণ্ডব সৈন্যদল ভীষণ তেজে পরস্পরের দিকে ছুটে গেলো। যুদ্ধের বাজনা, সৈনিকদের হুংকার, হাতি ও ঘোড়ার চীৎকারে রণভূমি থর থর করে কাঁপতে লাগলো। সবার চীৎকার ছাপিয়ে ভীমসেনের বজ্র কণ্ঠের হুংকারে যেন আকাশ চৌচির হয়ে গেলো।

দুর্যোধন, দুঃশাসন, ভূরিশ্রবা ইত্যাদি বারোজন বীর ভীষ্মকে ঘিরে নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন। ওদিকে দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবদের দিকে বাণবর্ষণ করতে করতে রথ নিয়ে ছুটে এলেন। যুদ্ধ এক পর্যায়ে এমন পর্যায়ে এলো যে চরম বিশৃংখলার জন্য শত্রু-মিত্র কেউ যেন কাউকে চিনতে না পেরে শুধু নেশার ঘোরে লড়তে লাগলো।

সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ঠিক তার বাবা অর্জুনের মতই তেজে ভীষ্মের সঙ্গে শরযুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষ্মের সোনার রথের ধ্বজা অভিমন্যুর শরের ঘায়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ভীষ্ম তাই দেখে খ্যাপা বাঘের মত অভিমন্যুকে আক্রমণ করতেই সাত্যকি এগিয়ে এলেন অভিমন্যুকে সাহায্য করতে।

ওদিকে শল্যের সাথে যুদ্ধে বিরাট রাজার কিশোর পুত্র উত্তর মারা গেলেন। এতে উত্তরের ভাই শ্বেত খ্যাপা চিতার মত কুরুসৈন্য-দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাজার হাজার সৈন্যকে বাণ বিদ্ধ করে মারতে

লাগলেন। ভীষ্ম তাঁর বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য নিজে এসে শ্বেতকে আক্রমণ করলেন। ভীষ্মের ভল্লের আঘাতে (বল্লম জাতীয় অস্ত্র) শ্বেতের রথ নষ্ট হলো, সারথি মারা গেলো। শ্বেত রথ থেকে নেমে শক্তি অস্ত্র ছুঁড়লেন কিন্তু ভীষ্মকে তা স্পর্শ করার আগেই ভীষ্মের বাণ শ্বেতের হৃদপিণ্ডকে বিদ্ধ করলো। তরুণ দেবদারু গাছের মত উজ্জ্বল ও সজীব যুবরাজ শ্বেত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

শ্বেতের মৃত্যুতে পাণ্ডবদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এলো। একসাথে দুই পুত্রকে হারিয়ে মৎস্যরাজ বিরাট বেদনায় যেন পাথর হয়ে গেলেন। আর ওদিকে কৌরবেরা ভেরী বাজিয়ে আনন্দ করতে লাগলো, সেই ভীষণ বাদ্যের তালে তালে দুঃশাসন যুদ্ধক্ষেত্রের রক্ত-মাখা মাটিতে নেচে নেচে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন।

সূর্য অস্ত গেলো। অবহার (যুদ্ধ বিরতি) ঘোষণার পর দুই পক্ষের যোদ্ধারা বিশ্রামের জন্য শিবিরে ফিরে গেলেন।

শিবিরে বিশ্রামের সময় যুধিষ্ঠির হতাশার সুরে কৃষ্ণকে বললেন, 'ভীষ্মের হাতে শ্বেতের ও শল্যের হাতে উত্তরের মৃত্যু আমাদের সৈন্য-দের মন ভেঙ্গে দিয়েছে।' মনে হচ্ছে ভীষ্মকে জয় করার শক্তি আমাদের কারুরই নেই। আজকের যুদ্ধে আমাদের হাজার হাজার সৈন্য মারা গেলো অথচ পার্থকে দেখা গেলো উদাসীন রইলেন, শুধু ভীমই পাণ্ডবদের ক্ষত্রিয় তেজের সম্মান রেখেছেন। কিন্তু কৌরব দের এই বিশাল বাহিনী বোধ হয় একশো বছর ধরে যুদ্ধ করেও আমরা শেষ করতে পারবো না। আমার মনে হচ্ছে এই বৃথা যুদ্ধ করার চেয়ে রাতের অন্ধকারেই আবার আমাদের বনে চলে যাওয়াই ভালো।'

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'ভরত শ্রেষ্ঠ, আপনি শান্ত হোন। আগামী-

কালের যুদ্ধে অর্জুন কখনই উদাসীন থাকতে পারবেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অভিমন্যু আপনার মনে আশার দীপ জ্বালিয়ে দেবে। আপনি দয়া করে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আদেশ দিন।'

পরদিন যুধিষ্ঠিরের উপদেশ মত ধৃষ্টদ্যুম্ন 'ক্রৌঞ্চারু ব্যূহ' তৈরী করলেন। ভোরের রোদ উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সাথে সাথে যুদ্ধক্ষেত্র যেন রক্তপাগল হয়ে উঠলো। কৌরবদের প্রবল আক্রমণে পাণ্ডবসৈন্যরা দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, 'মাধব, ভীষ্মের দিকে রথ ছুটাও।'

যুদ্ধক্ষেত্রের সকলে অবাক হয়ে দেখলো সাতটি শ্বেতপদ্মের মত ঘোড়া একটি বিশাল ডানা মেলা সাদা রাজহাঁসের মত রথ নিয়ে ছুটেছে, রথের চূড়ায় মহাকপি হুংকার দিচ্ছে, চাকার ধ্বনি উঠেছে মেঘের চাপা গর্জনের মত, সেই অপূর্ব রথের রাশ ধরেছেন বাসুদেব, রথের উপর দাঁড়িয়ে অর্জুন, তাঁর দিব্য অস্ত্র, সোনার বর্ম সূর্যের কিরণ ছটায় ঝলসে উঠছে।

অর্জুনের হাতে কৌরবসৈন্যেরা কীটপতঙ্গের মত ধ্বংস হচ্ছে দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, 'গাঙ্গেয় আপনি ও দ্রোণ বেঁচে থাকতে অর্জুন কি করে আমাদের এমন করে ধ্বংস করতে পারছে? তাহলে সত্যিই কি আপনারা বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছেন?' এই কথা শুনে ভীষ্ম আকাশ ফাটা শংখধ্বনি করে অর্জুনের দিকে রথ ছুটিয়ে দিলেন।

ওদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভীম কলিঙ্গসৈন্যদের ভীষণ যুদ্ধে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছেন দেখে ভীষ্ম তাঁকে দমন করতে এগিয়ে গেলেন। চোখের নিমেষে ভীমের অস্ত্রের আঘাতে ভীষ্মের রথের সারথি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, রথের চারটি

ঘোড়া প্রাণের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রথ শুদ্ধ ভীষ্মকে নিয়ে পালিয়ে গেলো।

ভীমের হাতে কলিঙ্গরাজ ও তাঁর দুই ছেলে সৈন্য সামন্ত শুদ্ধ নিহত হলেন।

এদিকে দুর্যোধনের ছেলে লক্ষণের সাথে অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুর যুদ্ধ শুরু হলো। দুর্যোধন ও অর্জুন নিজের নিজের ছেলের পক্ষ নিয়ে লড়তে শুরু করলেন। কিন্তু অর্জুনের শর বর্ষণে অল্পক্ষণের মধ্যেই কৌরবপক্ষের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগলো। দ্রোণাচার্য তাঁর প্রিয় শিষ্যের বীরত্বে গর্বিত হয়ে ভীষ্মকে বললেন, 'অর্জুন আমার গৌরব।'

ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে দেখে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হলো।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তৃতীয় দিন

প্রভাত সূর্যের সোনালী আলোর আভা কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই ভীষ্ম 'গরুড় ব্যূহ' ও পাণ্ডবেরা 'অর্ধচন্দ্র ব্যূহ' রচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এই দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবদের অসাধারণ রণনৈপুণ্যে কৌরবসেনারা দ্রুত ধ্বংস হতে লাগলো। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধের একপর্যায়ে দুর্যোধন ভীমের এক শরাঘাতে অচেতন হয়ে রথের ওপর পড়ে গেলেন। সারথি তাঁকে নিয়ে দ্রুত রণভূমি ত্যাগ করল, তাঁর সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

সংজ্ঞালাভ করে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, 'পিতামহ, আপনি, দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্য থাকতে পাণ্ডবদের সামনে আমাদের সৈন্যেরা পিপীলিকার মত মরছে। আমার মনে হয় আপনারা তিনজনই স্নেহে অন্ধ হয়ে পাণ্ডবদের দিকে পক্ষপাতিত্ব করছেন বলেই এই অবস্থা। যদি আগেই আমি আপনাদের মনোভাব বুঝতে পারতাম তাহলে কর্ণের সঙ্গেই কর্তব্য স্থির করতাম।'

দুর্যোধনের কথা শুনে ক্রোধে অপমানে ভীষ্মের দু'চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো, তবু তিনি মুখে হাসি বজায় রেখে বললেন, 'বৎস, স্নেহ কখনও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে কর্তব্যচ্যুত করে না। আমি বৃদ্ধ, তবু আজ একাই আমার সবশক্তি দিয়ে পাণ্ডবদের ধ্বংস করবো।'

দুপুরে ভীষ্মের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত না করতে পেরে ঝড়ের মুখে শুকনো তৃণের মত পাণ্ডব সৈন্যেরা পালাতে লাগলো। যারা পালাবার পথ পেলো না তারা রক্তের স্রোতে ভাসতে লাগলো। হাহাকারে ভরে গেলো রণক্ষেত্রের আকাশ-বাতাস।

অর্জুনকে ডেকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'পার্থ এখনই সময়, তোমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে ভীষ্মকে পরাজিত করতে এগিয়ে চলো।'

কৃষ্ণ রথ নিয়ে ভীষ্মের মুখোমুখি হলে ভীষ্ম অর্জুনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'সাধু পার্থ! সাধু! তোমার এই বীররূপ দেখে দু'চোখ আমার জুড়িয়ে গেলো। এসো আমার সাথে যুদ্ধ কর।'

যুদ্ধ শুরু হলো। কিন্তু যুদ্ধে অর্জুনের উদাসীনতা দেখে কৃষ্ণ বুঝলেন, মায়া ও মমতার জন্য অর্জুন তাঁর বৃদ্ধ পিতামহকে আঘাত করতে পারছে না। কিন্তু এই দুর্বলতা হয়ে উঠছে পাণ্ডবদের জন্য ভীষণ ক্ষতির কারণ। তিনি ঠিক করলেন, আজ আমিই যুদ্ধ করে পাণ্ডবদের জন্য বিজয় এনে দেবো।

কৃষ্ণ হাত তোলা মাত্রই অদৃশ্য থেকে সুদর্শন চক্র এসে তাঁর হাতে পড়লো। পার্থ সারথি রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সেই তীক্ষ্ণ বজ্রের মত চক্র ঘোরালেন, হাজার সূর্য যেন তাতে ঝলসে উঠলো। তারপর চির মধুর মাধব ঠিক তরুণ সিংহ যেমন করে মদমত্ত হাতীকে বধ করতে ছোটে সেইভাবে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের সুনীল অঙ্গের পীতবর্ণ উত্তরীয় পতাকার মত উড়ছে, তাঁর চোখে-মুখে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে, কণ্ঠে বৈশাখী মেঘের গর্জন। তাঁকে দেখে উত্তাল তরঙ্গের মত যুদ্ধ পাগল সৈন্যেরা স্তব্ধ হয়ে গেল, রাজারা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। ভীষ্ম তাঁর ধনুক মাটিতে নামিয়ে রেখে করজোড়ে কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'প্রভু তোমাকে প্রণাম করি। মাধব, তুমি আমার দিকে ধাবিত হয়েছো এতেই আমি ধন্য, তোমার হাতে মৃত্যু হলে আমার পরম পুণ্যলাভ হবে।'

অর্জুন দ্রুত ছুটে এসে কৃষ্ণের দুই হাত চেপে ধরে বারবার ক্ষমা চেয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন, 'আমার দুর্বলতার জন্য ক্ষমা কর প্রভু। আমি শপথ করছি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, এই মুহূর্তে কৌরবদের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করব।'

কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে আবার রথে উঠলেন। তারপর অর্জুনের মাহেন্দ্র অস্ত্রের আঘাতে কৌরব পক্ষের দশহাজার রথী, সাতশো হাতী এবং সমস্ত প্রাচ্য, সৌবীর, ক্ষুদ্রক ও মালব সৈন্যের পতন হলো। বিকেলের ম্লান ছায়ায় রণক্ষেত্রের রক্ত স্রোত, নিহত মানুষ, ঘোড়া ও হাতীর মৃতদেহ মিলে এক ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি হল।

যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হবার পর পর শিবিরগুলোতে রক্তাক্ত শিখার মত শত শত মশাল জ্বলে উঠলো। পরাজিত ভীষ্ম আনন্দ ও বেদনায় সমস্ত রাত্রি জেগে কাটালেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন

পরদিন প্রভাতে ভীষ্ম নতুন উদ্যমে অর্জুনের প্রতি ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামা, শল্য ও শল্য পুত্রের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ হতে লাগলো। ধৃষ্টদ্যুম্ন গদাঘাতে শল্যের পুত্রকে নিহত করলেন। ওদিকে মহাবাহু ভীমসেন আসছেন দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দুর্যোধন দশ হাজার গজারোহী সৈন্য পাঠালেন। ভীম তাঁর দুরন্ত পদাঘাতে সেই হাতি ও সৈন্য দলকে দলিত করে রণক্ষেত্রময় রুদ্র শিবের মত প্রলয় নাচন নাচতে লাগলেন।

এরপর দুর্যোধনের চৌদ্দজন ভাই একত্রে ভীমকে আক্রমণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ভীম সাতজনকে বধ করলেন এবং অন্যেরা প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচলো। তখন ভীষ্মের আদেশে ভগদত্ত ভীমের দিকে শরবর্ষণ করলেন, সেই শরাঘাতে ভীম মূর্চ্ছিত হয়েও রথের ধ্বজ দণ্ড ধরে রইলেন। পিতার এই অবস্থা দেখে ভীষ্মের ছেলে ঘটোৎকচ নিমেষের মধ্যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে তাঁর বাহন রাক্ষসদের আহ্বান করলেন। ভয়ংকর দর্শন সব রাক্ষসদের আক্রমণে কৌরব সৈন্য ও তাদের হাতি ঘোড়া সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ঘটোৎকচ বজ্রহুংকার ছেড়ে ভীষ্মের দিকে ছুটে গেলেন। ভীষ্ম নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, 'হিড়িম্বা পুত্র, আমি এই সময়ে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নই। তাছাড়া সূর্য অস্তে যাচ্ছেন, অতএব এখন যুদ্ধের বিরাম হোক।'

পঞ্চম দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়েও ভীষ্ম যুদ্ধ করতে লাগলেন।

এই যুদ্ধে যাদববীর সাত্যকির দশজন ছেলে ভূরিশ্রবার ভল্লের আঘাতে নিহত হলে পাণ্ডবেরা বেদনায় ক্রোধে অধীর হয়ে কৌরবদের প্রতি ভয়ংকর আক্রমণ চালালেন। এই দিনে অর্জুনের শরাঘাতে কৌরব পক্ষের পঁচিশ হাজার মহারথ নিহত হলেন।

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে দ্রুপদ নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন 'মকর ব্যূহ' রচনা করে পাণ্ডবদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করলেন। কৌরবদের পক্ষে পিতামহ ভীষ্ম নির্মাণ করলেন 'ক্রৌঞ্চ ব্যূহ।'

শুরু হলো ভীম ও অর্জুনের সাথে ভীষ্ম এবং দ্রোণের ঘোর সংগ্রাম।

ওদিকে হস্তিনাপুরের রাজসভায় বসে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন সঞ্জয়ের মুখে প্রতিদিন যুদ্ধের বিবরণ শোনেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তম দিনের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত হয়ে বললেন, 'সঞ্জয়, কৌরবসৈন্য ও সেনাপতিরা প্রত্যেকে বলিষ্ঠ ও সবরকমের অস্ত্র প্রয়োগে সুপটু, তার ওপর তাদের সংখ্যাও অনেকগুণ বেশী, তবু যুদ্ধে এমন বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে। হয়তো দেবতাদের প্রাসাদেই পাণ্ডবরা এমন অসাধারণ হয়ে উঠেছে। আমার মূর্খ পুত্র কারুর কোন উপদেশ শোনে নি, এখন তার প্রত্যক্ষ ফলভোগ করতে চলেছে।'

সঞ্জয় বললেন, 'মহারাজ, আপনার দোষেই দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল, তার ফল এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যা হবার তা হবে, এখন যুদ্ধের বিবরণ শুনুন।'

সঞ্জয় আবার বর্ণনা দিতে শুরু করলেন, 'ভীম রথ থেকে নেমে গদা হাতে কৌরব সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে গদাঘাতে হাতী, ঘোড়া, রথী, পদাতি ধ্বংস করতে লাগলেন। ভীমকে একা উন্মত্তের মত লড়তে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন ছুটে এসে তাঁর দেহে বিঁধে থাকা বাণগুলো

তুলে ফেলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে নিজের রথে তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ শুশ্রুষার পর ভীমসেন সুস্থ হয়ে আবার ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসে দ্রোণ ও দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন। অভিমন্যু দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র ও শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু সসৈন্যে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করতে এলেন।

অপরাহ্নের ছায়া নেমে এলো, সূর্য যেন যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত রক্তে স্নান করে জবাকুসুম সংকাশ হয়ে উঠেছেন। ভীম ভীষণ কণ্ঠে দুর্যোধনকে বললেন, 'এখনও যুদ্ধ থেকে বিরত হও, নতুবা আজ তোমাকে বধ করে কৃষ্ণার কাছে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবো। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু নষ্ট হল, রথের সারথি আহত ও অশ্বগুলি নিহত হল, দুর্যোধন শরবিদ্ধ হয়ে মূর্ছিত হলেন, কৃপাচার্য দ্রুত এসে তাঁকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। যুদ্ধ বিরতির কিছুক্ষণ আগে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর ছেলেদের হাতে দুর্যোধনের চারজন ভ্রাতা নিহত হলেন।'

রক্তাক্তদেহ দুর্যোধনকে নিজ হাতে ওষুধ প্রয়োগ করে পিতামহ ভীষ্ম সুস্থ করে তুললেন। তাঁর যত্ন ও বিশল্য করণী ওষধির প্রভাবে শক্তি ফিরে পেয়ে দুর্যোধন সপ্তম দিনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধকালে অর্জুনের বিক্রম দেখে ভয় পেয়ে তিনি স্বপক্ষের রাজাদের বললেন, 'বৃদ্ধ পিতামহ তাঁর সব শক্তি দিয়ে পার্থকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করছেন, আপনারা তাঁকে রক্ষা করুন।' রাজারা তৎক্ষণাৎ ভীষ্মের সাহায্যে এগিয়ে গেলেন।

এদিকে বিরাট রাজ তাঁর ছেলে শংখের রথে চড়ে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। দ্রোণের এক বিষাক্ত বাণের আঘাতে তরুণ শংখ নিহত হয়ে পড়ে গেলেন। দ্বিতীয়বার পুত্রশোকে হাহাকার করতে করতে

বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

ভীষ্ম ও শিখণ্ডীর যুদ্ধ চলাকালে সূর্যাস্ত হল। শ্রান্ত যোদ্ধারা শিবিরে ফিরে স্নান ও পূজা শেষ করে বিশ্রামে দেহ এলিয়ে দিলেন। পাচক আর ভৃত্যেরা এসে রাজপুরুষদের খাদ্য ও সেবায় তুষ্ট করলো। গায়ক ও স্তুতি পাঠকেরা সঙ্গীত ও নানারকম নির্মল আনন্দে যুদ্ধ শিবিরকে পরম মধুর করে তুললো।

বাইরে হেমন্তের বিশাল আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলছে, ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। কে বলবে কিছুক্ষণ আগেই এখানে মানুষে মানুষে কি ভয়াবহ হানাহানি হয়ে গেছে!

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরও দুই দিন

যুদ্ধের অষ্টম দিনে অর্জুন পুত্র ইরাবাণ ও ভীমপুত্র ঘটোৎকচ প্রবল পরাক্রম নিয়ে যুদ্ধ করলেন, কৌরব সেনাবাহিনী রাক্ষসী হিড়িম্বার ছেলে ঘটোৎকচের যুদ্ধে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু অলম্বুষের খড়্গের আঘাতে ইরাবাণের মৃত্যু ঘটায় পাণ্ডবকুলে কান্নার রোল উঠলো।

পুত্র শোকে অধীর অর্জুন ক্রুদ্ধ বাঘের মত ভীষ্ম ও কৃপকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের আরও সাত ভাই নিহত হলেন এবং অন্যেরা ভীত হয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

যুদ্ধবিরামের পর কর্ণ ও শকুনি দুর্যোধনকে বললেন, 'যত যাই বল না কেন, পাণ্ডবদের প্রতি ভীষ্মের পক্ষপাতিত্বের কারণেই আমাদের

জয় হচ্ছে না।'

কর্ণ রুক্ষস্বরে বললেন, 'ভীষ্ম যদি তাঁর এই ভাব ত্যাগ করতে না পারেন তাহলে তাঁকে অস্ত্র ত্যাগ করতে বল, আমি তাঁকে দেখিয়ে দিতে চাই কিভাবে পাণ্ডবদের ধূলিস্মাৎ করতে হয়।'

দুর্যোধন রাত্রিবেলাই ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হলেন। তাঁর স্পষ্ট অভিমত শুনে ভীষ্ম অত্যন্ত বেদনার্ত ও ক্রুদ্ধ হলেও শান্ত স্বরে বললেন, 'দুর্যোধন এ তোমার নিয়তি। তা না হলে যে অর্জুন খাণ্ডব-দাহে ইন্দ্রকে বিপর্যস্ত করেছেন, নিবাত কবচদের হত্যা করেছেন, গন্ধর্বের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করেছেন, বিরাটরাজের গোহরণ কালে যুদ্ধে তোমাদের পরাস্ত করেছেন সেই অর্জুন এবং তাঁর ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধে নামার স্পর্ধা তোমার হবে কেন? অনন্ত শক্তি কৃষ্ণ যাঁদের সহায় তাঁরা যে অজেয় এতো বালকেও বোঝে। তবু আমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি যে তাঁদের সাথে আমৃত্যু যুদ্ধ করব একথা বার বার বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে দ্রুপদ নন্দন শিখণ্ডীকে আমি বধ করতে পারব না কারণ সে নারী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলো এবং তপস্যার ফলে পুরুষ জন্মলাভ করেছে। তবু আমার বিবেচনায় সে স্ত্রীলোক এবং নারী হত্যা কখনই বীর ধর্ম নয়।'

দুর্যোধন ভীষ্মকে প্রণাম করে আপন শিবিরে ফিরে এলেন।

নবম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম 'সর্বতো ভদ্র' নামে এক মহা ব্যূহ রচনা করলেন। এ দিনের যুদ্ধে পিতামহ ভীষ্ম যেন তরুণ সিংহের মত বিক্রম নিয়ে পাণ্ডবদের আক্রমণ করলেন। প্রকৃতিতে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিল, পাণ্ডব মহারথীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে ছুটে পালাতে লাগলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ধনঞ্জয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা

করে ক্ষত্র ধর্ম পালন কর।'

অর্জুন চোখ নত করে বললেন, 'বাসুদেব আমরা পাঁচভাই বাল্যে পিতৃহীন হয়ে পিতামহ ভীষ্মের স্নেহে বড় হয়েছি। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ধূলো খেলা খেলতে খেলতে তাঁকে জড়িয়ে ধরতাম, তাঁর মহামূল্যবান পোষাক মলিন হয়ে যেতো তবু তিনি আমাকে কোলে তুলে নিতেন। সেই আমার বটবৃক্ষের মত ছায়াময় আশ্রয়-দাতাকে হত্যা করার চেয়ে বনবাসের জীবনই কি ভালো ছিল না?'

কৃষ্ণ বললেন, 'তাহলে আমাকে সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করতে বল, আমিই অপ্রিয় কাজটি করি।'

অর্জুন ভীত হয়ে কৃষ্ণকে ভীষ্মের কাছে রথ নিতে বললেন। তিনি নিজেই কর্তব্য পালন করবেন। ভীষ্মের বাণবর্ষণে অর্জুনের রথ আচ্ছন্ন হল। উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য বিনষ্ট হবার পর অবহার ঘোষিত হল। দুর্যোধনেরা শিবিরে ফিরে পিতামহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন।

ভীষ্মের কাছে পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ

রাত্রে শিবিরে বসে পঞ্চপাণ্ডব, তাঁদের মিত্র রাজারা ও কৃষ্ণ কথাবার্তা বলতে বলতে এটাই বুঝলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির খুবই মনোকষ্টে ভুগছেন। বিশেষ করে যুদ্ধে ভীষ্মের হাতে তাঁদের এত সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে বলে তাঁর হৃদয় শোকে ফেটে যাচ্ছে। এত রক্ত, এত হত্যা! এসবের চেয়ে কাম্যকবনের সেই সবুজ ছায়া ভরা আশ্রমের জীবন তাঁর কাছে অনেক বেশী শান্তির আর পবিত্র মনে হচ্ছে। সেখানে থাকলে ধর্ম

চিন্তা ও সৎ কাজে জীবন অনেক সুন্দর হতো, সুখী হতো।

যুধিষ্ঠিরের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কৃষ্ণ বললেন, 'বুঝতে পারছি পঞ্চপাণ্ডব দুর্জয় বীর হয়েও শুধু মাত্র পিতামহ ভীষ্মের স্নেহের কথা মনে করে যুদ্ধে জয়ী হবার চেষ্টা করছেন না। ঠিক আছে, প্রিয় সখা অর্জুন যদি তাঁর কর্তব্য করতে না পারেন তাহলে আগামীকালের যুদ্ধে আমি ভীষ্মকে বধ করি, যুদ্ধের পিপাসা চিরদিনের মত মিটিয়ে দিই।'

যুধিষ্ঠির হাতজোড় করে বললেন, 'বাসুদেব তুমিই আমাদের জীবন মরণের প্রভু। কিন্তু আমাদের জন্য তুমি মিথ্যাবাদী হও এটা আমি চাই না। তুমি বলেছিলে এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। আমি চাই তোমার প্রতিজ্ঞা ঠিক থাকুক। পিতামহ ভীষ্ম আমাকে বলেছিলেন, যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য তিনি আমাকে সৎপরামর্শ দেবেন। জয়ী হবার একমাত্র উপায় সেই দেবতা তুল্য বৃদ্ধকে হত্যা করা। আর সেই উপায়ই আমাকে তাঁর কাছ থেকে জানতে হবে। কি নিষ্ঠুর এই ক্ষত্রিয় ধর্ম!'

এরপর পাণ্ডবেরা ও কৃষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র রেখে ভীষ্মের শিবিরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীষ্ম তাঁদের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে যুধিষ্ঠির চোখের জল মুছে বললেন, 'পিতামহ, বলে দিন কোন্ উপায়ে আমরা জয়ী হব? আপনার দুরন্ত তেজের সামনে আমরা ধূলো কণার মত উড়ে যাচ্ছি, আপনার যুদ্ধ কৌশলের কোন ফাঁকই খুঁজে পাই না। বলে দিন কি করে আপনাকে পরাজিত করবো? কোন্ উপায়ে বধ করবো।'

ভীষ্ম মধুর হেসে যুধিষ্ঠিরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় দৌহিত্র। আমি চাই তুমি জয়লাভ করে

পৃথিবীর সম্রাট হও। কিন্তু আমাকে পরাজিত করা দেবতারও সাধ্য নয়। তাই বলছি, আমি যদি আপন ইচ্ছায় অস্ত্র ত্যাগ করি তাহলেই পরাজিত হতে পারি। মনে রেখো—নিরস্ত্র, ভূপতিত, ভীত, বর্ম ও ধ্বজবিহীন, স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রীলোক জাতীয়, পঙ্গু এবং নীচ জাতির সাথে যুদ্ধে আমার বড় ঘৃণা।' তোমাদের সেনাদলে দ্রুপদ রাজার ছেলে মহারথ শিখণ্ডী আছেন, হয়তো জানো, তিনি আগে নারী ছিলেন। শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন তুমি আমার প্রতি শরবর্ষণ কর। তুমি নরনারায়ণ সব্যসাচী, আমার পরম আদরের দৌহিত্র, তোমার হাতে মৃত্যু আমার জন্য গৌরবময়।'

ভীষ্মকে প্রণাম করে পাণ্ডবেরা নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন। অর্জুনের বিষণ্ণ মুখ ও সজল চোখ দেখে কৃষ্ণ বললেন, 'ফালগুনী তুমি বৃথা দুর্বল হচ্ছো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের মৃত্যু হবে একথা দেবতারা আগেই জেনে গেছেন। মহাজ্ঞানী দেবগুরু বৃহস্পতির এই উপদেশ—বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ গুণবান পুরুষও যদি আততায়ী হয়ে আসেন তবে তাঁকে বধ করবে। এখন তোমার কর্তব্য শিখণ্ডীর সাহায্যে ভীষ্মকে বধ করা। আমিও শুনেছি শিখণ্ডী প্রথমে মেয়ে হয়ে জন্মেছিলেন, পরে দেবতার দয়াতে পুরুষ হয়েছেন। তবে ভীষ্মের চোখে তিনি মেয়েই রয়েছেন।'

দশম দিনের যুদ্ধ ও ভীষ্মের পতন

অগ্রহায়ণের শিশির ভেজা ঘাসের ওপর ভোরের সূর্যের কিরণ হীরার কুচির মত ছড়িয়ে পড়লো। পাণ্ডবেরা যুদ্ধ সাজে সেজে রণক্ষেত্রে এসে 'সর্বজয়ী ব্যূহ' তৈরী করলেন।

শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন শরবর্ষণ করতে করতে ভীষ্মের দিকে এগোলেন। ভীষ্ম মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই যুদ্ধে নামলেন। শিখণ্ডী তাঁর দিকে শর নিক্ষেপ করলে ভীষ্ম হেসে উঠে বললেন, 'তুমি যা-ই কর না কেন তোমার সাথে যুদ্ধে আমার রুচি নেই। বিধাতা যে তোমাকে শিখণ্ডীনি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সেকথা ভুলি কি করে?'

এই কথা শুনে শিখণ্ডী ভীষণ রাগে চীৎকার করে বললেন, 'আপনি যুদ্ধ করুন বা না করুন আমার হাত থেকে আপনার রেহাই নেই, মৃত্যুর জন্য তৈরী হোন।'

অর্জুন শিখণ্ডীকে বললেন, 'তুমি ভীষ্মকে আক্রমণ কর, আমি চতুর্দিক থেকে তোমাকে রক্ষা করব। আজ যদি ভীষ্মকে বধ করতে না পারো তাহলে লোক সমাজে আমি আর তুমি হাস্যাস্পদ হবো।'

কৌরবসেনাদের চরম দুর্দশা দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, 'পিতামহ, আজই কি আমাদের শেষ লগ্ন উপস্থিত? আপনি যদি রক্ষা না করেন তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হই।'

ভীষ্ম করুণ বচনে বললেন, 'দুর্যোধন আমি তোমাদের দলভুক্ত,

তোমার পিতার অন্ন ঋণ আমি শোধ করবো এই আমার প্রতিজ্ঞা। তোমার সেনাবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিহত হয়ে আজ সেই মহৎঋণ পরিশোধ করার সুযোগ আমার উপস্থিত হয়েছে। আমাকে মরতে দাও।'

ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন শিউরে উঠলেন। তবে কি আজই কৌরব সূর্য অস্ত যাবে।

দশদিন ধরে পাণ্ডববাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ধর্মাত্মা ভীষ্ম বড় আত্মগ্লানি অনুভব করছিলেন। তিনি সম্মুখে যুধিষ্ঠিরকে দেখে বললেন, 'প্রিয় রাজা, জীবনের প্রতি বড় বিতৃষ্ণা অনুভব করছি, অর্জুনকে বল, দ্রুপদ নন্দনদের নিয়ে আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বধ করুক।'

ভীষ্মের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের সৈন্যদের বললেন, তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ, কর, অর্জুন তোমাদের রক্ষা করবেন।

এই দশম দিনের যুদ্ধে দীর্ঘক্ষণ অর্জুনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ভীষ্ম এই চিন্তা করলেন, কৃষ্ণ যদি এদের রক্ষক না হতেন তাহলে বহু আগেই পাণ্ডবদের আমি বিনষ্ট করতে পারতাম। পিতা (শান্তনু) যখন সত্যবতীকে বিবাহ করেন তখন তুষ্ট হয়ে আমাকে দু'টি বর দিয়েছিলেন, ইচ্ছা মৃত্যু ও যুদ্ধে অবধ্যতা। আমার মনে হয় এই-ই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত কাল।

ভীষ্মের এই চিন্তা ও সংকল্প জেনে আকাশ হতে ঋষি ও বসুগণ দৈববাণী করলে, 'বৎস, তুমি যা স্থির করেছ তা অতি মহৎ, তুমি যুদ্ধ থেকে বিরত হও।'

ভীষ্ম অনুভব করলেন, স্নিগ্ধ সুবাসিত বাতাস বইছে, মধুর শব্দে দিব্য বাজনা বাজছে, তাঁর মাথায় দেবতারা দিব্যগন্ধ পুষ্প বৃষ্টি করছেন। কিন্তু একমাত্র ভীষ্ম ও সঞ্জয় ছাড়া এসব কেউ জানতে পারলেন না।

ভীষ্ম হাত থেকে অস্ত্র নামিয়ে রাখলেন। শিখণ্ডী নয়টি বাণ দিয়ে তাঁর বুকে আঘাত করলেন, কিন্তু ভীষ্ম অবিচলিত। তখন অর্জুন বৃষ্টি-ধারার মত বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম তখন ঢাল ও খড়্গ নিয়ে রথ থেকে নামবার উপক্রম করলেন কিন্তু অর্জুনের বাণে তাঁর ঢালের চামড়া ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কৌরব বীরেরা চারদিক থেকে ভীষ্মকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অভিমন্যুর বাণে আহত হয়ে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য প্রভৃতি মহারথেরা ভীষ্মকে ছেড়ে চলে গেলেন। ততক্ষণে ভীষ্মের দেহে এত বাণ বিদ্ধ হয়েছে যে দুই আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই। সূর্যাস্তের সামান্য আগে অর্জুনের শরে ক্ষতবিক্ষত ভীষ্ম পূর্বদিকে মাথা রেখে রথ থেকে পড়ে গেলেন, কিন্তু শরে দেহ আচ্ছন্ন থাকায় তিনি মাটি স্পর্শ করলেন না। আকাশের দিকে চোখ তুলে মহারথ ভীষ্ম দেখলেন সূর্য দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ এখন দক্ষিণায়ন। তিনি আকাশ থেকে দৈববাণী শুনলেন, 'নরশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় (গঙ্গার পুত্র) কি দক্ষিণায়নে প্রাণ ত্যাগ করবেন ?'

ভীষ্ম উত্তর দিলেন, 'না, আমি উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করব।'

মানস সরোবর থেকে মহর্ষি ও দেবর্ষিরা হাঁসের রূপ ধরে ভীষ্মের দর্শনে এলেন। কৌরবেরা হতাশ হয়ে পড়লেন। বিজয়ী পাণ্ডবদের শংখধ্বনি ও সিংহনাদে ধরণী কাঁপতে লাগলো। শান্তনু পুত্র ভীষ্ম শরবিদ্ধ অবস্থাতেই দেবতার নাম জপে মগ্ন হয়ে মৃত্যুকালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

দুঃশাসনের মুখে ভীষ্মের পতনের সংবাদ শুনে তাঁর চিরবান্ধব দ্রোণ মূর্ছিত হলেন। জ্ঞান ফেরার পর সৈন্যদের তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হবার আদেশ দিলেন। উভয় পক্ষের রাজারা অস্ত্র ও বর্ম ত্যাগ করে ভীষ্মের কাছে এসে কৃতাঞ্জলী পুটে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভীষ্ম সকলকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আমার মাথা ঝুলছে, উপাধান (বালিশ) দাও। রাজারা শিবির থেকে কোমল রেশমী বালিশ নিয়ে এলে ভীষ্ম ক্লিষ্ট হাস্যে বললেন, গাণ্ডীবি অর্জুন জানেন আমার কোন উপাধান প্রয়োজন।'

তখন অর্জুন মন্ত্রপুত তিনটি বাণ নিক্ষেপ করে ভীষ্মের মাথা তুলে দিলেন। ভীষ্ম তুষ্ট হয়ে বললেন, 'রাজারা দেখ, সব্যসাচী আমাকে উপাধান দিয়েছেন। উত্তরায়ণের শুরু পর্যন্ত আমি এই শয্যায় শুয়ে থাকব, সূর্য যখন উত্তর দিকে গিয়ে সবদিকে সমান ভাবে তাপ ছড়াবেন আমি তখন আমার মৃত্যুকে আহ্বান জানাবো, বিদায় নেব তোমাদের এই পৃথিবী থেকে।'

রাজবৈদ্যরা ভীষ্মের চিকিৎসার জন্য এলেন কিন্তু ভীষ্ম তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'চিকিৎসার প্রয়োজন নেই, আমি ক্ষত্রিয়ের মহান গতি লাভ করতে চলেছি।' উপস্থিত রাজারা এবং পঞ্চপাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্ররা ভীষ্মকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন, তারপর তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করে দুঃখিত মনে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে আবার সকলে ভীষ্মের কাছে এলেন। দলে দলে বহু সহস্র বধূ ও কন্যা ভীষ্মের দেহে চন্দন চূর্ণ ও পুষ্পাঞ্জলী দিতে লাগলো, ব্রাহ্মণেরা স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ভীষ্মের কোন কাতরোক্তি নেই, তিনি শুধু পিপাসার কথা জানালেন। সকলে নানা প্রকার খাদ্য ও সুশীতল জলের পাত্র নিয়ে এলেন।

ভীষ্ম বললেন, 'আমি আর মানুষের ভোগ্য খাবার গ্রহণ করতে পারি না, অর্জুন তুমি আমাকে বিধি সম্মত জল দাও। শুধু জল।'

অর্জুন ভীষ্মকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে রথে উঠলেন এবং মন্ত্র পাঠ করে গাণ্ডীবে 'পর্জন্যাস্ত্র যুক্ত (জলবর্ষী মেঘযুক্ত) বাণ' নিক্ষেপ করে ভীষ্মের দক্ষিণ পাশের মাটি বিদ্ধ করলেন। সেখান থেকে অমৃতের মত সুস্বাদু ও সুবাসিত জলের ধারা উঠতে লাগলো (ফোয়ারার মত), অর্জুন সেই জলে মুমূর্ষু ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করলেন। রাজারা বিস্মিত হয়ে জয়ধ্বনি করে উঠলেন, চারদিকে শংখ ও দুন্দুভি বেজে উঠলো।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে ডেকে বললেন, 'বৎস তুমি অর্জুনকে জয় করতে পারবে না, আমার শেষ অনুরোধ, তুমি পাণ্ডবদের সাথে সন্ধি করে তাঁদের রাজ্য ও ধন সম্পদ ফিরিয়ে দাও।'

দুর্যোধন নীরবে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। এরপর সকলে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে যাবার পর কর্ণ এসে ভীষ্মের চরণে পড়ে বললেন, 'কুরুশ্রেষ্ঠ আমাকে ক্ষমা করুন, আমি ঔদ্ধত্যের বশে অনেক স্পর্ধা করেছি।'

ভীষ্ম সস্নেহে বললেন, 'কর্ণ তুমি আমার ছেলের মত, তোমার ওপর আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমি তোমার কল্যাণ চাইতাম বলেই তোমাকে কৌরবদের কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আমি জানি তুমি মহাদাতা, সত্যনিষ্ঠ এবং অস্ত্রপ্রয়োগে কৃষ্ণের সমান। আবার নারদের কাছ থেকে এ কথাও জেনেছি যে তুমিই প্রথম পাণ্ডব, কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি যে পাণ্ডবদের সাথে মিলিত হও, আমার মৃত্যুতে তোমাদের শত্রুতার অবসান হোক।'

কর্ণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ক্ষমা করুন কুরুশ্রেষ্ঠ, আপনার সৎ উপদেশ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কুন্তী আমাকে জন্মলগ্নে বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু মাতা রাধা তাঁর বুকে করে আমাকে মানুষ করেছেন, কৌরবেরা সূতপুত্র জেনেও আমাকে রাজার সম্মান দিয়েছেন। আমি পাণ্ডব হবার গৌরব আদৌ চাই না। শুধু আশীর্বাদ করুন যেন রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুবরণ করতে পারি।'

ভীষ্মকে প্রণাম করে কর্ণ আপন শিবিরে ফিরে গেলেন।

দ্রোণ পর্ব

দ্রোণের অভিষেক

কর্ণ যুদ্ধ সাজে সেজে ভীষ্মকে প্রণাম করে বললেন, 'ভরতশ্রেষ্ঠ, এতদিন আপনার ওপর অভিমান করে আমি অস্ত্র ধরিনি, আজ যুদ্ধে নামছি। আশীর্বাদ করুন যেন অর্জুনকে বধ করে জয়ী হতে পারি।'

ভীষ্ম কর্ণকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। দুর্যোধন কর্ণের সাথে পরামর্শ করে দ্রোণাচার্যকে ভীষ্মের জায়গায় সেনাপতির দায়িত্ব নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

দ্রোণাচার্য বললেন—'ভীষ্মের পতনে কৌরব সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে, আমি এই দায়িত্ব নিয়ে অবশ্যই তাদের জাগিয়ে তুলবো। তবে একটা কথা তোমাদের জানা দরকার যে, দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে হত্যা করার জন্যই যজ্ঞবেদী থেকে জন্মেছে। কাজেই তাকে বধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

দুর্যোধন দ্রোণকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করলেন। দ্রোণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বর প্রার্থনা করতে বললেন।

দুর্যোধন বললেন, 'গুরুদেব, এই বর দিন যে যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে ধরে আনবেন।'

দ্রোণ অবাক হয়ে ভাবলেন, এ কেমন প্রার্থনা! যুধিষ্ঠিরকে কি তাহলে ধর্মপুত্র বলে দুর্যোধন হত্যা করতে ভয় পাচ্ছে?

দ্রোণের চিন্তা বুঝতে পেরে দুর্যোধন বললেন, 'যুধিষ্ঠিরকে যদি আমি বধ করি তাহলে তাঁর চার ভাই স্বর্গ মর্ত-পাতাল তছনছ করে আমাকে খুঁজে এনে বধ করবে, পৃথিবী থেকে কৌরবদের নাম মুছে দেবে। তারচেয়ে যদি ধর্মরাজকে ধরে আনা যায় তাহলে আবার তাঁকে আমি পাশা খেলার আমন্ত্রণ জানাবো এবং খেলায় হারিয়ে দিয়ে আরও বহু বছরের জন্য বনবাসে পাঠাবো। এতে যুদ্ধে আমাদের মরতে হবে না, আবার পাণ্ডবদের রাজ্যও দিতে হবে না।'

দুর্যোধনের এই নীচ পরিকল্পনা শুনে দ্রোণ লজ্জায় ঘৃণায় হতবাক হয়ে গেলেন। তবু মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, 'যুদ্ধের সময় অর্জুনকে যদি ধর্মরাজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারো তাহলে তাকে ধরে আনা সম্ভব কিন্তু অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করতে চাইলে দেবতারও অসাধ্য হবে এ কাজ।'

অর্জুনের জয় ও সংশপ্তকদের শপথ

গুপ্তচরের মুখে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য ও দুর্যোধনের কথাবার্তার খবর জানতে পেরে বললেন, 'আমাদের গুরুদেব আসলেই আমাদের কল্যাণ চান বলে এমন কথা বলেছেন।'

অর্জুন বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে দ্রোণাচার্য সত্যিই আপনাকে স্পর্শ করতে পারবেন না। তবে তিনি আমার অস্ত্রগুরু, তাঁকে বধ করাও আমার জন্য অধর্ম।'

যুদ্ধের এগারো দিন চলছে। অর্জুনের শরের মুখে দ্রোণের সৈন্যরা ঝড়ের মুখে ধুলোকণার মত উড়ে যেতে লাগলো। কৌরব-সৈন্যরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে দেখে দ্রোণ ও দুর্যোধন যুদ্ধ থামিয়ে শিবিরে ফিরে গেলেন।

দ্রোণ রাত্রে শিবিরে বসে দুঃখিত হয়ে বললেন, 'রাজা দুর্যোধন, আমি অনেক আগেই বলেছি ধনঞ্জয়ের সামনে থেকে যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনা দেবতাদেরও অসাধ্য। তোমরা কেউ যদি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করে ধর্মরাজের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে পারো আমি নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে হরণ করে আনতে পারবো।'

দ্রোণের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর পাঁচ ভাই সংশপ্তক-দের (যে সৈন্যরা মৃত্যু অনিবার্য জেনেও যুদ্ধ করে অর্থাৎ Suicidal Squad) ডেকে পাঠালেন। সংশপ্তকেরা আগুন ছুঁয়ে অর্জুন বধের প্রতিজ্ঞা করলেন।

তারপর সুশর্মা পাণ্ডবদের শিবির মুখে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁর চীৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেলো। শিবিরে শিবিরে সৈন্যরা চমকে উঠলো।

অর্জুন এই আহ্বান শুনে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আগামীকালের যুদ্ধে আমাকে সুশর্মার এই আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। পাঞ্চাল বীর সত্যজিৎ আপনাকে সর্বক্ষণ রক্ষা করে রইবেন। একটা অনুরোধ করছি, যদি যুদ্ধে সত্যজিৎ মারা যান তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে

শিবিরে চলে যাবেন। যত বড় আর যত সংখ্যক মহারথী বীরেরাই আসুন কখনই আপনি তাঁদের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবেন না।'

যুধিষ্ঠির অর্জুনের কথায় রাজী হলেন এবং তাঁকে পরদিনের যুদ্ধ যাত্রার জন্য অনুমতি দিলেন।

প্রভাত সূর্য ওঠার সাথে সাথে শুরু হলো যুদ্ধের বারোদিন।

অর্জুনকে কৃষ্ণের সাথে আসতে দেখে সংশপ্তকেরা উৎসাহে উল্লাসে ফেটে পড়লো।

অর্জুন হাসতে হাসতে কৃষ্ণকে বললেন, 'চমৎকার! ত্রিগর্ত ও তাঁর ভাইরা আমাকে দেখে মূর্খের মত হাসছে, অথচ ওরা ঠিকই জানে এরপর ওদের কাঁদতে হবে।'

অর্জুন দেবদত্ত শংখধ্বনি করে সংশপ্তকদের চমকে দিলেন, তারপর বৃষ্টিধারার মত শর বর্ষণ করতে লাগলেন। সংশপ্তকেরা দিশেহারা হয়ে পড়ছে দেখে সুশর্মা চীৎকার করে তাঁদের অগ্নিশপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সংশপ্তকেরা এবং নারায়ণী সৈন্যদল (কৃষ্ণ দুর্যোধনকে যে বিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়েছিলে) মৃত্যুপণ করে যুদ্ধ করতে লাগলো।

ধৃষ্টদ্যুম্নকে যুধিষ্ঠিরের পাশে দেখে দ্রোণ একটু হতাশ হলেন তবু তিনি ভীষণ তেজের সাথে যুদ্ধ করে সত্যজিৎকে বধ করলেন। সত্যজিৎ নিহত হবার সাথে সাথে যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দ্রুত শিবিরে চলে গেলেন।

দ্রোণাচার্য ঠিক যেন তরুণ যোদ্ধার মত তেজে যুদ্ধ করে পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ইত্যাদি দেশের বীরদের পরাজিত করলেন। পাণ্ডব সৈন্যেরা কৌরব সৈন্যদের কাছে নাজেহাল হয়ে পালাতে লাগলো। তখন ভীমসেন তাঁর সিংহধ্বজ রথ নিয়ে দ্রোণের দিকে ছুটে এলেন।

তাই দেখে কৌরব দলের মিত্র রাজা ভগদত্ত ঐরাবত জাতীয় হাতির (ঐরাবত হচ্ছে স্বর্গের দেবতাদের হাতি) পিঠে চড়ে ভীমকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন। ততক্ষণে অর্জুন সংশপ্তকদের ধ্বংস করে ছুটে এসেছেন ভগদত্তকে আক্রমণ করতে।

অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে ভগদত্তের ঐরাবতের বর্ম ছিঁড়ে ফেলার সাথে সাথে ভগদত্ত অর্জুনের দিকে বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। চোখের পলকে কৃষ্ণ সামনে এসে সেই অস্ত্র বুক পেতে নিলেন। অলৌকিক ভাবে বৈষ্ণবাস্ত্র শ্বেতপদ্মের মালা হয়ে কৃষ্ণের বুকে দুলতে লাগলো।

অর্জুন দুঃখিত হয়ে বললেন, 'মাধব, তুমি কেন প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিলে? এ অস্ত্র কি আমি আটকাতে পারতাম না?'

কৃষ্ণের মুখ মধুর হাসিতে অপরূপ দেখালো। অর্জুনকে তিনি স্নেহের সুরে বললেন, 'সখা ফালগুনি, কিছু কিছু ছলনা আছে যা যুদ্ধে এবং প্রণয়ে করা অন্যায় নয় (উল্লেখ্য ইংরেজী প্রবাদ : Nothing is unfair in war and love.)'

অর্জুন তবু বিষণ্ণ হয়ে রয়েছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, 'শোন পার্থ, একটা গোপন কথা তোমাকে বলি, এক হাজার বছর আগে এই বৈষ্ণবাস্ত্র আমি নরকাসুরকে দিয়েছিলাম। ভগদত্ত নরকাসুরের কোন উপকার করে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে এই অস্ত্রটি পেয়েছেন। একমাত্র আমি ছাড়া এই ভয়ংকর অস্ত্র থেকে কোন মানুষ অথবা দেবতা আত্মরক্ষা করতে পারবে না। তবে ভগদত্ত এখন সেই অস্ত্র হারিয়েছে, এবার তুমি তাকে বধ করতে পারো।'

অর্জুন তখন নারাচ (লোহার তৈরী লম্বা বাণ) ছুঁড়ে ভগদত্তের ঐরাবতকে বধ করলেন। ভগদত্ত হাতির পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে

যেতেই অর্জুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দিয়ে ভগদত্তের হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করলেন, ভগদত্তের প্রাণহীন দেহ রক্ত স্রোতে ভাসতে লাগলো।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলে অর্জুন ক্লান্ত দেহে শিবিরে ফিরে গেলেন।

যুদ্ধের তেরো দিন ও অভিমন্যু বধ

রাত্রিতে শিবিরে বসে দুর্যোধন দুঃখ ও অভিমান ভরা কণ্ঠে দ্রোণাচার্যকে বললেন, 'আচার্য আপনিও কি পিতামহ ভীষ্মের মত পাণ্ডবদের জন্য স্নেহে অন্ধ হয়ে তাঁদের রক্ষা করে চলছেন? তা নইলে এত সুযোগ পেয়েও কেন যুধিষ্ঠিরকে ধরলেন না? অথচ আপনি তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন?'

দুর্যোধনের কথা শুনে দ্রোণ দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সব সময়ই আগ্রহী। কিন্তু স্বয়ং গোবিন্দ যাদের সহায় তাদের বন্দী করা কিংবা বধ করাকে এত সহজ ভাবছো কি করে? তবু বলছি, আগামীকালের যুদ্ধে পাণ্ডবদের একজন মহারথকে আমি হত্যা করবোই। তাছাড়া এমন এক ব্যূহ তৈরী করবো যা ভেদ করার শক্তি দেবতাদেরও নেই। তুমি শুধু অর্জুনকে যেভাবে হোক দূরে সরিয়ে রাখবে।'

পরদিন সংশপ্তকের বিরাট এক বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে আবার অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলে, অর্জুনও তাঁদের সঙ্গে

ঘোর যুদ্ধ শুরু করে দিলেন।

দ্রোণ 'চক্রব্যূহ' তৈরী করে তেজস্বী তরুণ কৌরব রাজপুত্রদের সেই ব্যূহের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করালেন। রাজপুত্রেরা রক্তলাল রেশমী পোষাক, ফুলের মালা, চন্দন ও অগরুর সুগন্ধে সেজে, হাতে রক্তলাল পতাকা নিয়ে অভিমন্যুর সাথে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলেন। দুর্যোধনের ছেলে কুমার লক্ষণ এই দশ হাজার সৈন্যের নেতা হয়ে চললেন। চক্রব্যূহে কৌরবসেনাদলের মাঝখানে দুর্যোধন, কর্ণ কৃপাচার্য, আর সামনে সেনাপতি দ্রোণাচার্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, শকুনি, শল্য, ভূরিশ্রবা এবং ধৃতরাষ্ট্রের ত্রিশজন ছেলে রইলেন।

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন এই যুদ্ধে অভিমন্যু বাসুদেবের যোগ্য ভাগনে এবং অর্জুনের মতই যোদ্ধা। একমাত্র অভিমন্যুই পারবেন দ্রোণের এই ভয়ংকর চক্র ব্যূহের মুখোমুখি হতে। এজন্য তিনি অভিমন্যুকে ডেকে বললেন, 'কুমার, তোমার বাবা এখন সংশপ্তকদের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত, কৃষ্ণও রয়েছেন তাঁর সাথে। এদিকে চক্রব্যূহ ভেদ করার নিয়ম তুমি, অর্জুন ও কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ জানে না। আমাদের অনুরোধ তুমি অর্জুনের যোগ্য ছেলে, আমাদের সকলের গৌরবের ধন, তুমিই চক্রব্যূহ ভেদ করে পাণ্ডবদলকে রক্ষা কর।'

অভিমন্যু যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে বললেন, 'জ্যেষ্ঠতাত (জ্যাঠা), আপনাকে অমান্য করার মত স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু আমার বাবা আমাকে শুধু ব্যূহভেদ করার কৌশলই শিখিয়েছেন, ব্যূহ থেকে বের হবার কৌশল এখনও শেখাননি। যদি কোন বিপদ হয় তাহলে আমি ব্যূহভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারবো না।'

যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে আদর করে বললেন, 'বাবা তুমি আমাদের কুলের প্রদীপ, তুমি ব্যূহ ভেদ করে আমাদের জন্য ঢোকার পথ করে

দাও, আমরা তোমার সঙ্গে ব্যূহে ঢুকে তোমাকে রক্ষা করবো।'

ভীম বললেন, 'বাবা অভিমন্যু, তোমাকে রক্ষা করার জন্য আমি, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন মরণপণ যুদ্ধ করে কৌরব মহারথদের বধ করবো।'

অভিমন্যু উত্তর দিলেন, 'আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। পতঙ্গ যেমন করে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আমিও তেমনি করে দ্রোণাচার্যের ভয়ংকর চক্রব্যূহ ভেদ করতে চলেছি। জগৎ আজ চেয়ে দেখবে অভিমন্যু বালক হলেও সে সব্যসাচীর যোগ্য সন্তান।'

অভিমন্যু গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর সারথিকে বললেন, 'সুমিত্র, তুমি চক্রব্যূহের দিকে রথ নিয়ে চলো।'

অভিমন্যুর এই জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দেবার প্রতিজ্ঞা সুমিত্র মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'ধীমান, যদিও পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ বীরেরা আপনার উপর এই গুরুভার দিয়েছেন, তবু বলি আপনি এখনও শিশু। দ্রোণের এই ভয়ংকর সেনাদলের ওপর আক্রমণ চালানোর মত বয়স কিংবা অভিজ্ঞতা এখনও আপনার হয়নি।'

অভিমন্যু সরল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে বললেন, 'প্রিয় সারথি, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে যুদ্ধ করতেও ভয় পাই না, পিতা অর্জুন ও মাতুল কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধেও পিছুপা হবো না। তুমি এগিয়ে চলো।'

অভিমন্যুর শিশু সুলভ কথায় অপ্রসন্ন ও চিন্তিত হয়েও সুমিত্র রথ নিয়ে যাত্রা করলেন, তাঁদের পেছনে চললেন পাণ্ডব মহারথীরা ও অসংখ্য সৈন্য।

দ্রোণের চোখের সামনেই তীব্র বেগে অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করে ভেতরে গেলেন এবং কুরুসৈন্য বধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি শরবর্ষণে অভিমন্যুকে প্রতিহত

করতে চেষ্টা করলেন। শল্যের ভাই অভিমন্যুর শরাঘাতে নিহত হলেন এবং শল্য মূর্ছিত হয়ে রথের ওপর পড়ে গেলেন, কৌরবসৈন্যরা প্রাণ ভয়ে পালাতে লাগলো।

দ্রোণাচার্য অভিমন্যুর আশ্চর্য রণকৌশল দেখে ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। এতে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে বললেন, 'দ্রোণাচার্য তাঁর প্রিয় শিষ্যের পুত্রকে দেখে মোহান্ধ হয়ে পড়েছেন, কুরুবীরগণ, আপনারাই ঐ মূঢ় বালককে বধ করুন।' দুঃশাসন লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আমিই ওকে হত্যা করবো।'

দুঃশাসনকে দেখে অভিমন্যু বললেন, 'দুরাত্মা, দ্যূতসভায় তোমার কুৎসিত আচরণ আমার পিতা ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা সহ্য করলেও আমার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই।' অভিমন্যুর শরাঘাতে দুঃশাসন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলে সারথি দ্রুত তাকে রণক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। অভিমন্যুর বীরত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে পাণ্ডব সৈন্যেরা সিংহের মত গর্জন করে দ্রোণ সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

অভিমন্যু এরপর কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন। কর্ণের এক ভাই অভিমন্যুর হাতে নিহত হলেন, কর্ণকেও আহত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে হলো। কৌরববীরেরা পালাতে শুরু করলেন, একমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ছাড়া আর কেউ রইলেন না। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করতে গিয়ে ভীমের হাতে যখন লাঞ্ছিত হন তখন মহাদেবের আরাধনা করে এই বর লাভ করেছিলন যে একমাত্র অর্জুন ছাড়া অন্য চারজন পাণ্ডবকে একবারের জন্য যুদ্ধে দমন করতে পারবেন। সেই বরের কল্যাণে জয়দ্রথ চক্রব্যূহের মুখ রোধ করে দাঁড়িয়ে পাণ্ডববীরদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সৃষ্টি করলেন। পাণ্ডব যোদ্ধারা কেউ চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে পারলেন না। অভিমন্যু একাই

ব্যূহের মধ্যে খ্যাপা সিংহের মত গর্জন করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর হাতে শল্যের পুত্র রুক্মরথ ও দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ নিহত হলেন।

প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধন চীৎকার করে মহারথীদের আদেশ দিলেন, 'এই ভয়ংকর বালককে আপনারা বধ করুন।' তখন দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বৃহদবল ও কৃতবর্মা এই ছয়জন প্রবীণ মহারথী তরুণ সূর্যের মত অভিমন্যুকে যেন রাহু হয়ে গ্রাস করতে এগিয়ে এলেন।

যুদ্ধে পরাজিত হতে হতেও দ্রোণাচার্য বারবার অভিমন্যুকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, 'ওকে যদি বধ করতে চাও তবে ওকে রথহীন ও ধনুহীন কর।'

দ্রোণের কথায় কর্ণ পিছন থেকে বালক বীরের ধনু ছিন্ন করলেন, রথের ঘোড়া ও সারথি বধ করলেন। তারপর দুর্যোধন, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শকুনি এই ছয়জন প্রবীণ রথী একসাথে মিলে তরুণ শমী বৃক্ষের মত কিশোর অভিমন্যুর ওপর বৃষ্টি ধারার মত শর বর্ষণ করতে লাগলেন। জয়দ্রথ চক্রব্যূহের মুখে দাঁড়িয়ে পাণ্ডবদের পথ বন্ধ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। একা, সম্পূর্ণ একা বালক অভিমন্যু সাত জন মহারথীর নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর ও অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে পাগলের মত লড়তে লাগলেন। হঠাৎ পেছন থেকে দুঃশাসনের ছেলে অভিমন্যুর মাথায় গদা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। শতশত বাণে বিদ্ধ অভিমন্যুর তরুণ শরীর মাটিতে আছড়ে পড়লো। সুভদ্রার নয়নমণি অভিমন্যুর প্রাণহীন দেহটি যেন এক অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ হয়ে রক্তের বন্যায় ভাসতে লাগলো।

হস্তিনাপুরের রাজসভায় বসে ধৃতরাষ্ট্রকে তেরো দিনের যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়ে সঞ্জয় মন্তব্য করলেন, 'মহারাজ, সপ্তরথী মিলে এক

অন্যায় যুদ্ধে বালক অভিমন্যুকে হত্যা করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবেরা এক কলংকময় ইতিহাসের সৃষ্টি করলেন।'

অভিমন্যুর শোকে পাণ্ডবেরা হাহাকার করতে লাগলেন। চির ধৈর্যশীল যুধিষ্ঠির মাটিতে পড়ে শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'হায়, আমি অর্জুনকে কি বলব। নিজের জয়লাভের লোভে আমি সুভদ্রার চোখের মণিকে মৃত্যুর অন্ধকার গুহায় পাঠিয়েছিলাম, সেই ছেলে হারা মার কাছে আমি কি জবাব দেব? আমি জয় চাই না, রাজ্য চাই না, এখন মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই চাই না।'

এমন সময় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ, এই শোক তোমাকে শোভা পায় না। বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু বীরের মৃত্যুবরণ করে এখন স্বর্গের সবচেয়ে গৌরবজনক আসনে পূর্ণিমার চাঁদের মত শোভা পাচ্ছেন, আমি নিজ চোখে তাকে দেখে এসেছি। তোমরা তাঁর জন্য গর্বিত হও।'

ব্যাসদেব যেমন আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন তেমনি আকস্মিকভাবেই অদৃশ্য হলেন।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, গোধূলীর আলোয় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ বিরতির পর শিবিরে ফিরে আসছেন। অর্জুনের বুকের ভেতর কিসের কান্না যেন উপছে পড়তে চাইছে। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, 'কেশব, আমার এমন লাগছে কেন? যুদ্ধে ভয়ংকর সংশপ্তকদের শেষ করেও কেন আমার মনে জয়ের আনন্দ হচ্ছে না? কেন নিজেকে এমন সর্বহারা বলে মনে হচ্ছে?'

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'অনেক সময় ভীষণ কোন যুদ্ধের পর এমন হতাশা আসে। তুমি মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করো পার্থ।'

নিজেদের শিবিরের কাছাকাছি এসে অর্জুন দেখলেন চারদিকে

অন্ধকার যেন মৃত্যুর মত খাঁ খাঁ করছে। তাঁর ভাইয়েরা অজ্ঞানের মত পড়ে রয়েছেন। এক মুহূর্তে অর্জুনের পিতার হৃদয় সব বুঝে ফেললো। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'আমার অভিমন্যু কোথায়! সে কি তবে দ্রোণের চক্রব্যূহে ঢুকে নিহত হয়েছে? আমি তাকে ব্যূহভেদ করতে শিখিয়ে ছিলাম, ব্যূহ থেকে বের হবার নিয়ম শেখাতে সময় পাইনি। সুভদ্রার চোখের মনি সেই ছেলে, যার মাথা ভরা রেশমের মত কোঁকড়া কালো চুল, অবুঝ হরিণ শিশুর মত সরল দু'টি চোখ, যে সব সময় হাসিমুখে গুরুজনের আদেশ পালন করে, বালক হয়েও যে বীর মহারথ তাকে হারিয়ে আমি বাঁচবো কেমন করে?'

যুধিষ্ঠির অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর বিশাল বুকে মাথা ঠুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ধর্মরাজ, আপনি বলুন, সেকি মৃত্যুর আগে আমাকে ডাকেনি? সেকি চীৎকার করে বলেনি, বাবা! তুমি আমাকে ব্যূহ থেকে বেরোবার পথ চিনিয়ে দাও!'

কৃষ্ণ অর্জুনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'প্রিয় সখা শান্ত হও। অভিমন্যু ক্ষত্রিয় বীরের সবচেয়ে বড় গৌরবের যে মৃত্যু তাই লাভ করেছে। এসো এখন আমরা ধর্মরাজের মুখে তার বীরত্বের বর্ণনা শুনে সান্ত্বনা লাভ করি।'

যুধিষ্ঠির চোখের জলে ভেসে অভিমন্যুর বীরত্ব ও কৌরব রথীদের অন্যায় যুদ্ধের কথা বললেন এবং একথাও বললেন, 'মহাদেবের কাছে পাওয়া শক্তির বলে জয়দ্রথ ব্যূহের মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের আটকিয়ে ছিলেন বলেই আমরা অভিমন্যুকে এতটুকুও সাহায্য করতে পারিনি।

শোকে অধীর অর্জুন থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দু'হাত তুলে

প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আগামীকাল সূর্যাস্তের আগে যদি আমি জয়দ্রথকে বধ করতে না পারি তাহলে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবো। স্বর্গমর্ত পাতালের কোন দেবতা, মানুষ অথবা দানব আমার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না।'

এই ঘোষণা শেষ করে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনুতে টংকার দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শংখে মহাপ্রলয়ের ধ্বনি করলেন, পাণ্ডবদের ভয়ংকর গর্জনে কৌরব শিবিরের যোদ্ধারা চমকে উঠলেন।

সুভদ্রার বিলাপ

পাণ্ডবদের সেই ভীষণ গর্জন এবং চরের মুখে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে জয়দ্রথ ভয়ে আতংকে কাতর হয়ে দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্যকে বললেন, 'আপনারা হয় আমাকে রক্ষা করুন না হয় আমি যুদ্ধ ছেড়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যাবো।'

দুর্যোধন দ্রোণ ও জয়দ্রথকে নানাভাবে বুঝিয়ে ও বল ভরসা দিয়ে শান্ত করলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'পার্থ তুমি আমার সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই এমন ভীষণ শপথ নিলে, জানি না এর পরিণাম কি হবে।'

অর্জুন বললেন, 'মাধব, তুমি জানো, সমস্ত কৌরবদলকে আমি একাই শেষ করে ফেলার শক্তি রাখি। আগামীকাল জগৎ দেখবে, আমার শরের আঘাতে জয়দ্রথের শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ধূলায় লুটাচ্ছে। এখন তুমি একবার সুভদ্রার কাছে যাও, তাঁকে এবং পুত্র বধূ উত্তরাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁদের শোক দূর কর।'

কিন্তু ছেলে হারা মা সুভদ্রা ও সদ্যবিধবা বধূ উত্তরাকে কি সান্ত্বনা দেবেন মাধব। তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে তাদের বুক ফাটা কান্না দেখলেন। দ্রৌপদীও অভিমন্যুর জন্য আকুল হয়ে কাঁদছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'পাঞ্চালী, তুমি বুদ্ধিমতী, অবুঝ না হয়ে সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দাও, বধূ উত্তরাকে বোঝাও, তাকে যত্ন কর। অভিমন্যু যে ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করে স্বর্গ লাভ করেছে একথা তাদের বুঝিয়ে বল। তুমি মধুরভাষিনী, তোমার কথায় তাদের শোকের আগুন কিছুটা শান্ত হবে।'

কৃষ্ণ যুদ্ধ শিবিরে ফিরে এসে কুশ তৃণ দিয়ে একটি বিছানা তৈরী করলেন এবং সেখানে শিব পূজার জন্য সবরকম আয়োজন করলেন ও অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণের উপদেশ মত অর্জুন গভীর রাতে মহাদেব শিবের পূজা করলেন।

মধ্যরাতে কৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি দারুককে ডেকে বললেন, 'আগামী কাল আমি এমন কাজ করবো যাতে সূর্য অস্ত যাবার আগেই অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করতে পারেন। পার্থের চেয়ে প্রিয় আমার কেউ নেই, তার জন্যই আমি কৌরবদের শেষ করবো। ভোর হবার সাথে সাথেই তুমি আমার রথে চারটি ঘোড়া লাগাবে এবং রথে আমার গদা, চক্র, ধনুর্বাণ, ছত্র ইত্যাদি রাখবে। পাঞ্চজন্য শংখের ধ্বনি শুনলেই তুমি আমার কাছে ছুটে আসবে।'

কুশের বিছানায় শুয়ে অর্জুন শিবমন্ত্র জপ করতে করতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, 'কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, 'পাশুপত অস্ত্রের সাহায্যে আগামীকাল তুমি অবশ্যই জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে।'

স্বপ্নের মধ্যে অর্জুন কৃষ্ণের হাত ধরে মহামন্দর পর্বতে শূলপাণি মহাদেবের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কৃপার পাশুপত অস্ত্রের ব্যবহার শিখে শিবিরে ফিরে এলেন।

পরদিন ভোরে পাণ্ডবেরা অর্জুনের স্বপ্নের কথা শুনে 'সাধু সাধু' বলে মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

জয়দ্রথ বধ

যুদ্ধের চৌদ্দদিন শুরু হলো। ভোরের সূর্য তার সোনালী আভা ছড়িয়ে দেবার আগেই দুই পক্ষের শিবিরে যোদ্ধারা নতুন উৎসাহে যুদ্ধ সাজে সেজে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন।

দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন, 'তুমি সবসময় আমার পেছনের ছয় ক্রোশ পথ দূরে থাকবে। আমাকে পরাজিত না করে অর্জুন তোমাকে ছুঁতেও পারবে না।'

হেমন্তের উজ্জ্বল রোদের আলোয় কুরুক্ষেত্র প্রান্তর ভরে ওঠার সাথে সাথে দ্রোণাচার্য চক্র শকট ব্যূহ, পদ্মব্যূহ ও সূচীব্যূহ নামে তিনটি ব্যূহ তৈরী করে জয়দ্রথকে সূচীব্যূহের একপাশে থাকতে বললেন।

অর্জুন দুঃশাসনের সৈন্য ধ্বংস করে তারপর দ্রোণের সামনে এলেন। দু'হাত জোড় করে দ্রোণকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন যেন জয়ী হই।' দ্রোণ করুণ হেসে বললেন, 'পার্থ তুমি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তুমি জয়ী হলে সে হবে আমারই

গৌরব। কিন্তু আমাকে পরাজিত না করে তুমি জয়দ্রথকে আক্রমণ করতে পারবে না।'

দ্রোণের সঙ্গে অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ চলছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'সব্যসাচী, বৃথা সময় নষ্ট না করে জয়দ্রথকে অন্য উপায়ে বধ করা দরকার।'

অর্জুনকে যুদ্ধ থামাতে দেখে দ্রোণ অবাক হয়ে বললেন, 'সব্যসাচী কি যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে গেছে?'

অর্জুন বললেন, 'প্রভু আপনি আমার গুরু, আপনাকে পরাজিত করবে এমন পুরুষ কেউ নেই।'

কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে রথ ছুটিয়ে দিলেন। তাঁদের বাধা দিতে এসে রাজা শ্রুতায়ুধ এবং কম্বোজের রাজপুত্রেরা নিহত হলেন। এরপর বহু হাজার যবন, পারদ, শক, দরদ, পুণ্ড্র প্রভৃতি ম্লেচ্ছ (অহিন্দু) সৈন্যরা অর্জুনের শরের মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। নিজেদের দলের এই অবস্থা দেখে দুর্যোধন দ্রোণকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'চমৎকার! গুরুদেব, আপনার বুকের ভেতর যে মধুমাখা ছুরি লুকানো রয়েছে সেই ছুরির আঘাতে আমরা মরছি, আর মধুর স্বাদ পাচ্ছেন অর্জুন!'

দ্রোণ বললেন, 'শোন রাজা, তুমি কি ভুলে যাও যে, আমি বৃদ্ধ, অর্জুনের শক্তির কাছে কত অক্ষম আমি! কিন্তু তুমি তো তরুণ, তুমি কেন যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করতে পারছো না? এই নাও আমার অভেদ্য কবচ।'

দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের দেহে নিজের মন্ত্রসিদ্ধ সোনার কবচ বেঁধে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, 'জয়ী হও, অর্জুনকে পরাজিত করার ক্ষমতা লাভ কর।'

এদিকে সূর্য অস্তাচলে চলেছে। তখনও কৃষ্ণার্জুন জয়দ্রথের দিকে চলেছেন। মাঝপথে দুর্যোধন এসে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর অর্জুন আন্দাজ করলেন দ্রোণাচার্য নিশ্চয়ই দুর্যোধনের গায়ে তাঁর অভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু সেই কবচ ছিঁড়ে ফেলার কৌশল অর্জুন ইন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছেন। সেই কৌশলে চোখের নিমেষে অর্জুন দুর্যোধনের রথ, ঘোড়া, সারথি সব ধ্বংস করলেন। দুর্যোধনের বিপদ দেখে ভূরিশ্রবা, কর্ণ, কৃপ, শল্য ইত্যাদি বীরেরা তাঁকে রক্ষা করার জন্য ছুটে এসে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। কৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য শংখে প্রচণ্ড ধ্বনি করলেন। তাই শুনে পাণ্ডবেরা অর্জুনকে সাহায্য করতে ছুটে এলেন। দুই পক্ষের বীরদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।

কর্ণ আর ভীমের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। কর্ণের শরাঘাতে ভীম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। কর্ণের মনে পড়লো কুন্তী দেবীর মিনতির কথা। তিনি ভীমকে হত্যা না করে অর্জুনের দিকে ছুটে গেলেন। এদিকে সাত্যকির হাতে রাজা ভূরিশ্রবা নিহত হলেন।

সূর্যাস্তের আর দেরী নই দেখে অর্জুন অস্থির হয়ে বললেন, 'বাসুদেব, তাড়াতাড়ি জয়দ্রথের কাছে চল, প্রতিজ্ঞা যেন রক্ষা করতে পারি।'

কিন্তু কৌরবেরা এমন ভাবে বাধা সৃষ্টি করলেন যাতে সূর্যাস্তের আগে অর্জুনের পক্ষে জয়দ্রথের কাছাকাছি হওয়া সম্ভব না হয়। দুর্যোধন বার বার এই বলে সকলকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, 'আর অল্পক্ষণ পরেই অর্জুনকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরতে হবে, তারপরই আসবে আমাদের জয়।'

হেমন্তের বেলা বড় ছোট। দেখতে দেখতে রোদের রং মুছে দিয়ে

সূর্য ডুবে যায়। কৃষ্ণ দেখলেন সূর্য খুব দ্রুত অস্তাচলে নেমে যাচ্ছেন। কিন্তু ছয়জন মহারথী জয়দ্রথকে এমন ভাবে আগলে রয়েছেন যে অর্জুন তাঁকে বধ করতে পারছেন না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'আমি মন্ত্রবলে সূর্যকে অন্ধকার করে দেবো। কৌরবেরা ভাববে সূর্য অস্ত গেছে, তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে যে জয়দ্রথের আর ভয় নেই। ঠিক সেই সুযোগে তুমি জয়দ্রথকে হত্যা করবে।'

অর্জুনের সখা বাসুদেব মন্ত্রবলে সূর্যকে অন্ধকারে ঢেকে দিলেন। সূর্য অস্ত গেছে ভেবে কৌরবেরা উল্লাসে ফেটে পড়লেন। জয়দ্রথ আনন্দে চীৎকার করে বললেন, 'অর্জুন তোমার জন্য চিতা সাজাও!' ঠিক তখুনি অর্জুন এক মন্ত্রসিদ্ধ ভীষণ বাণ ছুঁড়লেন। হিংস্র বাজ-পাখির মত সেই বাণ জয়দ্রথের মাথা ছিঁড়ে নিয়ে আকাশের দিকে ছুটে গেলো, আর তাঁর বিশাল শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কৌরবেরা এই দৃশ্যে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সূর্যের ওপর থেকে অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে নেবার সাথে সাথে পশ্চিম আকাশ বিদায়ী সূর্যের রাঙা আলোর বন্যায় ভেসে গেলো। ডুবে যাওয়া সূর্যকে আবার দেখতে পেয়ে কৌরবেরা ভয়ে শিউরে উঠে উপলব্ধি করলেন, শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রবলেই এমন হয়েছে। তাঁরা জয়দ্রথের জন্য হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন।

কৃষ্ণ ও অর্জুনের শংখধ্বনি শুনে যুধিষ্ঠির বুঝলেন জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন।

দুর্যোধন শোকে দুঃখে পাগলের মত হয়ে জয়দ্রথের মৃত্যুর জন্য দ্রোণকেই দোষী করে বলতে লাগলেন, 'এই ব্রাহ্মণ অর্জুনের স্বার্থেই জয়দ্রথকে রক্ষা করেননি।'

কিন্তু কর্ণ তাঁর ধর্মশক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যা বুঝেছেন সে কথাই দুর্যোধনকে বললেন, 'রাজা তুমি দ্রোণকে ভুল বুঝো না। জয়দ্রথের মৃত্যু আমাদের এই ভয়ংকর সত্যটিই বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে দৈবের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না। নিয়তি। নিয়তিই প্রবল, মানুষের ক্ষমতা কিছু না।'

দুর্যোধন কর্ণের কথায় চীৎকার করে উঠে বললেন, 'রাধেয় চুপ কর। তোমার এই দুর্বল বক্তব্য আমি মানি না।'

কর্ণ দুঃখিত হয়ে বললেন, 'মানলেই মনে শান্তি পাবে। দেখো, আমরা পাণ্ডবদের কতভাবে ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছি! তাঁদের জতু-গৃহে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছি, ভীমকে বিষ দিয়েছি, পাশাখেলার মিথ্যা চালে হারিয়ে বনবাসে দিয়েছি। কিন্তু দৈবের প্রভাবে, নিয়তির ইচ্ছায় সব বিফল হয়েছে। সৎ বা অসৎ যে কাজই হোক না তার ফলাফল দৈবের হাতে। মানুষের দেহ, বিবেক বুদ্ধি সব ঘুমিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু দৈব চিরকাল জেগে থেকে নিজের কাজ করে যায়।'

জয়দ্রথের মৃত্যুর পর রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো। তবু যুদ্ধ চলতে লাগলো। অশ্বত্থামার সাথে ঘটোৎকচের যুদ্ধের সময় ঘটোৎ-কচের ছেলে অঞ্জনপর্বা নিহত হলো। সেই রাত্রে তারাভরা আকাশের নীচে মশালের রক্তলাল আলোয় দুর্যোধনদের সাথে পঞ্চ পাণ্ডবদের যে ভীষণ যুদ্ধ হলো তাতে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে রক্তের বন্যা বয়ে গেলো, হাজার হাজার সৈনিকের লাশের পাহাড় জমে গেলো।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে কর্ণের শরবর্ষণে পাণ্ডবসৈন্যরা প্রাণের ভয়ে চীৎকার করে অর্জুনকে ডাকতে লাগলো। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, 'কেশব আমি আমার সন্তানের মত প্রিয় সৈন্যদের বিপদে স্থির থাকতে পারছি না। তুমি অনুমতি দাও হয় আমি কর্ণকে বধ করি

না হয় তার হাতে মরি।'

কৃষ্ণ বললেন, 'ধনঞ্জয় অধীর হয়ো না। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমি অথবা ঘটোৎকচই পারো কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করতে। কিন্তু কর্ণকে বধ করার সময় এখনও তোমার জন্য আসেনি। আমি ঘটোৎ-কচকে নির্দেশ দিচ্ছি, সে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করুক।

কৃষ্ণ স্মরণ করা মাত্রই ঘটোৎকচ উপস্থিত হলেন। এই তরুণ রাক্ষসের বিশাল শরীর, রক্তবর্ণ চোখ, কটা রং চুল ও গোঁফ, বিরাট মুখ, বিকট দাঁত, মাথার ওপর কটা চুলের মস্ত এক চূড়া। তাঁর মেঘ কালো শরীরে ঝকঝকে কাঁসার বর্ম, মাথায় বরফের চূড়ার মত রূপার মুকুট, কানে বড় বড় সোনার কুণ্ডল। ঘটোৎকচের বিরাট রথটি ভালুকের চামড়া দিয়ে মোড়া, রথের ধ্বজের ওপর এক ভীষণ চেহা-রার শকুন বসে।

ঘটোৎকচ কৃষ্ণকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু, আদেশ করুন, কি আমাকে করতে হবে?'

কৃষ্ণ হাসিমুখে বললেন, 'রাক্ষস বীর, পঞ্চপাণ্ডবকে এই ভীষণ বিপদ থেকে একমাত্র তুমিই রক্ষা করতে পারো।'

ঘটোৎকচ লজ্জায় মাথা নীচু করে বললেন, 'আমি আপনার ও তাঁদের দাস। আমাকে আপনারা যা আদেশ করবেন তাই করবো।'

অর্জুন বললেন, 'তুমি কর্ণের সাথে দ্বৈরথ (যে যুদ্ধে দু'জনেই রথ নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধ করে) যুদ্ধ করে তাঁকে বধ কর, সাত্যকি তোমাকে সাহায্য করবেন।'

ঘটোৎকচ অর্জুনকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু, কর্ণকে আমি একাই বধ করতে পারবো। আদেশ করুন, রাক্ষস যুদ্ধের নিয়ম অনু-সারে কৌরবদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলি।'

ঘটোৎকচের সাথে যুদ্ধ করতে করতে কর্ণ বুঝলেন এই তরুণ রাক্ষসের মত যোদ্ধা তিনি এর আগে দেখেননি ; হয়তো বা এ অর্জুনের সমান বীর।

ঘটোৎকচের শতঘ্নী বাণের আঘাতে কর্ণের রথের চারটি ঘোড়া নিহত হলো, কৌরব সেনারা রাক্ষসের ভয়ংকর তেজে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণভয়ে পালাতে লাগলো। কর্ণ দেখলেন এই ভয়াল রাক্ষসের হাতেই আজ সব শেষ হবে। তিনি তখন নিজের কবচকুণ্ডলের বদলে ইন্দ্রের কাছ থেকে যে শক্তি অস্ত্র পেয়েছিলেন এবং অর্জুনকে বধ করার জন্য সযত্নে রেখেছিলেন, সেই মৃত্যুর জিভের মত লকলকে শক্তি অস্ত্র দিয়ে ঘটোৎকচের ওপর আঘাত হানলেন। বিশাল পর্বতের মত ঘটোৎকচের দেহটি মাটিতে আছড়ে পড়লো এবং তাঁর দেহের চাপে বহু কৌরবসেনা পিষে মারা গেলো।

কৌরবেরা আনন্দে বাদ্যবাজনা সহকারে কর্ণকে পূজা দিলেন। ওদিকে ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডব শিবিরে হাহাকার পড়ে গেলো। ভীমসেন খ্যাপা হাতির মত গর্জন করে, বুক চাপড়ে শোকের ঝড় বইয়ে দিলেন।

যুধিষ্ঠিরের চোখে পড়লো ঘটোৎকচের মৃত্যুতে কৃষ্ণের এতটুকুও দুঃখ নেই। তিনি রথের ওপর দাঁড়িয়ে হাসছেন।

যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে বললেন, 'বাসুদেব, তোমার রহস্য আমি বুঝি না। ঘটোৎকচের মৃত্যু কি তোমাকে একটুখানিও দুঃখ দেয়নি? আমাদের বনবাসের দিনগুলোতে বালক হলেও সে ছিলো আমাদের অভিভাবক, যখন দ্রৌপদী পথ চলতে পারতেন না, ঘটোৎকচ তাঁকে ছোট মেয়ের মত করে কোলে তুলে নিয়ে যেতো। আমরা সবাই বেঁচে থাকতে তরুণ ঘটোৎকচকে কেন এভাবে মরতে হলো?'

কৃষ্ণ বললেন, 'ধর্মপুত্র, আপনি জ্ঞানী, আপনাকে বেশী বলা দরকার হয় না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, কর্ণ যে শক্তি অস্ত্র দিয়ে ঘটোৎকচকে বধ করেছেন, সেই শক্তি অস্ত্র তিনি ইন্দ্রের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং এতকাল ধরে অর্জুনকে বধ করার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। ঘটোৎকচ নিজের জীবন দিয়ে অর্জুনকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন বলেই আমার এই আনন্দ।'

হঠাৎ সেখানে ব্যাসদেব উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আর পাঁচদিন পর এই যুদ্ধ শেষ হবে। মনে রেখো, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়।'

ব্যাস অদৃশ্য হয়ে যাবার পর যুধিষ্ঠির নিজের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন।

সেই ভয়াল রাতের দ্বিতীয় প্রহরে সৈন্যরা ক্লান্তি আর ঘুম দিশেহারা হয়ে পড়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিশৃংখলা শুরু হয়ে গেলো। তখন অর্জুন চীৎকার করে ঘোষণা করলেন, 'সৈন্যরা, তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রেই কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নাও। মাঝরাত্রে চাঁদ উঠলে আবার যুদ্ধ হবে।'

অর্জুনের ঘোষণা শুনে কৌরব সেনাপতিরাও তাঁদের সৈন্যদের বিশ্রাম করতে আদেশ দিলেন।

সেই রক্ত কাদায় ভরা রণক্ষেত্রে সৈন্যরা ক্লান্ত শরীর বিছিয়ে দিতে না দিতেই ঘুম যেন মায়ের মত এসে তাদের কোলে তুলে নিলো। হেমন্তের পাতলা কুয়াশা তাদের ঘুমন্ত শরীরে চাদরের মত বিছিয়ে রইলো।

মধ্যরাতের আকাশে নববধূর মত লাজুক হাসি মুখে নিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠে এলো, মায়াবী আলোয় ভরে গেলো পৃথিবী। সেনাপতিদের শংখধ্বনিতে ঘুমন্ত সৈনিকেরা চমকে উঠলো। তাদের ঘুম-

ভাঙ্গা চোখে তখনও তন্দ্রার আমেজ লেগে রয়েছে। হয়তো বা তারা স্বপ্নের ডানায় ভর দিয়ে তাদের ভালোবাসায় ভরা সংসারে ফিরে গিয়েছিলো, আদরের সন্তানদের, মমতাময়ী স্ত্রীকে কাছে পেয়েছিলো। কিন্তু হায়! যুদ্ধ পাগল প্রলয় শংখ আবার তাদের ডাকছে।

আবার যুদ্ধ শুরু হলো। বিরাট ও দ্রুপদ একসাথে দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। চাঁদের আলো ম্লান হয়ে এলো, পুব আকাশে দপ্‌দপ্‌ করে শুকতারা জ্বলছে। দ্রোণের ভল্লের আঘাতে দ্রুপদ ও বিরাট নিহত হলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার শোকে হাহাকার করতে লাগলেন। ভীম ভীষণ রাগে দ্রোণকে আক্রমণ করতে ছুটলেন।

যুদ্ধের পনেরো দিন

কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যোদয় হলো। যোদ্ধারা সূর্যের স্তব করে নতুন তেজে যুদ্ধ শুরু করলেন।

প্রভাতের সোনালী আলোয় দুর্যোধন তাঁর শৈশবের খেলার সাথী সাত্যকিকে দেখে হঠাৎ কেন যেন বুকের ভেতর ব্যথা অনুভব করলেন। করুণ হেসে বললেন, 'সখা, আমাদের সেই অবুঝ শৈশবের স্বপ্নমাখা দিনগুলোর সবই কি এই যুদ্ধক্ষেত্রের রক্ত পিপাসায় হারিয়ে গেছে? লোভ, ক্রোধ, ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব আর পৌরুষকে ধিক্! সাত্যকি! কেন এই যুদ্ধ? এই যুদ্ধ আমাদের কি দেবে বলতে পারো?'

সাত্যকি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দুর্যোধনের দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'রাজপুত্র, আমাদের সেই সবুজ খেলার মাঠ, গুরুর আশ্রম, বন্ধুত্বের মধুর স্মৃতি সব হারিয়ে গেছে। আমাদের অতীতের স্মৃতি নেই, ভবিষ্যতের স্বপ্ন নেই, যা আছে তা এই মরণপণ যুদ্ধ। সখা, এসো আমরা যুদ্ধে নিহত হয়ে মরণের পর আবার কাছাকাছি আসি।'

মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধের প্রভাত দুই বাল্য সখার হিংস্র গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। একটু আগে দুর্যোধনের হৃদয়ে যে আবেগ জেগে উঠেছিলো তা রক্তের তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেলো, সাত্যকির হৃদয়ের পট থেকে শৈশবের সেই খেলার আনন্দ, গুরুগৃহের পাঠ আর পূজার ফুল তোলার স্মৃতি মুছে গিয়ে ধু-ধু মরুভূমি হয়ে উঠলো।

দ্রোণের মৃত্যু

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'ধনঞ্জয়, যতক্ষণ দ্রোণের হাতে ধনুর্বাণ আছে ততক্ষণ তাঁর পরাজয় নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু অস্ত্র ফেলে দিলে তিনি যে কোন বীরের হাতেই মরতে পারেন।'

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ইঙ্গিতে কি বলতে চাইছো কেশব?'

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'পার্থ, তোমরা পাঁচ ভাই বীরত্বে ও বুদ্ধিতে তুলনাহীন। কিন্তু প্রয়োজনে কুটকৌশলের আশ্রয় নেবার কথা কখনই ভাবো না। এখনও যদি তোমরা ধর্মের দিকেই চোখ রাখো তাহলে

এই যুদ্ধে দ্রোণের হাতেই তোমাদের শেষ হতে হবে। আমার উপদেশ, মন থেকে সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে তোমরা ঘোষণা করে দাও যে যুদ্ধে দ্রোণের ছেলে অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন। ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেলে বৃদ্ধ সেনাপতি নিশ্চয়ই শোকে পাগল হয়ে অস্ত্র ফেলে দেবেন।'

কৃষ্ণের এই উপদেশ শুনে অর্জুনের সারা শরীরে কাঁটা দিলো। অথচ কৃষ্ণের মুখে হাসির রেখা যেন চাঁদের আলোর মত খেলা করছে। অর্জুন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সকলেই কৃষ্ণের এই উপদেশকে মেনে নিচ্ছে। এমন কি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পর্যন্ত কোন আপত্তি করছেন না।

সকলে মিলে এক বুদ্ধি বের করলেন যাতে দ্রোণকে বিভ্রান্ত করা যায়।

মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে এক হাতি ছিলো। ভীমসেন গদার আঘাতে সেই হাতিকে মেরে ফেললেন এবং দ্রোণের সামনে গিয়ে খুবই দুঃখিত ভাবে মাথা নীচু করে বললেন, 'আচার্য, অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে।'

একটু ক্ষণের জন্য দ্রোণের নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ছেলের বীরত্বের কথা মনে করে ভীমকে অবিশ্বাস করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সাথে শরযুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ধৃষ্ট-দ্যুম্নের রথ ও অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট হল। ভীম দ্রুত তাঁকে নিজের রথে তুলে নিয়ে বললেন, 'ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার হাতেই আচার্যের মৃত্যু হবে, এই তাঁর নিয়তির লিখন, অতএব তাড়াতাড়ি তাঁকে বধ কর।'

ভীমকে ধৃষ্টদ্যুম্নের সাথে মিলিত হতে দেখে দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তাতে চোখের নিমেষে তিরিশ হাজার

সৈন্য দশ হাজার হাতি ও দশ হাজার ঘোড়া বিনষ্ট হলো। এই সময়ে মহাঋষি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও অগ্নিদেব দ্রোণের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'দ্রোণাচার্য, তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে এই অধর্ম যুদ্ধ করছ ? যারা ব্রহ্মাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তাদের ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে হত্যা করছ, এতে বোঝা যায় তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত, এই পাপ কাজ থেকে তুমি বিরত হও এবং অস্ত্র ত্যাগ কর।'

ঋষিরা অন্তর্হিত হবার পর অস্ত্রহীন দ্রোণ বিষণ্ণ মনে যুধিষ্ঠিরের কাছে জানতে চাইলেন অশ্বত্থামা সত্যিই হত হয়েছেন কিনা। কারণ দ্রোণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যের জন্য হলেও যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলবেন না।

যুধিষ্ঠিরকে দ্বিধান্বিত দেখে কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'ধর্মপুত্র, দ্রোণ যদি আর অর্ধেক দিন যুদ্ধ করেন তাহলে পাণ্ডববাহিনীর আর একটি সৈন্যও জীবিত থাকবে না। আমাদের রক্ষার জন্যই আপনাকে মিথ্যা বলতে হবে, জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না।'

ভীম এবং অন্যান্যেরাও যুধিষ্ঠিরকে একই কথা বলে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের তখন অসত্য ভাষণের ভয়ের চাইতে জয়লাভের আগ্রহই প্রবল হলো। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'অশ্বত্থামা হতঃ'—(অশ্বত্থামা হত হয়েছেন), তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, 'ইতি কুঞ্জরঃ'—(এই নামের হস্তী)।

যুধিষ্ঠিরের রথ চিরকাল মাটি থেকে চার আঙ্গুল ওপরে থাকতো, এখন মিথ্যা বলার পাপে তাঁর সমস্ত বাহন ভূমিতে নেমে গেলো। অশ্বত্থামা সে সময়ে কয়েক যোজন দূরে শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি জানতেও পারলেন না তাঁর প্রতি স্নেহের সুযোগ নিয়ে পাণ্ডবেরা কি ভয়ানক অন্যায় কাজ করলেন।

মহর্ষিদের তিরস্কার শুনে দ্রোণ নিজেকে অপরাধী ভেবে দুঃখ পেয়েছিলেন, তার ওপর পুত্রের মৃত্যুসংবাদে এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে সামনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখেও তিনি অস্ত্র তুলতে পারলেন না। অথচ তিনি জানতেন, রাজা দ্রুপদ দ্রোণকে হত্যা করার জন্যই যজ্ঞের প্রজ্বলিত আগুন থেকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে লাভ করেছিলেন।

ভীম দ্রোণের কাছে গিয়ে ধীর অথচ তিক্ত ভাষায় বললেন, 'ব্রাহ্মণ হয়ে অব্রাহ্মণের হীন কাজ বহু করেছেন, আর কেন? কার আশায় এখনও জীবিত রয়েছেন? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা কি আপনার বিশ্বাস হয়নি? দয়া করে পুত্রের মৃতদেহ অনুসন্ধান করে সৎকারের ব্যবস্থা করুন।'

দ্রোণ, দুর্যোধন, কর্ণ ও কৃপকে ডেকে বললেন, 'আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম, তোমরা যথাশক্তি যুদ্ধ কর।'

বৃদ্ধ আচার্য দ্রোণ উচ্চকণ্ঠে অশ্বত্থামাকে ডেকে হাহাকার করে উঠলেন। তবে মাত্র একবার। এরপর সমস্ত অস্ত্র রথের ওপর রেখে যোগাসনে বসে সব প্রাণীর কল্যাণ কামনা করলেন এবং মুদিত চোখে পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। সহসা তাঁর দেহ থেকে এক দিব্য জ্যোতি বের হয়ে উল্কার মত আকাশে মিলিয়ে গেলো। দ্রোণের এই মহা মৃত্যুর দৃশ্য কেবল পাঁচজন দেখতে পেলেন—তাঁরা হলেন কৃষ্ণ, কৃপ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও সঞ্জয়।

দ্রোণকে মূর্তির মত বসে থাকতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ হাতে তার দিকে এগোতে গেলে অর্জুন চীৎকার করে বললেন, 'দ্রুপদ নন্দন, তুমি আচার্যের দেহে অস্ত্রাঘাত কোর না।'

ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর কথায় কান না দিয়ে প্রাণহীন দ্রোণের কাশফুলের মত সাদা চুলের গোছা ধরে উঁচুতে তুলে খড়্গ দিয়ে তাঁর মাথা দেহ

থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। তারপর সেই বীরশ্রেষ্ঠের কাটা মাথা কৌরব-সৈন্যদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আকাশ ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর কুরুসৈন্যরা ভয়ে আতংকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে চলে গেলো। কুরুপক্ষেরা রাজারা বহু মৃতদেহের মধ্যে থেকে দ্রোণের কবন্ধ (মস্তকহীন লাশ) খুঁজে খুঁজে হতাশ হলেন। সেই শোকের পাথারে ভীম রক্ত আর মৃতদেহের মধ্যে তাল ঠুকে ঠুকে নাচতে লাগলেন। তাঁর বিকট আনন্দ দেখে যুধিষ্ঠির লজ্জায় মাথা নীচু করলেন, গুরু-দেবের শোকে অর্জুন নীরবে চোখের জল ঝরাতে লাগলেন। প্রকাশ্যে শোক প্রকাশ করাকেও যেন তাঁর লজ্জাকর বলে মনে হলো।

অশ্বত্থামার সংকল্প

দুর্যোধনের কাছে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর বিবরণ শুনে অশ্বত্থামা শোকে এবং রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন, তাঁর দু'চোখ থেকে অঝোরে জল ঝরতে লাগলো। কান্নার মধ্যেই তিনি ভীষণ চীৎকার করে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমার অস্ত্রহীন বৃদ্ধ বাবাকে পাণ্ডবেরা কাপু-রুষের মত হত্যা করেছে, ধর্মের মুখোসপরা যুধিষ্ঠির যে পাপের কাজ করেছে তার প্রতিশোধ আমি নেবই। ঋষির মত পবিত্র অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের মৃতদেহকে অপমান করেছে নীচ ধৃষ্টদ্যুম্ন। তার এবং যুধিষ্ঠিরের রক্তে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে আজ আমি বন্যা বইয়ে দেবো।'

এরপর অশ্বত্থামা কৌরবরাজাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমার বাবা নারায়ণের কাছ থেকে যে অস্ত্র পেয়েছিলেন আমাকে তার ব্যবহার

শিখিয়ে দিয়েছেন। অস্ত্র দান করার সময় নারায়ণ পিতাকে বলেছিলেন, শত্রু যতক্ষণ পর্যন্ত নিহত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অস্ত্র সামনে যে অস্ত্রধারীকে পাবে তাকেই বধ করবে। আজ আমি এই অস্ত্র দিয়ে গুরুহত্যাকারী পঞ্চপাণ্ডব ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করবো।'

অশ্বত্থামার কথা শুনে কৌরবসৈন্যেরা জয়ধ্বনি করে উঠলো। শিবিরে শিবিরে শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজতে লাগলো। অশ্বত্থামা স্নান ও পূজা করে নারায়ণ অস্ত্র বের করলেন। ঠিক তখুনি প্রকৃতি হঠাৎ করে অশান্ত হয়ে উঠলো। ধূলোয় ঝড় বইতে লাগলো, ভূমিকম্পে পৃথিবী কেঁপে উঠলো, সূর্যের আলো ধুলোয় ঢেকে গেলো।

কৌরব শিবিরে তুমুল শব্দ ও প্রকৃতিতে অশুভ লক্ষণ দেখে যুধিষ্ঠির বললেন, 'দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন, এখন তো কৌরবদের শোকে ভেঙ্গে পড়ার কথা, তারা এমন গর্জন করছে কেন?'

অর্জুন বললেন, 'দ্রোণের সুযোগ্য ছেলে অশ্বত্থামা কৌরবদের জাগিয়ে তুলেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার দেবতার মত গুরুর পবিত্র চুলের গোছা টেনে ধরে অপমান করেছেন, তাঁকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহকে লাঞ্ছিত করেছেন। আমি জানি অশ্বত্থামা তা কখনই ক্ষমা করবেন না। ধর্মরাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়েও শুধুমাত্র রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যাচারের মত মহাপাপ করলেন। আপনার এই কলংক আপনার ফুলের মত চরিত্রে চিরদিন কালি হয়ে থাকবে। আমি ভাবতে পারি না কি করে আপনি অস্ত্রহীন ব্রাহ্মণগুরুকে হত্যা করালেন!'

যুধিষ্ঠির মাথা নীচু করে বললেন, 'ফালগুনি, আমি যা করেছি তা সবার স্বার্থেই করেছি।'

অর্জুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হায়রে স্বার্থ। রাজা, আমাদের জীবনের বহু বছর কেটে গেছে, আমরা এখন প্রৌঢ় অথচ শুধুমাত্র

রাজ্যলাভের জন্য আমরা পিতার মত গুরুকে হত্যা করলাম, আপনি মিথ্যাবাদী হলেন। আমাদের এত পাপ বিধাতা কখনও ক্ষমা করবেন না।'

ভীম হঠাৎ ভীষণ রেগে উঠে বললেন, 'ফালগুনি! তোমার ঐ ধর্মকথা থামাও, আমার অসহ্য লাগছে। কৌরবেরা যখন অধর্ম করে আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলো, আমাদের বনবাসে দিয়েছিলো, কৃষ্ণাকে প্রকাশ্য সভায় চুল টেনে ধরে চরম অপমান করেছিলো তখন কোথায় ছিলো দ্রোণাচার্যের তেজ আর বিবেক? কই! সেদিন তো তিনি আমাদের বলেননি, চলো আমরা দুর্যোধনদের যুদ্ধে পরাজিত করি, তিনি তো দুর্যোধনদের অধর্মের প্রতিবাদ করে রাজসুখ ছেড়ে আমাদের সাথে বনেও যেতে পারতেন। ঠিক আছে, তুমি মুনি ঋষিদের মত ধর্ম নিয়ে থাকো। আমি ক্ষত্রিয়ের ছেলে, অশ্বত্থামাকে গদার আঘাতে আমিই শেষ করবো।'

ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, 'দ্রোণকে হত্যা করার জন্যই যজ্ঞের আগুন থেকে আমার জন্ম। তিনি যে আমার হাতে নিহত হয়েছেন এতো তাঁর নিয়তি। এখানে আমার অপরাধ কোথায়? আমি যদি গুরুদ্রোহী হই তাহলে দ্রোণও শিষ্যদ্রোহী। আর অর্জুন, তুমি যে ভীষ্মকে বধ করেছো তাতে অন্যায় হয়নি?' ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা শুনে অর্জুন ধিক্কার দিয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ লজ্জায় চোখ নীচু করলেন। সাত্যকি ভীষণ রেগে বললেন—'ধৃষ্টদ্যুম্ন তুমি এত নির্লজ্জ! ভীষ্ম নিজেই অর্জুনের হাতে মৃত্যু কামনা করে অর্জুনকে নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিয়েছিলেন বলেই শিখণ্ডীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো ভীষ্মকে বধ করা। মূর্খ, আর যদি গুরু হত্যার স্বপক্ষে একটা কথাও বলো তাহলে আমিই তোমাকে হত্যা করবো।'

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির মধ্যে সংঘর্ষ হবার উপক্রম হলে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তাঁদের অনেক কষ্টে শান্ত করলেন।

যুদ্ধের পনেরো দিনের বিকেলে অশ্বত্থামা মূর্তিমান যমের মত পাণ্ডবসৈন্যদের আক্রমণ করলেন। তাঁর নারায়ণ অস্ত্র থেকে হাজার হাজার আগুনের সাপের মত বাণ, শতফলার জ্বলন্ত শূল, গদা, আগুনের চক্র ইত্যাদি ছুটে বেরিয়ে পাণ্ডবসৈন্যদের শুকনো পাতার মত পুড়িয়ে ছাই করতে লাগলো।

সৈন্যরা ভয়ে পালাচ্ছে অথবা কীটের মত মরছে দেখেও অর্জুন উদাসীন রয়েছেন, এতে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে বললেন, তোমরা নিজের নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যাও। কৃষ্ণ তাঁর নিজের কর্তব্য ঠিক করুন। আমি সমস্ত সৈন্যদের যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিয়ে আগুনের চিতায় আত্মাহুতি দেবো। ভীষ্ম এবং দ্রোণের মত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত যদি অশ্বত্থামার মত ডোবার জলে ডুবে মরতে হয় তার চেয়ে আত্মহত্যা করাই সম্মান-জনক। আমার ধর্মপ্রাণ ভাই অর্জুন বোধহয় ভুলে গেছেন তাঁর পরম গুরু দ্রোণাচার্যই তাঁর ছেলে অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করিয়েছেন। তবু তাঁর সেই পরম প্রিয় গুরুর জন্যই আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।'

কৃষ্ণ হঠাৎ ঝড়ের বেগে সৈন্যদলের মধ্যে ঢুকে হাত তুলে ঘোষণা করলেন, 'তোমরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে, রথ, হাতী ও ঘোড়া থেকে মাটিতে নেমে পড়ো। নারায়ণ অস্ত্র থেকে রক্ষা পাবার এটাই একমাত্র উপায়।'

ভীম রথ নিয়ে অশ্বত্থামার দিকে ছুটছেন দেখে কৃষ্ণ ও অর্জুন রথ থেকে নেমে তাকে থামালেন এবং নারায়ণ অস্ত্রের ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিলেন। হঠাৎ করে যুদ্ধ বন্ধ করতে হলো দেখে ভীম

রাগে দাপাদাপি করতে লাগলেন।

পাণ্ডবসৈন্যরা অস্ত্র ফেলে দেবার পর নারায়ণ অস্ত্র শান্ত হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর সেনাপতির নির্দেশে আবার তারা যুদ্ধে নেমেছে দেখে দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে আবার তাঁর নারায়ণ অস্ত্র চালাতে বললেন। কিন্তু অশ্বত্থামা করুণ হেসে বললেন, 'রাজা, এই অস্ত্র দ্বিতীয়বার ব্যবহার করলে যে ব্যবহার করবে অস্ত্র তাকেই বধ করবে। আমার বিশ্বাস কৃষ্ণ নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের নারায়ণ অস্ত্র থামাবার উপায় বলে দিয়েছেন, তা নইলে আজই হতো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দিন।

এই সময় হঠাৎ ঘন নীল একখণ্ড মেঘের মত ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হলেন। অশ্বত্থামা তাঁকে দেখে কাতর হয়ে বললেন, 'প্রভু, আমার নারায়ণ অস্ত্র কেন এমন করে বিফল হলো? কৃষ্ণ কি করে এই অস্ত্র থামাবার উপায় জানলেন? অর্জুনইবা কেন রক্ষা পেলেন?'

ব্যাসদেব বললেন, 'অশ্বত্থামা, তুমি জানো না কৃষ্ণই যে স্বয়ং নারায়ণ, আর অর্জুনও নর নারায়ণের অংশ নিয়ে জন্মেছেন! অশ্বত্থামা তুমিও সাধারণ মানুষ নও। রুদ্রশিবের অংশ থেকে তোমার জন্ম হয়েছে।'

ব্যাসের কথা শুনে অশ্বত্থামা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। ব্যাস তাঁকে আশীর্বাদ করে সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় মিলিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হবার পর ক্লান্ত সৈনিকেরা নিজেদের শিবিরে ফিরতে লাগলো। অর্জুন নিজের শিবিরে বসে দ্রোণাচার্যের নানা স্মৃতি চিন্তা করে দুঃখে বেদনায় মুষড়ে পড়ছিলেন, ঠিক তখুনি চোখের সামনে ব্যাসদেবকে দেখে তাঁর বুকের ভেতরটা যেন শান্তির সুধায় ভরে গেলো।

অর্জুন দু'হাত জোড় করে ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করলেন, 'মহামুনি,

আমি যুদ্ধ করার সময় একজন জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখতে পাই, হাতে আগুনের শিখার মত শূল, আমি যখন যুদ্ধ করি তখন তাঁর শূল থেকে হাজার হাজার আগুনের শূল ছুটে গিয়ে শত্রুদের করে। অথচ তিনি নিজে কখনও শূল ছোঁড়েন না। এই সূর্যের উজ্জ্বল পুরুষকে আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না, আপনি ইনি কে?'

ব্যাসদেব বললেন, 'পার্থ তুমি মহাদেবকে দেখতে পাও। তি শিব, শংকর, রুদ্র, পশুপতি, ধূর্জটি, মহেশ্বর, পিনাকি, শম্ভু, স্ব ভূতনাথ। এত তাঁর নাম, এত তাঁর রূপ। অর্জুন, জয়দ্রথকে বধ আগে কৃষ্ণের সাহায্যে তুমি তাঁকেই স্বপ্নে দেখেছিলে। যাও কৌ যুদ্ধ কর। তোমার জয় হবেই। স্বয়ং কৃষ্ণ তোমার রক্ষা তোমার চিন্তা কি।'

কর্ণ পর্ব

কর্ণের সেনাপতিত্বে অভিষেক

সন্ধ্যার সময় দুর্যোধন নিজের শিবিরে রেশম কোমল বিছানায় বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর পক্ষের বীর যোদ্ধারাও সেখানে নানা কথাবার্তা বলছিলেন। দুর্যোধন তাঁদের প্রশ্ন করলেন, 'দ্রোণের মৃত্যুর পর আমাদের সেনাপতি কে হবেন আপনারাই বলুন?'

অশ্বত্থামা বললেন, 'রাজা, আমাদের মধ্যে মহাবীর কর্ণই সেনাপতি হবার যোগ্য পুরুষ।'

অশ্বত্থামার এই মতকে সবাই আনন্দের সাথে সমর্থন করলেন দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, 'মহাবাহু, তোমার ইচ্ছাতেই আমি ভীষ্ম ও দ্রোণকে সেনাপতির পদ দিয়েছিলাম। মহাবীর হলেও তাঁরা ছিলেন বৃদ্ধ এবং অর্জুনের জন্য স্নেহে অন্ধ। এখন তুমিই পারো অর্জুনকে পরাজিত ও বধ করতে।'

সেই হেমন্তের সন্ধ্যায় দুর্যোধন ও অন্যান্য রাজারা কর্ণকে তামার আসনে বসিয়ে শাস্ত্রমতে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করলেন। তাঁ

সামনে বহু মণিমুক্তা, হাতির দাঁতের কাজ করা সোনার পাত্রে নানা উপহার, প্রদীপ ও ফুল রাখা হলো। ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করলেন, বন্দিরা (যারা বন্দনা গীতি গায়) গান গেয়ে কর্ণের প্রশংসা করতে লাগলো।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ষোল দিন

সূর্য ওঠার সাথে সাথে কর্ণের শংখধ্বনিতে কৌরব সেনাবাহিনী নতুন উদ্যম নিয়ে যুদ্ধে নামলো। কর্ণ তাঁর সাদা পতাকায় সাজানো রাজ-হাঁসের মত সাদা ঘোড়ার রথে উঠলেন। চারটি তেজী ঘোড়া রথকে নিয়ে সগর্বে ছুটে চললো।

কর্ণকে সেনাপতি হিসাবে রথে ছুটতে দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, 'ফালগুণী দেখেছো, কৌরবদলের শ্রেষ্ঠ বীরেরা শেষ হয়ে গেছেন, কেবল নিকৃষ্ট যোদ্ধারা রয়েছে। এখন সূতপুত্র কর্ণই তাদের একমাত্র আশা ভরসা। আমি জানি ঐ রাধেয়কে বধ করা তোমার জন্য কিছুই নয়।'

দুই পক্ষের যোদ্ধারা ভীষণ গর্জনে পরস্পরকে আক্রমণ করলো। ঘোড়ার হ্রেষা, হাতির বৃংহিত, রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দে শিশির ভেজা ভোরের স্নিগ্ধ সজলতা শুকিয়ে গেলো, যুদ্ধের হিংস্র কোলাহলে ভরে গেলো চারদিক।

শুরু হলো ভীমের সাথে অশ্বত্থামার ভয়ংকর যুদ্ধ। দুই বীরের অপূর্ব যুদ্ধ কৌশল ও অস্ত্র শিক্ষা দেখে আকাশ থেকে দেবতা ও মহর্ষিরা

'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীম ও অশ্বত্থামা মারাত্মক ভাবে আহত হলে তাঁদের সারথিরা নিজ নিজ শিবিরে নিয়ে গেলো। বৈদ্যরা তাঁদের চিকিৎসা ও সেবা দিয়ে সুস্থ করতে ব্যস্ত হলেন।

কিছুক্ষণ পর সুস্থ হয়ে অশ্বত্থামা রণক্ষেত্রে ফিরে এসে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কলিঙ্গ, বঙ্গ ও নিষাদ বীরেরা বিরাট বিরাট হাতির পিঠে চড়ে অশ্বত্থামার পক্ষ হয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করতে ছুটলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অর্জুনের শরের মুখে টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

অর্জুনের শরের আঘাতে অশ্বত্থামার চন্দন মাখা দুই বাহু, উরু ও মাথা থেকে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। তাঁর রথের ঘোড়াগুলো আহত হয়ে ভয়ে উল্টোপাল্টা ছুটতে লাগলো। নিজেকে পরাজিত বুঝতে পেরে আহত ও হতাশাগ্রস্ত অশ্বত্থামা কর্ণের সৈন্যদলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অর্জুনের হাতে মগধরাজ দণ্ডাধার ও তাঁর ভাই দণ্ড এবং কৌরবদের বিশাল সংশপ্তক সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলো।

এত সৈন্য এত রাজা ও রাজপুত্রকে যুদ্ধে বধ করে অর্জুনের মন গ্লানি ও বিষাদে ভরে গেলো। তিনি ক্লান্ত স্বরে কৃষ্ণকে বললেন, 'গোবিন্দ, এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তো আমরা চাইনি, আমাদের স্বপ্ন ছিলো প্রজাদের নিয়ে শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দেওয়া।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের হাত ধরে বললেন, সখা, 'এ সবই দৈব, নিয়তির আদেশ। তবে তুমি এই মহাযুদ্ধে যে বীরত্ব যে রণকৌশলের দৃষ্টান্ত রাখলে তা পৃথিবী কখনও ভুলবে না।'

ওদিকে চতুর্থ পাণ্ডব নকুল কর্ণের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করছেন।

কুল বীর যোদ্ধা, কিন্তু কর্ণ বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। অল্প সময়ের মধ্যে কর্ণ নকুলকে প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেললেন, ইচ্ছে করলে তাকে হত্যাও করতে পারতেন। কিন্তু সত্যব্রতী ধর্মপ্রাণ কর্ণ কুন্তীকে দেওয়া তাঁর কথা স্মরণ করে নকুলকে ছেড়ে দিলেন।

কর্ণ এরপর পাণ্ডবপক্ষের পাঞ্চাল সৈন্যদের ধ্বংস করতে লাগলেন, নিমেষের মধ্যে হাজার হাজার পাঞ্চাল সৈন্য মাটিতে মিশে গেলো। ওদিকে অর্জুন বিকেলের ম্লান আলোয় প্রচণ্ড যুদ্ধে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার ভাই সৌশ্রুতিকে বধ করলেন। সুশর্মার অন্য এক ভাই সত্যসেনের তোমরের (শাবল জাতীয় অস্ত্র) আঘাতে কৃষ্ণ আহত হলেন, তাঁর হাত থেকে রথের রাশ ও চাবুক পড়ে গেলো। তাই দেখে অর্জুন রাগে অন্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে সত্যসেন ও তাঁর ভাই চিত্রসেনকে বধ করলেন। তারপর অর্জুনের হাতের ইন্দ্রাস্ত্রে হাজার হাজার আগুনের বাণ ছুটে গিয়ে শত্রুবাহিনীকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে লাগলো।

রণক্ষেত্রের অন্যদিকে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন শরযুদ্ধে পরস্পরকে শেষ করতে চেষ্টা করছিলেন। এক পর্যায়ে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের রথের ঘোড়া ও সারথিকে বধ করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা তাঁকে রক্ষা করতে এলেন, ওদিকে পাণ্ডবেরাও এলেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলে কৌরবদের বধ করতে।

দুর্যোধন হঠাৎ একটা গদা নিয়ে আবার যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করতে ছুটলেন। যুধিষ্ঠির তখুনি জ্বলন্ত উল্কার মত একটি শক্তি অস্ত্র দুর্যোধনের দিকে ছুঁড়ে মারতেই তা দুর্যোধনের বুকের মাঝখানে গিয়ে বিঁধলো।

দুর্যোধন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বল-

লেন, আমি নিজে দুর্যোধনকে বধ করতে চাই, কিন্তু তার আগে ওঁর উরুভঙ্গ করবো এই আমার প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু ভীম সেদিকে এগোবার আগেই দুর্যোধন চেতনা ফিরে পেয়ে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করলেন। কিন্তু অর্জুনের বাণবর্ষণে লক্ষ লক্ষ কৌরবসৈন্য ধ্বংস হচ্ছে দেখে দুর্যোধন হতাশ হয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে শিবিরে ফিরে গেলেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে ধুলোর ঝড় উঠে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। বিজয়ী পাণ্ডবদের শিবিরে আনন্দের কোলাহল ও বাজনা বাজতে লাগলো।

রাত্রির ছায়া কালো বাদুড়ের মতো ডানা মেলে যুদ্ধক্ষেত্রকে ঢেকে ফেলতেই দলে দলে রাক্ষস, পিশাচ, আর হিংস্র জন্তুরা নখ দাঁত বের করে ছুটে এলো। শুরু হয়ে গেলো মৃতসৈনিকদের রক্তমাংস নিয়ে তাদের কাড়াকাড়ি আর উল্লাস।

কর্ণ দুর্যোধন ও শল্যের কথা

কৌরবেরা নিজেদের শিবিরে বসে আহত সাপের মত ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, 'কৃষ্ণের অদ্ভুত কৌশলের জন্যই আমি অর্জুনকে নাগালের মধ্যে পাচ্ছি না। তবু বলছি, আগামী কালের যুদ্ধে হয় আমি অর্জুনকে হত্যা করবো না হয় সে আমাকে হত্যা করবে। যদিও আমার অর্জুনের মত ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র নেই, গাণ্ডীব ধনু নেই। কিন্তু ইন্দ্রদত্ত যে ধনু দিয়ে পরশুরাম একুশবার পৃথিবী জয় করে-

ছিলেন সেই 'বিজয়' নামের ধনুটি পরশুরাম আমাকে দান করেছেন। সেদিক থেকে আমিও অস্ত্রবলে অর্জুনেরই সমান।'

দুর্যোধন এই কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে কর্ণকে ধন্যবাদ দিলেন।

তখন কর্ণ একটু নরম হয়ে বললেন, 'তবে পার্থের চেয়ে এক জায়গায় আমি হীন। তা হচ্ছে, স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ তাঁর সারথি ও রক্ষক। অবশ্য আমাদের দলের রাজা শল্য বাসুদেবের মতই বীর, তিনি যদি দয়া করে আমার রথের সারথি হন তাহলে অর্জুন কেন, দেবরাজ ইন্দ্রকেও আমার কাছে পরাজিত হতে হবে।'

দুর্যোধন শল্যের কাছে গিয়ে সবিনয়ে বললেন, 'মদ্ররাজ, মহারথ কর্ণ আপনাকে সারথি হিসাবে পেলে ধন্য হবেন।'

দুর্যোধনের কথা শুনে শল্য চমকে উঠলেন। দুর্যোধন সেটা লক্ষ্য করে হাতজোড় করে বললেন, 'রাজা, আমি মাথা নীচু করে প্রার্থনা করছি, জনার্দন কৃষ্ণ যেমন ভাবে সারথি ও রক্ষক হয়ে অর্জুনকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করছেন আপনি সেভাবে কর্ণকে রক্ষা করুন।

শল্য নিজের ঐশ্বর্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বীরত্ব, বংশ ইত্যাদির জন্য গর্বিত ছিলেন। দুর্যোধনের কথায় তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মহারাজ, আমি বন্ধুরাজা হিসাবে তোমার দলে যোগ দিয়েছি, কিন্তু এখন তোমার স্পর্ধা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি যে তুমি আমাকে নীচ সূত বংশীয় কর্ণের অধীনে সারথি হতে বলছো। শোন গান্ধারী পুত্র দুর্যোধন, আমি কাল ভোরেই যুদ্ধ ছেড়ে নিজের রাজ্যে চলে যাবো।'

দুর্যোধন শল্যকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বারবার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, 'রাজা আপনি আমাদের এই বিশাল কৌরব বাহিনীর মুকুটমণি, কৃষ্ণকে পরাজিত করার মত যোগ্যতা একমাত্র আপনারই আছে বলে আমি এই অনুরোধ করেছি।

এতসব তোয়াজ আর মিষ্টি কথায় শল্যের মন নরম হলো। তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'দুর্যোধন, তুমি যেমন বীর তেমনি মধুভাষী। আমি জানি, দেবকী নন্দন কৃষ্ণের মত জ্ঞানী ও বীর এ পৃথিবীতে নেই। তুমি তার সঙ্গে আমাকে তুলনা করে সম্মান দিয়েছো, এতে আমি খুশি হয়েছি। ঠিক আছে, কর্ণ যখন অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করবেন, আমি তাঁর সারথি হবো। তবে কর্ণকে আমার একটা শর্ত মানতে হবে, তা হচ্ছে, রথ চালানোর সময় আমি আমার ইচ্ছামত কথা বলবো, কর্ণকে যা ইচ্ছা তাই বলবো।'

কর্ণ আর দুর্যোধন অগত্যা শল্যের কথাতেই রাজী হলেন। তবে তাঁরা একথা জানলেন না যে, যুদ্ধের উদযোগের সময় শল্য যুধিষ্ঠিরকে এই কথা দিয়েছিলেন যে কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের সময় নানা অপ্রিয় কথাবার্তা বলে কর্ণের মন ভেঙ্গে দেবার জন্যই তাঁর সারথি হবেন।

কর্ণ ও শল্যের যুদ্ধ যাত্রা

যুদ্ধের সতেরো দিনের প্রভাতে স্নান ও সূর্য পূজা করে কর্ণ ও শল্য রথে উঠলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'মহারথ কর্ণ, তোমার শক্তি ও সাহসে আমাদের জয় আসুক, বীরত্বের জন্য তুমি পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকো।'

কর্ণ শল্যকে বললেন, 'মহাবাহু মদ্ররাজ, আপনি রথ নিয়ে চলুন,

াজ আমি পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করবো। কৃষ্ণ আজ দেখবে অর্জুনের য়েও বীর আরও একজন আছে।'

শল্য বললেন, 'সূতপুত্র, পঞ্চপাণ্ডবকে অবজ্ঞা করছো কেন? র্জুনের বীরত্বের কাছে দাঁড়াবার আগেই তাঁর গাণ্ডীব ধনুর টংকার নে মূর্ছা যেও না যেন।'

কর্ণ মনে মনে শল্যের ওপর বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ করলেন না। হঠাৎ প্রকৃতিতে নানা রকম অশুভ লক্ষণ দেখা দিলো। তাই দেখে শল্য হেসে উঠে বললেন, 'মনে হয় তোমার যাত্রা শুভ নয়।'

এবার কর্ণ রাগে জ্বলে উঠে বললেন, 'এই রথে অস্ত্র হাতে দাঁড়া-ার পর আমি দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করি না, অর্জুন তো কোন ার।'

শল্য বললেন, 'থামো থামো, আর প্রলাপ বকো না। কোথায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় আর কোথায় নরাধম কর্ণ!'

এইভাবে শল্য অনর্গল অর্জুনের প্রশংসা ও কর্ণের নিন্দাবাদ করতে লাগলেন। দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি চলতে লাগলো। কর্ণ অনেক চেষ্টা করেও ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তিনি উত্তেজিত হয়ে শল্যের দেশ মদ্র এবং মদ্রজাতিদের আচার ব্যবহার ইত্যাদির তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। ফলে যুদ্ধ যাত্রার বদলে সেনাপতির সাথে সারথির বিশ্রী ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো। দুর্যোধন তাই দেখে সেখানে ছুটে এসে দু'জনকে বহু অনুরোধে শান্ত করলেন এবং তাঁর কথায় শল্য পাণ্ডববাহিনীর দিকে রথ ছুটিয়ে দিলেন।

কর্ণ ব্যূহ তৈরী করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। দূর থেকে লক্ষ্য করে শল্য বললেন, 'রাধেয়, ঐ দেখো রূপোর মত উজ্জ্বল শুভ্র যে রথটির বাহন শ্বেতরাজ হাঁসের মত চারটি সাদা ঘোড়া,

কৃষ্ণ যে রথের সারথি সেই রথটি কি অপরূপ তেজ নিয়ে ছুটে আসছে। দেখো, গাণ্ডীব ধনু হাতে অর্জুন রথের ওপর দাঁড়িয়ে, ঐ পার্থকে যদি জয় করতে পারো তবে তুমি আমাদের রাজা হতে পারবে।'

দেখতে দেখতে দুই পক্ষের সৈন্যদল গঙ্গা যমুনার স্রোতের মত ভীষণ যুদ্ধের ঢেউ নিয়ে একে অন্যের ওপর আছড়ে পড়লো।

অর্জুন রুদ্র শিবের মতো শত্রু বধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ও কর্ণের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হলো, যুধিষ্ঠির আহত হয়ে শিবিরে ফিরে গেলেন। তখন ভীমসেন ভীষণ গর্জনে রণভূমি কাঁপিয়ে কর্ণের দিকে ছুটে গেলেন। তুমুল যুদ্ধে হাজার হাজার হাতি, ঘোড়া ও পদাতিক সৈন্য ধ্বংস হতে লাগলো। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীমসেনের শরের আঘাতে দুর্যোধন অজ্ঞান হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন, শল্য তাড়াতাড়ি রথ নিয়ে শিবিরের দিকে ছুটলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও চিকিৎসার পর কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু অর্জুন তখন সংশপ্তক ও অশ্বত্থামার সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন বলে ভীম, নকুল ও সহদেবের সাথে কর্ণের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। অর্জুন অশ্বত্থামাকে মারাত্মক ভাবে আহত করে দুর্যোধনের দিকে এগোতে চাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'পার্থ, ধর্মরাজ আহত এবং অসুস্থ, চল আগে তাঁকে দেখে আসবে।'

আহত যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার্জুনকে একসাথে দেখে ভাবলেন নিশ্চয়ই কর্ণ নিহত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন কর্ণ বেঁচে আছেন এবং ভীম তাঁর সাথে যুদ্ধ করছেন তখন খুব অসন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'চমৎকার! ভীমকে যমের মুখে ফেলে রেখে এখানে তুমি বিশ্রাম নিতে এসেছো? পার্থ, তোমার ঐ গাণ্ডীব ধনু অন্য কোন যোগ্য বীরের হাতে দাও, তিনিই কর্ণকে বধ করবেন।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে রাগে অপমানে লাল হয়ে অর্জুন হাতে খড়্গ তুলে নিলেন। কৃষ্ণ তক্ষুণি তাঁকে থামিয়ে বললেন, 'ধনঞ্জয়, তুমি খড়্গ হাতে নিলে কেন? এখানে তো তোমার শত্রু কেউ নেই।'

অর্জুন তীব্র স্বরে বললেন, 'আমার প্রতিজ্ঞা আছে যদি কেউ আমাকে গাণ্ডীব ধনু নিয়ে ব্যঙ্গ করে তার মাথা কেটে ফেলবো। ধর্মরাজ আমার যত আপনই হোন, প্রতিজ্ঞা পালন করে আমাকে সত্যরক্ষা করতে হবে।'

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'অর্জুন তুমি ধার্মিক হতে পারো কিন্তু মূর্খ। তা নইলে তোমার পিতার মত বড় ভাই এবং রাজা যিনি তাঁকে হত্যা করার কথা ভাবতেও লজ্জা হতো, ভয় হতো। তবে যদি প্রতিজ্ঞা পালনের কথাই বলো তাহলে বলবো, তুমি যে ধর্মরাজকে হত্যা করার জন্য খড়্গ তুলে নিয়েছিলে তাতেই তাঁকে হত্যার চেয়ে বড় কিছু করা হয়েছে। কারণ, "মানীর অপমান শিরচ্ছেদ তুল্য"।'

অর্জুন এই কথা শুনে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'মহারাজ আমিই ভীমকে কর্ণের সাথে যুদ্ধে নামিয়ে অর্জুনকে এখানে এনেছি। ভীম যথেষ্ট ক্ষমতাবান, কর্ণের সাথে যুদ্ধ করার যোগ্যতা তাঁর আছে। আর এদিকে অর্জুনের জন্য আপনার আশীর্বাদ ও বিশ্রাম দরকার ছিলো। যাই হোক আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন।'

যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন ও অনেক উপদেশ দিলেন। অর্জুনও তাঁর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে কর্ণকে বধ না করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবেন না।

অর্জুন ও কর্ণের অভিযান

কৃষ্ণের আদেশে তাঁর সারথি দারুক অর্জুনের বাঘের চামড়ায় ঢাকা রথটি সাজালেন। স্নান ও পূজা সেরে অর্জুন কৃষ্ণের সাথে রথে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। সেই সময় প্রকৃতি যেন অপরূপ সুন্দর হয়ে উঠলো। নির্মল বাতাস বইতে লাগলো, কোমল-সোনালী রোদে হেমন্তের নীল আকাশ ঝলমল করতে লাগলো। নীল কণ্ঠ, শতপত্র, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি শুভ লক্ষণযুক্ত পাখিরা কলকণ্ঠে ডেকে ডেকে রথের ওপর উড়তে লাগলো ঘুরে ঘুরে।

কৃষ্ণ বললেন, 'যুদ্ধের আজ সতেরো দিন চলছে। কৌরবদের প্রচুর সৈন্য নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের পাঁচজন মহারথ অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, শল্য ও কৃত বর্মা বেঁচে আছেন। এঁদের মধ্যে কর্ণকেই তোমার প্রথমে হত্যা করতে হবে।'

এদিকে ভীম কর্ণের সাথে যুদ্ধ করতে করতে বার বার তাঁর সারথি বিশোককে প্রশ্ন করছেন, এখনও অর্জুন কেন আসছে না। তিনি আসলে অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁর জন্য অর্জুনের সাহায্য দরকার ছিলো, তিনি কিছুটা ভয়ও পাচ্ছিলেন।

এমন সময় অর্জুনের গাণ্ডীবের টংকার শোনা গেলো। মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে বললেন, 'ঐ দেখুন অর্জুনের রথ ছুটে আসছে, এখনই তাকে বধ করার সুবর্ণ সুযোগ। আর এ ক্ষমতা একমাত্র আপনারই আছে।

কর্ণ খুশি হয়ে কৌরব মহারথদের বললেন, 'আপনারা চারদি
থেকে কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করে তাঁদের আহত করুন।'

দুঃশাসনের পরের ছোট দশটি ভাই অর্জুনকে ঘিরে ধরতে গি
অর্জুনের ভল্লের আঘাতে নিহত হলেন, নব্বইজন সংশপ্তক রথী
প্রাণ দিলেন।

অর্জুনের রথ কর্ণের দিকে ছুটে গেলো, ভীম পেছন থেকে অর্জু
নকে রক্ষা করতে লাগলেন। এই সময়ে দুঃশাসন শর ছুঁড়তে ছুঁড়
ভীমের কাছে এলেন। মুহূর্তের মধ্যে দুই বুনো হাতীর মত ভীম
দুঃশাসনের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেলো।

ভীমের গদার সামনে দুঃশাসনের সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ হয়ে গেলে
মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে দুঃশাসন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলে
ওদিকে তাঁর রথ, ঘোড়া, সারথি সব মাটিতে লুটাচ্ছে। তখন ভী
হস্তিনাপুরের দ্যূত সভায় দুঃশাসন অসহায় দ্রৌপদীকে যে অপম
করেছিলেন সেই কথা স্মরণ করে চীৎকার করে বললেন, 'ওহে কৌ
যোদ্ধারা শোন, আমি দুঃশাসনকে হত্যা করে তার রক্ত পান করবে
সাধ্য থাকলে বাধা দাও।'

ভীম খ্যাপা চিতা বাঘের মত রথ থেকে দুঃশাসনের ওপর লাফি
পড়লেন। তারপর তাঁর গলায় পা দিয়ে চেপে, তীক্ষ্ণ তলোয়ার দি
বুক চিরে উছলে ওঠা রক্তপান করতে লাগলেন। এরপর দুঃশাসনে
মাথা দেহ থেকে ছিঁড়ে ফেলে রক্ত চাখতে চাখতে বললেন, 'পৃথি
বীতে যত রকম সুস্বাদু পানীয় আছে, সে সবের মধ্যে আজ শত্রুর
রক্তই আমার সবচেয়ে মধুর মনে হচ্ছে। কৃষ্ণার কাছে প্রতিজ্ঞা পা
করে আজ আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী মানুষ।'

ওদিকে বিরাট দেহ ভীমকে ঐ ভাবে নিহত দুঃশাসনের রক্ত খে

দেখে সৈন্যরা তাকে রাক্ষস অথবা পিশাচ ভেবে ভয়ে পালাতে লাগলো। কৃষ্ণ এবং অর্জুন এসে ভীমকে শান্ত হতে বললেন।

ভীম হাসতে হাসতে আকাশ ফাটিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এখন দুর্যোধনকে হত্যা করে পা দিয়ে তার মাথা পিষে ফেলতে পারলে তবে আমি শান্ত হবো।'

কর্ণের ছেলে বৃষসেন পাণ্ডব বীরদের সাথে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর অর্জুনের বাণে নিহত হলেন। ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে কর্ণ চীৎকার করে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

কর্ণ ও অর্জুনকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মুখোমুখি হতে দেখে সমস্ত পৃথিবী যেন দু ভাগ হয়ে দুই বীরের পক্ষ নিলো। সূর্যদেব তাঁর চাঁদ তারা ও দেবতাদের নিয়ে কর্ণের পক্ষ নিলেন, অসুর রাক্ষস, ভূতপ্রেত, পিশাচ, সূত ও শূদ্র জাতি, শেয়াল, কুকুর, সাপ ইত্যাদি প্রাণীরাও কর্ণকে সমর্থন করতে লাগলো। আর পৃথিবীর সমস্ত নদী, সমুদ্র বন, পর্বত, ধর্মগ্রন্থ মন্ত্র ইতিহাস, সমুদ্রের নীচের মহানাগেরা, গরু ঘোড়া, হাতী, হরিণ ক্রৌঞ্চ, নীল কণ্ঠ ও ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি সুলক্ষণ জন্তু ও পাখিরা, দেবর্ষি ও রাজর্ষিরা অর্জুনের পক্ষ নিলেন।

ব্রহ্মা, মহেশ্বর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাও অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ দেখতে এলেন ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ সন্তানের (ইন্দ্রের অর্জুন ও সূর্যের কর্ণ) জন্য ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

পৃথিবীতে বহু যুদ্ধ হয়েছে, বহু যুদ্ধ হবে কিন্তু কর্ণার্জুনের এ যুদ্ধের ভয়াবহতার তুলনা নেই। চোখের নিমেষে কৌরবসৈন্যে শুকনো ধুলোর মত উড়ে যাচ্ছে দেখে অশ্বত্থামার মত মহারথও কাতর হয়ে দুর্যোধনের হাত ধরে অনুরোধ করলেন, 'সখা এখনও সময় আছে, এই আত্মঘাতী যুদ্ধ বন্ধ কর। আমাকে অনুমতি দাও আ

কর্ণ ও অর্জুনকে যুদ্ধ থামিয়ে শান্তির পথে আসতে বলি। যুধিষ্ঠিরের কাছে, কৃষ্ণের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাই।'

দুর্যোধন বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'কোন লাভ নেই। সমস্ত পাণ্ডবদল রাজী হলেও ভীম কখনই রাজী হবে না সন্ধির প্রস্তাবে। আমি জানি মৃত্যুই এখন আমাদের একমাত্র পথ। কর্ণকে বাধা দিও না, তাঁকে বীরের মৃত্যু বরণ করে স্বর্গে যেতে দাও।'

কর্ণ ও অর্জুন তাঁদের যাবতীয় ভয়ংকর ও দিব্যঅস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু অর্জুনের ঐন্দ্রাস্ত্র যখন কর্ণের ভার্গবাস্ত্রের মুখে নষ্ট হলো তখন কৃষ্ণ বললেন, 'ধনঞ্জয় একি হলো। তুমি বরং আমার এই সুদর্শন চক্র নাও, এই দিয়ে দুর্যোধনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কর।'

অর্জুন ব্রহ্মাকে প্রণাম জানিয়ে কর্ণের দিকে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত্র থেকে শত শত শূল, ধারালো কুঠার, চক্র, বর্শা প্রভৃতি ছুটে বেরিয়ে শত্রু বধ করতে লাগলো। এই সময়ে যুধিষ্ঠির সোনার বর্ম পরে রথ নিয়ে যুদ্ধ দেখতে এলেন।

অর্জুনের বাণে বাণে কৌরববীরেরা সবাই আহত হয়েছেন দেখে সৈন্যরা ভয়ে পালাতে শুরু করলো, দুর্যোধন শত চেষ্টা করেও তাদের ফেরাতে পারলেন না।

খাণ্ডবদাহের সময় অর্জুন যে তক্ষকনাগকে হত্যা করেছিলেন সেই তক্ষকের ছেলে অশ্বসেন মাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কর্ণের তূণের মত শরের রূপ নিয়ে ঢুকে রইলো। কর্ণ না জেনেই সেই শর নিক্ষেপ করতেই ভীষণ শব্দে আগুনের ফলার মত এক ভয়ংকর শর অর্জুনের দিকে ছুটলো। চোখের পলকে কৃষ্ণ তাঁর পায়ের চাপে অর্জুনের রথ মাটিতে এক হাত বসিয়ে দিলেন। রথের চারটি

সাদা ঘোড়া হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লো, জ্বলন্ত সেই বাণ অর্জুনের মাথার সূর্যরশ্মির মত সোনার মুকুট ছুঁয়ে চলে গেলো, তাতেই মুকুটটি পুড়ে মাথা থেকে খসে পড়লো।

অশ্বসেন আবার শর হয়ে তূণে ঢুকতে চাইলে কর্ণ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি না জেনে তোমাকে শর হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম। হয়তো তোমাকে দিয়েই অর্জুনকে হত্যা করা সম্ভব, কিন্তু এই কাজে আমি কারুরই সাহায্য চাই না। এটা আমারই পবিত্র কর্তব্য।'

তখন অশ্বসেন নিজেই জ্বলন্ত উল্কার মত অর্জুনের দিকে ছুটলো, কিন্তু অর্জুনের বাণ তাকে টুকরো টুকরো করে দিলো। এরপর বীর শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যেমন অবলীলায় পায়ের চাপে অর্জুনের রথ মাটিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন তেমনি অনায়াসে হাতের টানে সেই রথ তুলে ফেললেন।

অর্জুনের শরের আঘাতে কর্ণের মণি মুকুট, কুণ্ডল ও সোনার বর্ম ভেঙ্গে চুরমার হলো, বুকে লোহার তীক্ষ্ণ বাণ এসে বিঁধলে মহারথ কর্ণ থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

পুরুষ শ্রেষ্ঠ অর্জুন এমন অবস্থায় কর্ণকে বধ করতে চাইলেন না। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'ফাল্গুনি, ভুল কোর না। বুদ্ধিমান লোকে বিপক্ষ দুর্বল হলেও তাকে ছেড়ে দেয় না।'

মৃত্যু এবং কাল গ্রাস করতে আসছে বুঝে কর্ণ তাঁর পরশুরামের দেওয়া ব্রহ্মাস্ত্রের কথা ভুলে গিয়ে পাগলের মত এলোমেলো অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলেন। ওদিকে কর্ণের রথের চাকা ধীরে ধীরে মাটিতে বসে যাচ্ছে, অর্জুন একটি করে দিব্যাস্ত্র ব্যবহার করছেন আর কর্ণের রথ আরও নেমে যাচ্ছে। কর্ণ রাগে শিশুর মত কেঁদে উঠে

বললেন, 'পার্থ তুমি বীর, দেখছো তো আমার রথের চাকা বসে যাচ্ছে, আশা করি এই অবস্থায় তুমি আমাকে হত্যা করবে না। আমি তোমাকে কিংবা বাসুদেব কৃষ্ণকে ভয় করি না। তুমি ক্ষত্রিয়ের সন্তান, ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা মনে করে আমাকে কিছুটা সময় দাও।'

কৃষ্ণ হেসে উঠে বললেন, 'ধিক্! ধিক্! রাধেয়, নীচ লোকই বিপদে পড়লে এমন ধর্মের দোহাই দেয়। কর্ণ তোমার এই ধর্মবুদ্ধি কোথায় ছিলো যখন দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির সাথে পরামর্শ করে অসহায় নারী কৃষ্ণাকে প্রকাশ্য রাজসভায় অপমান করিয়েছিলে? ভুলে গেছো কি বালক অভিমন্যুকে বধ করার কথা? তখন কোথায় ছিলো তোমার ধর্ম?'

কৃষ্ণের কথা শুনে রাগে অপমানে কর্ণের ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। হঠাৎ তিনি একটি ভয়ংকর বাণ অর্জুনের বাহুতে বিদ্ধ করলেন, তাতে অর্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে গেলো। এই অবসরে রথ থেকে নেমে কর্ণ রথের চাকা টেনে তুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা!

অর্জুন ক্ষিপ্র হাতে গাণ্ডীব তুলে নিয়ে তাতে অঞ্জলিক বাণ জুড়ে নিয়ে বললেন, 'যদি আমি যজ্ঞ ও তপস্যা করে থাকি, যদি গুরুজন, ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠজনকে সম্মান ও সেবা করে থাকি তাহলে এই বাণ আমার শত্রুকে বধ করবে।'

শেষ বিকেলের সোনার আভায় যখন কুরুক্ষেত্রের আকাশ ভরে গেছে তখন অর্জুন অঞ্জলিক বাণ দিয়ে কর্ণের মাথা ছিন্ন করলেন। বিদায়ী সূর্য যেমন রক্তলাল হয়ে হঠাৎ করে অস্তাচলে ডুবে যায় ঠিক তেমনি করে কর্ণের রক্তাক্ত মাথা তার দেহ থেকে মাটিতে পড়ে গেলো।

কৃষ্ণ-তাঁর পাঞ্চজন্য শংখে প্রলয়ধ্বনি করলেন। পাণ্ডব বীরেরা

রণবাদ্য বাজিয়ে, উত্তরীয় উড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন।

কর্ণের রক্তাক্ত শরীর অজস্র শরে বিদ্ধ অবস্থায় ধুলোয় পড়ে রইলো, আর তাঁর সারথি শল্য শিবিরে ফিরে গেলেন। একা, বিষণ্ণ ও নির্বাক।

মদ্ররাজ শল্যের মুখে কর্ণের মৃত্যু সংবাদ শুনে দুর্যোধন হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। অন্যান্য বীরেরাও এত ভেঙ্গে পড়লেন যে তাঁরা কেউই দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিতে এলেন না।

পাণ্ডবদের চোখে কর্ণ যতই মন্দ হোন, তিনি দাতা শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মজ্ঞ বীর। সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয়ে দাতা কর্ণ স্বর্গধামে যাত্রা করলেন, সূর্যদেব তাঁর আপন পুত্রকে দু'হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণ বধের খবর পেয়ে রণক্ষেত্রে তাঁর মৃতদেহ দেখতে এলেন। তারপর তিনি কৃষ্ণার্জুনের বহু প্রশংসা করে কৃষ্ণকে বললেন, 'গোবিন্দ, তেরো বছর পর আজ তোমার দয়ায় আমি শান্তির ঘুম ঘুমাবো।

শল্য পর্ব

কৃপ-দুর্যোধন কথা

কৌরবেরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে দেখে কৃপাচার্য চিন্তিত হলেন। যদিও কর্তব্য পালনের জন্য তাঁকে কৌরবদলে যোগ দিতে হয়েছে কিন্তু দুর্যোধনদের কোন কাজেই তাঁর কখনও সমর্থন ছিলো না। তিনি দুর্যোধনকে বললেন, 'রাজা, আমাদের এখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে পাণ্ডবদের সাথে সন্ধি করাই শ্রেষ্ঠ পথ। ধৃতরাষ্ট্র ও কৃষ্ণ যদি অনুরোধ করেন তাহলে যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই সন্ধি করবেন এবং তোমারও সিংহাসন ও রাজপদ বজায় থাকবে।'

দুর্যোধন বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু আপনি আমার গুরু, আপনার আদেশ আমার জন্য ধর্মের নির্দেশেরই মত। কিন্তু মরবার আগে অনেক রোগীর যেমন ওষুধের প্রতি অরুচি হয় আমারও তেমনি সবরকম সৎ উপদেশই অসহ্য লাগছে। তাছাড়া আমরাই বা কোন মুখে পাণ্ডবদের কাছে সন্ধির আশা নিয়ে যাবো? সেই জতুগৃহ দাহ থেকে শুরু করে কপট পাশাখেলা, দ্রৌপদীর অপমান, পঞ্চপাণ্ডবকে রাজ্য

থেকে বাঞ্চত করে বনবাসে পাঠানো, শেষপর্যন্ত কৃষ্ণকে বন্দী করার স্পর্ধা, এতসব অন্যায়ের পরও কি তাঁরা আমাদের কথা শুনবেন। যমের দোসর ভীমসেন কখনই তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে নড়বেন না। আর কৃষ্ণা আমাদের বিনাশ কামনায় কঠোর তপস্যা করছেন, পুত্রহারা মা সুভদ্রা তাঁর ছেলে অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রতিশোধ চান। সবচেয়ে বড় কথা, এই সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়ে আমি কি করে ক্রীত-দাসের মত, অধীনস্থ রাজা হয়ে যুধিষ্ঠিরের পেছনে থেকে রাজ্য ভোগ করবো? এর চেয়ে ক্ষত্রিয়ের মত মরাই গৌরবের। তাছাড়া আমার জন্য আমার পিতামহ, বন্ধু, ভাই এবং আত্মীয়েরা এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন এখন যদি আমি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সন্ধি করি, জগৎবাসী তাহলে আমাকে কাপুরুষ বলে কলংক দেবে। আমি বীরের মৃত্যু চাই।'

দুর্যোধনের কথা শুনে উপস্থিত ক্ষত্রিয়েরা তাঁকে প্রশংসা করলেন। তারপর তাঁরা দেহে মনে শান্তি আনার জন্য হিমালয়ের কাছাকাছি স্বরস্বতী নদীর তীরে গিয়ে নদীর অমৃতধারার মত জল পান করলেন এবং স্নান করে শরীর জুড়ালেন। তারপর নদীর নির্মল বাতাসে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে শিবিরে ফিরে এলেন।

মধ্যরাতের আকাশ থেকে মায়ের অশ্রুর মত শিশির ঝরছে। যুদ্ধ ক্লান্ত সৈন্যরা গভীর ঘুমে ডুবে আছে। ঘুম নেই শুধু রাজা দুর্যো-ধনের চোখে। তিনি সারথিকে ডেকে রথ তৈরী করতে বললেন।

দুর্যোধনকে এত রাতে দেখে অশ্বত্থামা অবাক হলেন। দুর্যোধন তাঁকে বললেন, 'গুরুপুত্র, আপনিই এখন আমাকে একমাত্র পথ নির্দেশ দিতে পারেন। বলুন, কে এবার আমাদের সেনাপতি হবেন।'

অশ্বত্থামা মদ্ররাজ শল্যকেই সেনাপতি হবার যোগ্য বলে জানা-

লেন। তখন দুর্যোধন শল্যের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে তাঁকে সেনাপতি হবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

মদ্ররাজ দুর্যোধনের বিনয়ে সুখী হয়ে বললেন, 'আমি তোমার বিজয়ের জন্য সবই করবো।'

সেই রাত্রে দুর্যোধন তাঁর পক্ষের প্রধানদের নিয়ে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন। মদ্রদেশীয় সৈন্যরা আনন্দে জয়-ধ্বনি করতে লাগলো।

চরের মুখে যুধিষ্ঠির শল্যের অভিষেকের কথা জানতে পেরে কৃষ্ণকে জানালেন। কৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিলেন, 'রাজা আপনাকে অনুরোধ, শল্য আপনার মামা বলে যেন তাঁকে দয়া করবেন না, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য শত্রু যেই হোক তাকে বধ করা।'

শল্য বধ

যুদ্ধের আঠারো দিনের প্রভাতে কৌরব মহারথেরা এই নিয়ম করলেন যে তাঁরা কেউ একা পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধে নামবেন না, পরস্পরকে রক্ষা করে মিলিত ভাবেই যুদ্ধ করবেন।

শল্য সর্বতোভদ্র নামে বূহ্যরচনা করলেন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। কর্ণের ছেলে চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুশর্মা নকুলের হাতে নিহত হলেন। সহদেব শল্যের ছেলেকে হত্যা করলেন। ভীম-সেন ও শল্য যুদ্ধ করতে করতে এমন ভাবে আহত হলেন যে তাঁরা দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

দুর্যোধনের প্রাসের (ছোট বর্শা) আঘাতে যাদব বীর চেকিতান নিহত হলেন। অর্জুনের সাথে অশ্বত্থামার যুদ্ধ চলতে লাগলো।

যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'জনার্দন কৃষ্ণ, আমার ওপর কৌরব সেনাপতি শল্যকে বধ করার আদেশ দিয়েছেন। আপনারা আমার সত্য প্রতিজ্ঞা শুনে রাখুন, আজকের যুদ্ধে হয় আমি শল্যকে বধ করবো না হয় শল্যই আমাকে হত্যা করবেন।'

যুধিষ্ঠিরের আদেশে তাঁর রথে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রাখা হলো। পাণ্ডব-বীরেরা তাঁর চারদিকে প্রহরা রইলেন।

ভয়ংকর দুই বাঘের মত যুধিষ্ঠির ও শল্য পরস্পরকে ভীষণ ভীষণ অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। কৌরব ও পাণ্ডবেরা অবাক হয়ে দেখছেন কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠির যিনি চিরদিন মৃদু, শান্ত ও ক্ষমাশীল ছিলেন তিনি কি ভয়ানক নিষ্ঠুর হয়ে ভল্লের আঘাতে হাজার হাজার যোদ্ধাকে বধ করে চলেছেন।

শল্যের বাণে যুধিষ্ঠিরের রথের ঘোড়া নিহত হলে ভীমসেন ও শল্যের রথের সারথি ও ঘোড়া বধ করলেন। শল্য রথ থেকে নেমে খড়্গ ও ঢাল নিয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে ছুটে এলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথা স্মরণ করে শল্যকে বধ করতে তৈরী হলেন।

যুধিষ্ঠির ঘোড়া ও সারথি বিহীন রথে দাঁড়িয়ে সূর্যরশ্মির মত উজ্জ্বল এক শক্তি অস্ত্র হাতে নিয়ে বললেন, 'পাপী তুমি নিহত হও' তারপর সেই অস্ত্র মদ্ররাজ শল্যের দিকে নিক্ষেপ করলেন। ভীষণ এক জ্বলন্ত উল্কার মত সেই শক্তি অস্ত্র আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে শল্যের বিশাল বুক চিরে মাটিতে ঢুকে গেলো। শল্য মস্ত এক পর্বত চূড়ার মত মাটিতে পড়ে গেলেন।

শল্যের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের হাতে শল্যের ভাই প্রাণ দিলেন।

মদ্র যোদ্ধারা ভয়ে যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে লাগলো। দুর্যোধন বিরাট এক হাতির পিঠে চড়ে পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধ করতে এলেন, তবে পাণ্ডব মহারথদের সাথে বেশীক্ষণ যুদ্ধে টেঁকা সম্ভব হলো না বলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

বিকেলের দিকে কৌরবসেনারা মনোবল হারিয়ে কোনমতে লড়ছে দেখে ম্লেচ্ছরাজা শাল্ব পাণ্ডবদের সাথে লড়তে এসে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে নিহত হলেন।

শাল্বের মৃত্যুতে কৌরবসৈন্য আবার ছত্রভঙ্গ হলো। দুর্যোধনের উৎসাহে অশ্বত্থামা, শকুনি, উলুক এবং কৃপাচার্যও পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধ করতে এলেন।

ওদিকে হস্তিনাপুরে ব্যাসদেবের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করে সঞ্জয় প্রতিদিন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুঙ্খানুপুংখ বর্ণনা দিতেন। কৌরবসৈন্য ক্ষীণ ও মহারথ শূন্য হয়ে চলেছে দেখে সঞ্জয় প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে এলেন। কিন্তু সাত্যকির হাতে তিনি মারাত্মক ভাবে আহত ও বন্দী হলেন।

অষ্টাদশ দিনের অপরাহ্নের মধ্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুই পুত্র দুর্যোধন ও সুদর্শন ছাড়া অন্যান্য সকলেই ভীমের হাতে নিহত হলেন।

তারপর অর্জুন ত্রিগর্ত দেশীয় রাজা সুশর্মা ও তাঁর পঁয়তাল্লিশজন পুত্রকে বধ করলেন। দুর্যোধনের সকল কুকীর্তির মন্ত্রণা দাতা ও মামা শকুনি ও তাঁর ছোট উলুক মরণপণ করে পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধ করতে এলেন। সহদেব তাঁর ভল্লের আঘাতে উলুকের মাথা ছিন্ন করলেন। পুত্রশোকে উন্মাদ প্রায় শকুনি সহদেবের দিকে এক ভীষণ শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু চোখের নিমেষে সহদেব সে অস্ত্র নষ্ট করে ভল্লের আঘাতে শকুনিকে বধ করলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের আদেশে সাত্যকি যখন বন্দী সঞ্জয়কে বধ করবেন বলে খড়্গ উত্তোলন করলেন ঠিক তখুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'সঞ্জয়কে মুক্তি দাও, এঁর জীবনে প্রয়োজন আছে।'

সাত্যকি হাত জোড় করে ব্যাসকে বললেন, 'মহাপ্রাজ্ঞ, আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

মুক্তি পেয়ে সঞ্জয় রণস্থল থেকে একক্রোশ দূরে গিয়ে দেখলেন দুর্যোধন ক্ষতবিক্ষত দেহে গদা হস্তে একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা পরস্পরের দিকে সজল চোখে চেয়ে রইলেন। দুর্যোধনের কাছে সারথি সঞ্জয় তাঁর বন্দীত্ব এবং মুক্তির বিষয় এবং যুদ্ধের সকল সংবাদ দিয়ে বললেন, 'আপনার কোন ভাই-ই আর জীবিত নেই। কৌরবপক্ষের তিন রথী কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃত বর্মা বেঁচে রইলেও সৈন্যেরা শেষ হয়ে গেছে।'

দুর্যোধন সঞ্জয়কে বললেন, 'প্রজ্ঞা চক্ষু, তুমি আমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বলবে, আপনার পুত্র দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছে। আমার ভাইরা নেই, রাজ্য নেই, মিত্র অমাত্য কেউ নেই, এই হীন জীবনকে কি করে সহ্য করি? পিতাকে বলো আমি মহাযুদ্ধ থেকে মুক্ত হয়ে এই হ্রদে ঘুমন্তের মতো পড়ে রয়েছি।'

এই কথা বলে দুর্যোধন মায়া বলে হ্রদের জলকে জমাট করে তার নিচে শুয়ে রইলেন। সঞ্জয় সেই দৃশ্য দেখে ফিরে গেলেন।

সূর্যাস্ত হলে কৌরবশিবিরের সকলেই দুর্যোধনের ভাইদের নিহত হবার সংবাদে ভীত ও বিচলিত হলো। দুর্যোধনের অমাত্যেরা অতিদ্রুত ঘোড়া, হাতি রথ ইত্যাদি যোগে তাঁদের নিজ নিজ স্ত্রী সহ হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের যুযুৎসু নামের যে পুত্রটি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন

তিনি যুধিষ্ঠির অনুমতি নিয়ে হস্তিনাপুরে গিয়ে বিদুরকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন।

যুধিষ্ঠিরের তর্জন

পাণ্ডবেরা বহু খোঁজ করেও দুর্যোধনকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। তাঁরা ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যাকালে শিবিরে ফিরে যাবার পর কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামা দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে এসে বললেন, 'রাজা তুমি ওঠো, আমরা এখনও জীবিত আছি, চল আগামীকাল প্রভাতে নতুন উদ্যমে যুদ্ধ করে হয় জয়ী হব, না হয় বীরের মৃত্যু লাভ করবো।'

দুর্যোধন ক্লান্ত করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য আপনারা জীবিত রয়েছেন। কিন্তু আমি এখন ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত, এই রাত্রে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। আপনারা যান বিশ্রাম করুন গে, কাল প্রভাতে আমরা সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধে নামবো।'

কয়েকজন ব্যাধ সেই সময়ে জলপানের জন্য হ্রদের কাছে এলো। তারা রোজ ভীমসেনের জন্য মাংস জোগান দিতো। ব্যাধরা লুকিয়ে থেকে দুর্যোধন ও অশ্বত্থামা প্রভৃতির কথা শুনলো। তারা জানতো পাণ্ডবেরা সব জায়গায় দুর্যোধনকে খোঁজ করছেন। পুরস্কারের আশায় তখনি ব্যাধেরা পাণ্ডবশিবিরের দিকে ছুটলো।

ব্যাধদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ভীম তাদের প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন। তারপর পাণ্ডবেরা সদলবলে দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে যাত্রা করলেন।

দূর থেকে পাণ্ডবদের শংখনাদ, রথচক্রের শব্দ ও সৈন্যদের কোলাহল শুনে কৌরববীরেরা দ্বৈপায়ন হ্রদ থেকে দূরে এক বটগাছের নীচে গিয়ে বসলেন।

হ্রদের তীরে এসে পাণ্ডবেরা বুঝলেন দুর্যোধন মায়ার বলেই হ্রদের জল জমাট করে তার নিচে আশ্রয় নিয়েছেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'রাজা, মায়াবীকে মায়া বলেই নষ্ট করতে হবে।'

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের ঈঙ্গিত বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে দুর্যোধনকে ডেকে বললেন, 'ভাই দুর্যোধন তোমার এত তেজ কোথায় গেলো? নিজের ভাই আর ছেলেদের যুদ্ধে মরতে দেখার পরও তুমি এমন কাপুরুষের মত লুকিয়ে রয়েছো কি করে? আসলে তুমি বীর নও, বীরত্বের ভান দেখাও।'

দুর্যোধন জলের ভেতর থেকে উত্তর দিলেন, 'রাজা যুধিষ্ঠির, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি প্রাণের ভয়ে জলের তলে আশ্রয় নিইনি। আমার দেহমন বড় ক্লান্ত। বিশ্রামের জন্যই এখানে এই শীতল জলে শুয়ে রয়েছি। তাছাড়া আমি এখন রথহীন, অস্ত্রহীন। আগামী প্রভাতে আমি আপনাদের সাথে যুদ্ধ করবো।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'গান্ধারী পুত্র, বৃথা ছলনা না করে উঠে এসো, যুদ্ধ কর।'

দুর্যোধন বললেন, 'কুন্তী পুত্র, আপনি মহাজ্ঞানী। নিশ্চয়ই আমার স্বজন হারাবার বেদনা উপলব্ধি করতে পারছেন। মহারাজ, এই বিধবা পৃথিবীর ওপর আমার আর আকর্ষণ নেই, আপনিই একে মহাসুখে ভোগ করুন। আমিই সব ত্যাগ করে বনবাসী হব।'

যুধিষ্ঠির এবার গর্জন করে বললেন, 'তোমার বাজে প্রলাপ বন্ধ কর

দুর্যোধন। এক সময়ে সূচাগ্র ভূমিটুকু তুমি আমাদের দিতে চাওনি, এখন নির্লজ্জের মত সমগ্র পৃথিবীর লোভ দেখাচ্ছো? মনে রেখো আমি যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করেই সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হব। পাপী, তোমার জীবন এখন আমার হাতে, এখন উঠে সেই জীবনকে পণ ধরে যুদ্ধ কর।'

দুর্যোধন চিরদিন রাজার সম্মানে মাথা উঁচু করেই চলেছেন। এখন বেকায়দায় পড়ে তাঁকে যুধিষ্ঠিরের এই সব কটু কথা সহ্য করতে হচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুর্যোধন বললেন, 'ধর্মরাজ, আপনারা সদলবলে আছেন আপনাদের হাতে রয়েছে অস্ত্র। কিন্তু আমি তো অস্ত্রহীন এবং একা। আজ রাত্রিটা আমাকে সময় দিন, ভোরে আপনারা একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। রাত্রি শেষে ভোরের সূর্য একাই যেমন করে সমস্ত তারাকে নিবিয়ে দেন, তেমনি অস্ত্রহীন অবস্থাতেও আমি আপনাদের সবাইকে শেষ করবো।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'অনেক কথা বলেছো, এবার দয়া করে উঠে এসো ভাই। তোমাকে পছন্দমত অস্ত্র দিচ্ছি তাই নিয়ে আমাদের এক একজনকে বধ কর। শোন, এই যুদ্ধে যদি তুমি আমাদের যেকোন একজন বধ করতে পারো তাহলেই কুরুরাজ্য পাবে, আর নিজে যদি মরো তাহলে সোজা স্বর্গে চলে যাবে।'

দুর্যোধন হ্রদের জলে আলোড়ন তুলে অজগরের মত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বিরাট এক লোহার গদা হাতে নিয়ে উঠে এলেন।

তাঁকে দেখে পাণ্ডবেরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন। দুর্যোধনের শরীর থেকে তখনও রক্ত ঝরছে; শরীরের নানা জায়গায় অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন। তিনি মেঘের মত গর্জন করে বললেন, 'বীরেরা

শুনুন, মনে রাখবেন আমি পৃথক ভাবে আপনাদের সবার সাথেই যুদ্ধ করতে তৈরী।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'হায় দুর্যোধন! যখন তোমরা ছয়রথী ও জয়দ্রথ মিলে বালক অভিমন্যুকে বধ করেছিলে তখন তোমার এই সুবুদ্ধি কোথায় ছিলো? যাই হোক, তুমি অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও। আমি আবার বলছি পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছা যুদ্ধ কর, তাকে বধ করে কুরুরাজ্যের সিংহাসন লাভ কর, অথবা নিহত হয়ে স্বর্গে যাও।'

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ওপর ভীষণ রেগে বললেন, 'রাজা, আপনি এ কি করছেন! কেন বার বার বলছেন, পঞ্চপাণ্ডবের একজনকে বধ করে কুরুরাজ্য লাভ কর। এতো দেখছি সেই পাশা খেলার পণের মতই বুদ্ধিহীন আচরণ করছেন। আপনাদের মধ্যে একমাত্র ভীমসেনই দুর্যোধনের সঙ্গে গদাযুদ্ধে দাঁড়াবার যোগ্য। কিন্তু সে যদি এখন অর্জুন কিংবা আপনাকে অথবা নকুলকে যুদ্ধে আহ্বান করে? হায় রাজা! আসলে আপনাদের ভাগ্য বনবাসেই লেখা আছে, রাজ্যভোগের জন্য আপনারা জন্মাননি।'

ভীম বললেন, 'বাসুদেব, আমি আগেই দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করেছি এবং তার পতন হবেই।'

ভীম দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলে দুর্যোধন খ্যাপা হাতির মত তাঁর সামনে এলেন। ভীম তাঁকে বললেন, 'অকারণে হিংসায় পাণ্ডবদের ওপর যেসব অন্যায় করেছো, পাণ্ডবকুল বধূ কৃষ্ণাকে অপমান করেছো, সেই সব পাপের কথা স্মরণ করে মৃত্যুর জন্য তৈরী হও।'

দুর্যোধন বললেন, 'থামো ভীম। বৃথা বাহাদুরী না করে যুদ্ধে তোমার শক্তি দেখাও।'

এই সময় দুর্যোধন ও ভীমের গুরু হলায়ুধ বলরাম সেখানে

উপস্থিত হলেন।

বলরাম বললেন, 'রাজা যুধিষ্ঠির, আমি ঋষিদের কাছে শুনেছি, কুরুক্ষেত্র বড় পুণ্যভূমি, সেই রণক্ষেত্রে যাঁরা নিহত হন তাঁরা স্বর্গলাভ করেন। আপনারা এই হ্রদের তীর থেকে কুরুক্ষেত্রের সমন্ত পঞ্চকে চলুন, সেখানে আমার দুই প্রিয় শিষ্য যুদ্ধ করবেন।'

সমন্ত পঞ্চকে দুর্যোধন আর ভীম দুই খ্যাপা ষাঁড়ের মত লড়ছেন। গদাযুদ্ধ ভীষণ থেকে ভীষণতর হচ্ছে দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, 'মাধব, এই যুদ্ধের পরিণতি কি হবে?'

কৃষ্ণ বললেন, 'ভীম যতই বলবান হোক রণকৌশলে দুর্যোধনই শ্রেষ্ঠ। ন্যায় যুদ্ধে ভীম জয়ী হতে পারবে না, তার ওপর ধর্মরাজ নির্বোধের মত যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তাতে বিপদের আশংকা খুবই বেশী। পার্থ, তুমি ভীমকে দ্যূত সভার সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দাও।'

অর্জুন তখন ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম উরুতে চাপড় মারলেন। ঠিক সেই সময়ে ভীমের মার আটকাতে দুর্যোধন লাফিয়ে উঠলেন এবং ভীম সিংহের মত গর্জন করে গদার প্রচণ্ড আঘাতে দুর্যোধনের উরু ভেঙ্গে ফেললেন। বিশাল পর্বত চূড়ার মত দুর্যোধনের শরীরটা মাটিতে আছড়ে পড়লো। ভীম তাঁর মাথার ওপর পা চেপে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে তিরস্কার করতে লাগলেন।

ভীমের এই নীচ আচরণে সবাই খুব অসন্তুষ্ট হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'ভীম এই নীচ ব্যবহার তোমাকে সাজে না। দুর্যোধন আমাদের শত্রু হলেও তিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা, আমাদের সাথে রয়েছে এঁর রক্তের সম্বন্ধ, তাঁকে এমন অপমান করতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় কথা যুদ্ধ করে

ইনি এখন বীরের শ্রেষ্ঠ মৃত্যু বরণ করতে চলেছেন।'

তারপর যুধিষ্ঠির রাজা দুর্যোধনের কাছে গিয়ে কান্না ভেজা স্বরে বললেন, 'ভাই, তুমি তোমার কর্মফল ভোগ করছো। তোমার জন্যই আজ তোমার ভাইরা আমাদের পিতামহ, অস্ত্রগুরু ও বহু আত্মীয় পরিজন নিহত হয়েছেন। তবু তুমি ভাগ্যবান, তাই বীরের মৃত্যুলাভ করে স্বর্গে চলে যাবে। আর আমরা পৃথিবীতে বেঁচে থেকে প্রিয়জনদের শোকে কষ্ট পাবো। দুর্যোধন, আমার ভাবতেও বুক ফেটে যাচ্ছে কি করে আমি পুত্রহারা মা গান্ধারীর সামনে দাঁড়াবো, কৌরবকুলের বিধবা বধুদের দেখবো।'

বলরাম ভীষণ রেগে ভীমকে বললেন, 'ধিক্ ধিক্ ভীম! ধর্মযুদ্ধে তুমি দুর্যোধনের নাভির নীচে আঘাত করলে। এ কাজ শাস্ত্র বিরুদ্ধ, অন্যায়, আমি তোমাকেই বধ করবো।'

কৃষ্ণ বলরামের হাত ধরে বললেন, 'ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তার প্রতিজ্ঞা পালন করা। দুর্যোধন যখন দ্যূতসভায় দ্রৌপদীকে নিজের উরু দেখিয়ে অপমান করেছিলেন, তখই ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি মহাযুদ্ধে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করবেন। আবার মহর্ষি মৈত্রেয়র উপদেশের জবাবে দুর্যোধন যখন তাচ্ছিল্য করে নিজের উরুতে চাপড় মেরেছিলেন তখন মৈত্রেয় তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, মহাযুদ্ধে তোমার ঐ উরু ভেঙ্গে যাবে। অতএব আমি ভীমের কোন দোষ দেখি না।'

কৃষ্ণের মুখে ধর্মের ছলনা শুনে বলরাম অসন্তুষ্ট হয়ে রথে চড়ে দ্বারকায় যাত্রা করলেন।

দুর্যোধন তাঁর মাথার কাছে কৃষ্ণকে দেখে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং সমস্ত যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, তুমিই যে ভীমকে উরু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দিয়েছো সে

কথা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। তোমারই কূট বুদ্ধিতে আমাদের এই পরাজয় ঘটলো। তুমিই শিখণ্ডীকে সামনে রেখে পিতামহ ভীষ্মকে বধ করিয়েছো, যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ বলিয়ে দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়েছো, কর্ণ যখন তাঁর রথের চাকা তুলছিলেন তখন তোমারই ঈংগিতে অর্জুন তাঁকে হত্যা করেছে। আমাদের সাথে ন্যায়ের যুদ্ধে কখনই তোমরা জয়ী হতে পারতে না।'

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "গান্ধারী পুত্র, তুমি নিজের ফল ভোগ করছো, এতে আর কারুরই হাত নেই।"

দুর্যোধন বললেন, 'কূটবুদ্ধি কৃষ্ণ তুমি যত যা ই বল না কেন, আমি রাজা ছিলাম এখন রাজার মতই মরবো। আমি বহু শত্রু বধ করেছি। সম্মুখ যুদ্ধে মরতে চলেছি, আমার যাত্রা এখন স্বর্গে, সেখানে আমার মৃত ভাইরা, ছেলেরা ও বন্ধুরা আছেন।'

দুর্যোধনের এই কথার সাথে সাথে আকাশ থেকে দেবতারা তাঁর ওপর পুষ্প বৃষ্টি করলেন। কৃষ্ণও তখন মৃত্যুপথ যাত্রী রাজার সম্মানে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করলেন।

পাণ্ডবেরা দুঃখে মাথা নীচু করে রয়েছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, 'শত্রুর সংখ্যা যদি বেশী হয় এবং শক্তিও তাদের বেশী থাকে তাহলে যুদ্ধ জয়ের জন্য যে কূট কৌশল অবলম্বন করতে হয় আমি তা ই করেছি। যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি, এখন আমাদের বিশ্রামের সময়।'

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সামনে কৃষ্ণ

কৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের শিবিরে গেলে দুর্যোধনের অনুচরেরা হাতজোড় করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কৃষ্ণের আদেশে পাণ্ডবেরা সবাই রথ থেকে নামলেন এবং অর্জুন তাঁর রথ থেকে গাণ্ডীব ধনু ও তাঁর দুই অক্ষয় তূণ নামিয়ে নিলেন। তখনই সেই রথের ধ্বজে বসে থাকা দিব্য বানর অদৃশ্য হলো, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শুদ্ধ রথ পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। সবাই বুঝলেন জয়লাভের পর ঐ দিব্য রথ আর অস্ত্রের প্রয়োজন নেই।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, 'বাসুদেব, পুত্রহারা গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য দয়া করে তুমি একবার হস্তিনাপুরে যাও, আমি তাঁদের সামনে দাঁড়াতে পারবো না।'

কৃষ্ণ তখনই রথ নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

হস্তিনাপুরের রাজপুরীতে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। তারপর গান্ধারীকে বললেন, 'কল্যাণী, আপনার মত পুণ্যবতী নারী পৃথিবীতে নেই, অথচ আপনার উপদেশ-ও আপনার পুত্ররা শোনেনি। দুর্যোধনকে আপনি বারবার বলেছিলেন, "যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়" আপনার সেই কথাই আজ সফল হয়েছে। আমার অনুরোধ পাণ্ডবদের আপনি অভিশাপ দেবেন না। কারণ আমি জানি তপস্যার প্রভাবে আপনার এমন ক্ষমতা আছে যে চোখের আগুনে পৃথিবী পুড়িয়ে ফেলতে পারেন।'

গান্ধারী বললেন, 'কেশব তুমি যা বললে তার সবই সত্যি, কিন্তু আমার রাজপুরী এখন শতপুত্রের শোকাতুর বিধবাদের বুকফাটা হাহাকারে ভরে গেছে। তুমি আর পাণ্ডবেরাই এই হতভাগ্য অন্ধ রাজার অবলম্বন।'

এই বলে গান্ধারী আঁচলে মুখ ঢেকে কান্নায় যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলেন।

হঠাৎ কৃষ্ণের মনে হলো যে, নিশ্চয়ই অশ্বত্থামা কোন অসৎ বুদ্ধি করেছেন। তিনি এখানে আসবার আগে পাণ্ডবদের যোদ্ধাদের দেখে এসেছেন যুদ্ধ জয়ের আনন্দে মত্ত। অশ্বত্থামা এই সুযোগে ভয়ংকর কিছু করে বসবে ভেবে কৃষ্ণ তখনই গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝড়ের বেগে কুরুক্ষেত্রের পথে যাত্রা করলেন।

অশ্বত্থামার অভিষেক

কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা দূতের মুখে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের খবর শুনে রথ নিয়ে তাঁর কাছে এলেন।

অশ্বত্থামা তাঁকে দেখে কান্না ভেজা সুরে বললেন, 'হায় মহারাজ, সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়ে আজ তুমি একা এই নির্জন প্রান্তরে পড়ে থেকে মৃত্যুর জন্য পল গুণছো। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কৃষ্ণের সামনেই আমি আজ সমস্ত পাণ্ডব আর পাঞ্চালকে যমের বাড়ী পাঠাবো, তুমি আমাকে অনুমতি দাও।'

দুর্যোধন যন্ত্রণার মধ্যে ও খুশি হয়ে কৃপকে বললেন, 'আচার্য,

আমি অশ্বত্থামাকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করতে চাই, আপনি সব ব্যবস্থা করুন।'

অভিষেক শেষে অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে কৃপ ও কৃতবর্মার সাথে চলে গেলেন। আর দুর্যোধন রক্তাক্ত শরীরে সমন্ত পঞ্চকের সেই নির্জন প্রান্তরে শুয়ে রাত্রি কাটাতে লাগলেন, সম্পূর্ণ একা, নিঃসঙ্গ। সসাগরা পৃথিবীর রাজা, হস্তিনাপুরের মুকুট মনি দুর্যোধনকে রক্ষার ব্যবস্থা কেউ করলেন না।

সৌপ্তিক পর্ব

অশ্বত্থামার সংকল্প

কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা কিছুদূর গিয়ে এক গভীর বনে উপস্থিত হলেন। সেখানে দিঘীর ধারে বিরাট এক বট গাছের নীচে বসে তারা পূজা অর্চনা করলেন, ঘোড়াকে জল খাওয়ালেন, তারপর সেই গাছের নীচেই ঘুমোবার আয়োজন করলেন।

কৃপ ও কৃতবর্মা অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেও অশ্বত্থামার চোখে ঘুম এলো না। তিনি লক্ষ্য করলেন সেই বটগাছের ডালে হাজার হাজার কাক নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ একটা প্যাঁচা এসে ঘুমন্ত কাকদের ওপর হানা দিয়ে বহু কাককে মেরে ফেললো। কাকদের কালো পালকে গাছের নীচ ছেয়ে গেলো।

অশ্বত্থামা ভাবলেন, গভীর রাত্রে এই প্যাঁচা আমাকে শত্রু ধ্বংস করার উপায় বলে দিলো। যত অন্যায় আর অধর্মের কাজই হোক আমি আজ এই রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের শেষ করবো।

অশ্বত্থামা ঘুমন্ত কৃপ ও কৃতবর্মাকে জাগিয়ে তার সংকল্পের কথা

বললেন। তাঁর এই হীন সংকল্পের কথা শুনে কৃপ ও কৃতবর্মা লজ্জায় ঘৃণায় চুপ করে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁরা নানা যুক্তি ও উপদেশ দিয়ে অশ্বত্থামাকে বোঝাতে চাইলেন। বললেন, 'তুমি মহারথ দ্রোণাচার্যের ছেলে, এমন অন্যায় হত্যার কথা ভাবাও তোমাকে শোভা পায় না। আজ রাতে তুমি ঘুমোও, কাল সকালে আমরা সবাই মিলে হয় পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-দের বধ করবো না হয় নিজেরাই মরবো।'

অশ্বত্থামা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, ঘুমাবো। ঘুমহীন দুর্যো-ধন হয়তো এখনও কাতর আর্তনাদ করছেন, আর আমরা এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো? আপনারা শুনে রাখুন, আজ রাতেই আমি ধৃষ্ট-দ্যুম্নসহ সমস্ত পাঞ্চালদের হত্যা করবো। ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার শোকাতুর, অস্ত্রহীন বাবাকে বধ করেছিলো, আমিও বর্মহীন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর মত হত্যা করবো, যাতে সে স্বর্গে যেতে না পারে।'

মহাদেবের আবির্ভাব

মধ্যরাতে পাঞ্চালদের শিবিরের দরজায় এসে অশ্বত্থামা দেখলেন সূর্যের মত জ্যোতির্ময় এক পুরুষ সেখানে পাহারা দিচ্ছেন। তাঁর পরনে বাঘের চামড়া, গলায় দুলছে বিরাট একটি বিষধর সাপ, হাতে ত্রিশূল।

অশ্বত্থামা সেই পুরুষের দিকে নানারকম দিব্যঅস্ত্র ছুঁড়লেন, কিন্তু সেই আশ্চর্য পুরুষ সমস্ত অস্ত্রই গিলে ফেললেন। তখন অশ্বত্থামা ভয়ে ভক্তিতে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

এবার সূর্যের মত উজ্জ্বল পুরুষ হেসে বললেন, 'অশ্বত্থামা, আমি রুদ্র মহাদেব। কৃষ্ণের সম্মানেই আমি এতদিন পাঞ্চালদের রক্ষা করেছি। কিন্তু পাঞ্চালদের সময় শেষ হয়েছে, আজ তাদের জীবনেরও শেষ দিন।'

মহাদেব অশ্বত্থামার হাতে একটি খড়্গ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর সেই খড়্গ হাতে করে অশ্বত্থামা পেছনের দরজা দিয়ে পাঞ্চাল শিবিরে ঢুকলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর রাজসিক বিছানায় শুয়ে সুখে ঘুমাচ্ছিলেন। অশ্বত্থামা আচমকা লাথি মেরে তাঁকে জাগিয়ে এক পা তাঁর গলায় আর এক পা বুকের ওপর দিয়ে ভীষণ জোরে চাপতে লাগলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে বুকের ওপর ভীষণ চাপে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেলেন। তার-পর অশ্বত্থামাকে চিনতে পেরে বললেন, 'আচার্য পুত্র, আপনি আমাকে অস্ত্র দিয়ে হত্যা করুন, তাহলে আমি স্বর্গলোকে যেতে পারবো।'

অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গলায় গোড়ালীর চাপ দিয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে হত্যা করে মন্তব্য করলেন, 'গুরু হত্যাকারী কখনই স্বর্গলোকে যায় না।'

অশ্বত্থামার গর্জন শুনে পাঞ্চাল শিবিরের সকলেই জেগে উঠলো এবং তাঁকে প্রেতাত্মা ভেবে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। অশ্বত্থামা রথে চড়ে পাণ্ডব শিবিরের দিকে চললেন।

ওদিকে পাঞ্চাল শিবিরের কোলাহলে পাণ্ডব-শিবিরের অনেকেই জেগে উঠেছে। তাদের মধ্যে যারাই বাধা দিতে এলো তারাই অশ্ব-ত্থামার হাতে প্রাণ দিলো। সেই ভীষণ রাত্রে অশ্বত্থামার খড়্গের আঘাতে দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভাই শিখণ্ডী এবং শিবিরের সমস্ত নিরস্ত্র সৈন্য নিহত হলো। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব আর সাত্যকি

দুর্যোধনের শিবিরে রাত্রি যাপন এবং কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন বলে রুদ্রের খড়্গ হাতে অশ্বত্থামা তাঁদের খোঁজ পেলেন না।

রাত শেষ হবার অনেক আগেই অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরের সমস্ত সৈন্য, হাতি ঘোড়া বধ করে বেরিয়ে এসে দেখলেন, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা সেখানে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, আমার সংকল্প সফল হয়েছে, এখন চলুন, রাজা দুর্যোধনকে এই খবর দিই, হয়তো এতে তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তটুকু মধুর হয়ে উঠবে।

দুর্যোধনের মৃত্যু

অশ্বত্থামা যখন তাঁর দুই সঙ্গীকে দুর্যোধনের কাছে এলেন তখনও ভীষণ যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন অবস্থায় দুর্যোধন বেঁচে আছেন। তিনি রক্তবমি করছেন এবং খুব কষ্টে মাংসলোভী জন্তুদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন।

কৃপাচার্য দুর্যোধনের বহু দোষ সত্ত্বেও তাঁকে স্নেহ করতেন, আজ এই নির্জন অন্ধকারে তাঁর এই অবস্থা দেখে বৃদ্ধের বুক যেন ফেটে গেলো, তিনি শিশুর মত কেঁদে উঠলেন।

অশ্বত্থামাও করুণ বিলাপ করে বললেন, 'পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা, তুমি বীরের মৃত্যুবরণ করছো, তোমার জন্য শোক করবো না। আমরা হতভাগ্য তাই বেঁচে থেকে চরম দুঃখ ভোগ করছি। রাজা, তুমি স্বর্গে গিয়ে আমার বাবা দ্রোণাচার্যকে বলো, আজ আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেছি। আর তুমিও এই আনন্দের খবর শুনে যাও, শত্রুপক্ষে কেবল পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ আর সাত্যকি বেঁচে আছেন। আমাদের পক্ষে আমি,

কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা বেঁচে আছি। আজ মধ্যরাতে আমি দ্রৌপদীর পাঁচটি বীর ছেলে, ধৃষ্টদ্যুম্নের ছেলেদের সহ সমস্ত পাঞ্চাল সৈন্য, পাণ্ডব ও মৎস্য দেশীয় সৈন্য, হাতী, ঘোড়া অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ বিনাশ করেছি।

অশ্বত্থামার মুখে এই সংবাদ শুনে দুর্যোধনের জ্ঞান ফিরে এলো। তাঁর রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের মত করুণ হাসি ফুটে উঠলো। তিনি অশ্বত্থামার হাত ধরে বললেন, 'তুমি যা করেছো তা ভীষ্ম দ্রোণও পারেন নি। তোমার মঙ্গল হোক। স্বর্গে আমাদের আবার দেখা হবে।'

দুর্যোধনের দু'চোখ চিরঘুমে বুঁজে গেলো, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্রৌপদীর অনশন ব্রত

পরদিন প্রভাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে অশ্বত্থামার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের খবর দিলো। পুত্রশোকে আকুল হয়ে যুধিষ্ঠির মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বিলাপ করে বললেন, 'আজ আমরা সর্বহারা হলাম, আমাদের প্রাণের ধন রাজকুমারেরা স্বর্গে গেছেন, কিন্তু তাঁদের মা কৃষ্ণা, হায়! সেই দুঃখিনী কি করে এই মহাশোক সইবেন? নকুল তুমি তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।'

তারপর যুধিষ্ঠির অন্যদের সঙ্গে শিবিরে গিয়ে আপন সন্তান ও আত্মীয়দের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

নকুল উপপ্লব্য নগরে গিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে এলেন। তপস্যা ও মনোকষ্টে এমনিতেই দ্রৌপদীর শরীর ভেঙ্গে পড়েছিলো, তার ওপর এই দুঃসংবাদে তিনি ঝড়ের ঝাপটা লাগা লতার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ভীমসেন তাঁকে তুলে যুধিষ্ঠিরের কাছে আনলেন।

দ্রৌপদী কাঁদতে কাঁদতে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'সত্যবাদী রাজা, সত্য আর ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিজের ছেলেদের যমকে দান করে এখন সমস্ত পৃথিবীর রাজা হয়েছো। এখন কি আর তোমার সুভদ্রার নয়নমনি অভিমন্যুকে মনে পড়বে? মনে পড়বে কি আমার পাঁচটি তারার মত উজ্জ্বল ছেলেকে? আজ যদি তুমি পাপিষ্ঠ অশ্বত্থামাকে হত্যা না কর তাহলে আমি অনশনে মরবো।'

এই বলে দ্রৌপদী মাটিতে বসে অনশনে মরার প্রস্তুতি নিলেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাকে অনুনয় করে বললেন, 'কল্যাণী, তুমি বীরের কন্যা, বীরের স্ত্রী। তোমাকে এই শোক শোভা পায় না। তাছাড়া অশ্বত্থামা গভীর বনে চলে গেছেন, আমরা যদি তাঁকে বধ করি তুমি কি করে তা দেখতে পাবে?'

দ্রৌপদী বললেন, 'সবাই জানে অশ্বত্থামার মাথায় একটি সহজাত (জন্ম থেকে পাওয়া) মনি আছে, তাঁকে বধ করে সেই মনি নিজের মাথায় পরে যদি তুমি আমার সামনে আসতে পারো তাহলে আমি অনশন ত্যাগ করবো।'

তারপর দ্রৌপদী ভীম সেনকে বললেন, 'তুমি চিরদিন আমাকে রক্ষা করে এসেছো। আজ তুমি অশ্বত্থামাকে বধ করে আমার বুকের আগুন নিবিয়ে দাও।'

ভীমসেন তখনই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রথে চড়ে যাত্রা করলেন, নকুল হলেন তার সারথি।

ভীম ও নকুল চলে যাবার পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'রাজা, ভীমকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হলোনা। দ্রোণাচার্য তাঁর ছেলে অশ্বত্থামা এবং অর্জুনকে ব্রহ্মশির নামে এক ভীষণ অস্ত্র দিয়েছিলেন। ব্রহ্মশির এমন এক অস্ত্র যা দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করে দেওয়া যায়। দ্রোণের উপদেশ ছিল যে, "এই অস্ত্র কখনও কোন মানুষের ওপর ব্যবহার করবে না।" ধর্মরাজ, আপনারা যখন বনবাসে ছিলেন তখন একদিন অশ্বত্থামা দ্বারকায় এসে বলেছিলেন, বাসুদেব আমার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিয়ে তোমার সুদর্শনচক্র আমাকে দাও। তাঁর কথায় আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, তুমি আমার শংখ চক্র গদা সব নিয়ে যাও বিনিময়ে আমি কোন অস্ত্রই চাইনা। তখন অশ্বত্থামা চক্র নেবার জন্য বহুচেষ্টা করেও আমার এই সুদর্শন চক্র একচুলও নড়াতে পারলেন না, লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন। আমি বললাম, ব্রাহ্মণ, তুমি কেন এই চক্র চাও? অশ্বত্থামা উত্তর দিয়েছিলেন, মাধব আমি সুদর্শন চক্র দিয়ে যুদ্ধ করে তোমাকেই বধ করে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বীর হতাম। কিন্তু এখন দেখছি তা সম্ভব নয়।'

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে অশ্বত্থামার স্পর্ধার কথা শুনছিলেন। কৃষ্ণ বললেন, 'ধর্মপুত্র, আমি রথ প্রস্তুত করতে আদেশ দিয়েছি, এখনই আমরা ভীমকে রক্ষা করতে যাবো।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণ তাঁর গরুড় ধ্বজ রথে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে নিয়ে গঙ্গাতীরে ভীমের কাছে গেলেন। দেখলেন সেখানে অশ্বত্থামা সন্ন্যাসীর বেশে মহামুনি ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিদের সাথে বসে রয়েছেন। ভীম ধনুর্বাণ নিয়ে অশ্বত্থামার দিকে এগোতেই তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্র চালাবার উদ্দেশ্যে একটি কাশতৃণ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'পাণ্ডবেরা ধ্বংস হোক।'

চোখের পলকে সেই কাশতৃণে দাবানলের মত আগুন জ্বলে উঠে পাণ্ডবদের দিকে ছুটলো। কৃষ্ণ বললেন, 'অর্জুন! সব্যসাচী। এখনই তোমার ব্রহ্মশির অস্ত্র ব্যবহার কর।'

অর্জুন দেবতা ও গুরুজনদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললেন, 'অশ্বত্থামার, আমাদের এবং পৃথিবীর অন্য সবার মঙ্গল হোক।' তারপর তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্র ছুঁড়লেন। সেই অস্ত্র আগুনের ঢেউ নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটলো। তখন ব্যাসদেব ও নারদ সেই ভয়ংকর আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই অস্ত্র কোন বীর কখনও কোন মানুষকে মারার জন্য ব্যবহার করেন নি, তোমরা এ কাজ কেন করলে?'

অর্জুন হাত জোড় করে বললেন, 'অশ্বত্থামার অস্ত্র থামাবার জন্যই আমাকে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে, আমি অস্ত্র ফিরিয়ে নিচ্ছি, আপনারা সকলের মঙ্গলের জন্য যা দরকার তাই করুন।'

কিন্তু অশ্বত্থামার সেই অস্ত্র ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতা ছিলো না। ব্যাসদেব তাঁকে বললেন, 'তুমি যদি তোমার মাথার মনি পাণ্ডবদের দাও তাহলে সবার ক্ষমা পাবে ও শান্তিতে থাকবে।'

অশ্বত্থামা বললেন, 'প্রভু আমার এই মণি পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্নের চেয়ে মূল্যবান, তবু আমি তাই দেবো। তবে ব্রহ্মশির অস্ত্র ফিরিয়ে নেবার শক্তি আমার নেই। এই অস্ত্র আমি অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার গর্ভে যে শিশু আছে তার দিকে পাঠিয়ে দেবো।'

কৃষ্ণ বললেন, 'এক মহাঋষি উত্তরাও অভিমন্যুকে এই বর দিয়েছিলেন যে, কুরুবংশ ধ্বংস হবার পর উত্তরার পরীক্ষিৎ নামে এক ছেলে হবে, সেই ছেলেই হবে কুরুসম্রাট।'

অশ্বত্থামা বললেন, 'কৃষ্ণ তুমি যতই কুটবুদ্ধি খেলাও না কেন, আমার অস্ত্র ফিরবে না।'

কৃষ্ণ বললেন, 'পাপী, তুমি বহু পাপ করেছো, আবার শিশুহত্যা করতে চলেছো। ঠিক আছে, তোমার অস্ত্রে উত্তরার গর্ভের শিশুর মৃত্যু হোক, আমি আবার তাঁকে বাঁচিয়ে তুলবো। সে মহাবীর ও শ্রেষ্ঠ রাজা হয়ে ষাট বৎসর কুরুরাজ্য শাসন করবে। তবে শিশু হত্যার পাপে তুমি তিন হাজার বছর নির্জন বনে কুৎসিত রোগে ভুগে ভুগে বেঁচে থাকবে।'

অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের পায়ে পড়ে কেঁদে বললেন, 'প্রভু কৃষ্ণের কথাই আমি মেনে নিলাম, এখন থেকে আপনিই আমার সব।'

অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের হাতে মাথার মণি তুলে দিয়ে গভীর বনে চলে গেলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন।

ভীমসেন কুরুক্ষেত্রে ফিরে এসে দ্রৌপদীর হাতে মণি দিয়ে বললেন, 'বনবাসে থাকার সময় তুমি কৃষ্ণকে একদিন বলেছিলে তোমার কেউ নেই, সে কথা মনে পড়ে? কিন্তু তোমাকে নগ্ন উরু দেখিয়ে অপমান করেছিলো বলে আমি দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করেছি, তোমার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দুঃশাসনের বুকচিরে রক্ত পান করেছি, অশ্বত্থামাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছি এবং তার মাথার মনি এনেছি। এখনও কি তুমি বলবে তোমার কেউ নেই?'

দ্রৌপদী লজ্জিত হয়ে ভীমকে প্রণাম জানালেন। তারপর যুধিষ্ঠির-কে অশ্বত্থামার মণি মাথায় পরতে অনুরোধ করলেন।

যুধিষ্ঠিরের মাথায় সেই দিব্য মণি যেন পর্বতের চূড়ায় চাঁদের মত অপরূপ সুন্দর হয়ে উঠলো।

স্ত্রী-পর্ব

ধৃতরাষ্ট্রের শোক

শতপুত্রের শোকে ধৃতরাষ্ট্র মাটিতে পড়ে বিলাপ করে বারবার বলতে লাগলেন, 'আমি কেন বেঁচে আছি? আমার চোখে দৃষ্টি নেই, পুত্র নেই, বন্ধু নেই, আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ হবে?'

বিদুর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মহারাজ ধৈর্য ধরুন, সব মানুষকেই একদিন মরতে হবে। আপনার ছেলেরা সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয়ে পুণ্য লোকে দেবতাদের সাথে স্বর্গ সুখে আছেন। শোক কখনও মানুষকে শান্তি দেয় না, মৃত মানুষকে ফিরিয়েও দেয় না।'

ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে তাঁকে বহু উপদেশ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ঠিক করলেন যে, রাণী গান্ধারী, কুন্তী এবং রাজপুরীর বিধবা বধুদের নিয়ে বিদুরের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে যাবেন।

হাজার হাজার শোকাতুর নারী পুরুষ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের পথে চলতে লাগলো। পঞ্চপাণ্ডব জানতে পারলেন শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র ও পুত্রহারা গান্ধারী দেবী আসছেন। তাঁরা কৃষ্ণ, সাত্যকি ও

দ্রৌপদীকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। পথের মধ্যেই তাঁদের ধৃতরাষ্ট্রদের সাথে দেখা হয়ে গেলো।

পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলে তিনি শুকনো ও বিরক্ত মুখে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করলেন এবং 'ভীম কোথায়? ভীম আমার বুকে এসো' বলে ভীমকে ডাকতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট ইচ্ছা বুঝতে পেরে কৃষ্ণ চট্ করে ভীমকে সরিয়ে দিয়ে ভীমের মতই একটি বিরাট লোহার মূর্তি ধৃতরাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ অন্ধরাজা সেই লোহার মূর্তিকেই ভীম ভেবে লক্ষ হাতির শক্তি নিয়ে ভীষণ জোরে বুকে চেপে পিষে মারতে চেষ্টা করে সেই মূর্তিকেই ভেঙ্গে ফেললেন। বুকে চাপ লাগার ফলে তাঁর মুখ থেকে গলগল রক্ত বেরিয়ে এলো, তিনি মাটিতে পড়ে 'হায় ভীম! হায় ভীম!' বলে আর্তনাদ করতে লাগলেন।'

কৃষ্ণ বললেন, 'রাজা, ভীমের জন্য শোক করার দরকার নেই। আপনি ভীমকে হত্যা করতে পারেন নি। আপনার ছেলে দুর্যোধন ভীমের একটা লোহার মূর্তি তৈরী করিয়ে রোজ সেটিকে গদা দিয়ে মারতেন। আপনি সেই মূর্তিটিকেই ভেঙ্গেছেন। কিন্তু মহারাজ, আপনি বৃদ্ধ এবং পুত্রহারা হয়েও এখনও পর্যন্ত হিংসা ত্যাগ করতে পারলেন না? ভীমকে হত্যা করলেই যে আপনার ছেলেরা বেঁচে উঠবেনা, বরং আপনারই মহাপাপ হবে এটা কেন বুঝছেন না? আপনার ছেলে দুর্যোধন মহাপাপী জেনেও আপনি তাঁর ইচ্ছাতেই চলেছেন।'

ধৃতরাষ্ট্র দুঃখে লজ্জায় মাথা নীচু করে বললেন, 'কেশব, তোমার কথাই সত্যি। আমি আজ থেকে সমস্ত হিংসা ত্যাগ করলাম। ভীমকে আমি বুকে নিতে চাই। আজ থেকে পঞ্চপাণ্ডবই আমার ছেলে।'

এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডবকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রানী গান্ধারী চিরদিন স্বামীর জন্য শ্রদ্ধা ও ও মমতায় নিজের চোখকে কাপড়ে ঢেকে রেখে অন্ধের মতই জীবন কাটিয়েছেন বলে দেবতার আশীর্বাদে তিনি এমন দৃষ্টি পেয়েছেন যে ইচ্ছা করলে চোখের আগুনে সবকিছু পুড়িয়ে দিতে পারেন।

গান্ধারী মনে মনে যুধিষ্ঠিরকে চোখের আগুনে পুড়িয়ে মারবেন বলে ঠিক করেছেন জেনে মহামুনি ব্যাস তাঁর সামনে এসে বললেন, 'কল্যাণী, মনে করে দেখো যুদ্ধের সময় প্রতিদিন তুমি দুর্যোধনকে আশীর্বাদ করে বলতে, পুত্র যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। তোমার সেই কথাই কি ফলে নি? তবে কেন তুমি যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে চাও? এতে তুমি কি মহাপাপিষ্ঠা হবে না?'

গান্ধারী কান্নায় ভেঙ্গে বললেন, 'ভগবান, পুত্রশোকে আমি পাগলের মত হয়ে গেছি। আমি জানি আমার ছেলেরা নিজেদের দোষেই ধ্বংস হয়েছে, তবু আমি কি করে ভীমকে ক্ষমা করি? কি করে মেনে নেই বাসুদেবের সামনেই ভীম দুর্যোধনের নাভির নিচে গদার আঘাত করেছে, কি করে সে অনার্য রাক্ষসের মত আমার ছেলে দুঃশাসনের রক্ত পান করলো? এ কোন ধর্ম?'

ভীম দু'হাত জোড় করে গান্ধারীর কাছে এসে বললো, 'মা! ধর্ম অধর্ম যাই হোক আমি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই এসব করেছি, এবং কেন আমি এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ত-ও আপনি জানেন।'

গান্ধারী বললেন, 'কিন্তু আমার একশো ছেলের একজনকেও কি তোমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারতে না? কোথায় রাজা যুধিষ্ঠির? ভাগ্যবতী কুন্তীর ছেলে পৃথিবীর সম্রাট ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোথায়?' যুধিষ্ঠির হাত

জোড় করে গান্ধারীর পায়ের কাছে বসে বললেন, 'মা! আমিই আপনার পুত্রদের হত্যাকারী যুধিষ্ঠির। আমার বুকে শোকের আগুন জ্বলছে, আপনি আমাকে অভিশাপ দিন।'

যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়ের ওপর নিচু হতেই গান্ধারী চোখের আবরণের একচুল ফাঁক দিয়ে যুধিষ্ঠিরের আঙুলের ডগা দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রুপালি ঝিনুকের মত সুন্দর নখগুলো পুড়ে কয়লার মত কালো হয়ে গেলো।

এরপর কৃষ্ণ অর্জুনকে গান্ধারীর কাছে নিয়ে এলেন। ততক্ষণে গান্ধারীর রাগ কমে এসেছে। তিনি মায়ের মত স্নেহের সাথে পাণ্ডবদের সাথে কথাবার্তা বললেন।

গান্ধারীর অভিশাপ

ব্যাসের আদেশে কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব গান্ধারীকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন কৌরব বধুরা। সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র দেখে নারীরা শোকে ভয়ে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে রথ থেকে নামলেন।

গান্ধারী দূর থেকেই তাঁর অসাধারণ চোখ দিয়ে সেই ভয়ংকর রণক্ষেত্র দেখতে দেখতে কৃষ্ণকে বললেন, 'হৃষিকেশ দেখো, আমার পৃথিবীর রাজা ছেলে দুর্যোধন তার গদাটি বুকে নিয়ে রক্তের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তার বিধবা স্ত্রী, আহা! কি বুক ফাটা কান্না নিয়ে স্বামীর বুকে আছড়ে পড়েছে। আমার ছেলেদের মৃত্যুর চেয়েও

এই স্বামী পুত্রহারা বিধবা বধুদের শোকই এখন আমাকে বেশী কষ্ট দিচ্ছে। দেখো, ওরা কেউ কেউ স্বামীর মাথাহীন লাশ দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কেউ কেউ স্বামীর লাশের ওপর থেকে হিংস্র শকুন, শেয়াল কুকুরদের তাড়াতে চেষ্টা করছে। কৃষ্ণ, এই শোক কি শুধু আমার একারই? তুমি কি তোমার বোন সুভদ্রার কান্না শুনতে পাচ্ছো না? চেয়ে দেখো, অভিমন্যুর গর্ভবতী স্ত্রী উত্তরা তার স্বামীর অসাড় মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে বলছে, ওগো বীর, তুমি আমাদের মিলনের ছ'মাসের মধ্যেই চলে গেলে, বল, আমি তোমাকে ছাড়া কি করে বেঁচে থাকবো? ঐ দেখো, আমার স্বামীহারা মেয়ে দুঃশলা কিভাবে বিলাপ করছে, তার স্বামী জয়দ্রথের দেহ শেয়াল শকুন ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখে সে তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছে। ঐ যে দূরে চির পবিত্র মহা-জ্ঞানী ভীষ্ম তাঁর শরশয্যায় শুয়ে আছেন। দ্রোণাচার্যের বিধবা স্ত্রী তাঁর মৃত স্বামীর সেবা করছেন, ব্রাহ্মণ আর মুনিরা দ্রোণের জন্য চিতা তৈরী করছেন। মাধব দেখো, সমস্ত সর্বনাশের মূল আমার ভাই কুটিল শকুনির দেহ কিভাবে শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ছে, ঐ পাপিষ্ঠও সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গে যাবে।'

হঠাৎ গান্ধারী কান্নায় ফেটে পড়ে বললেন, 'মধুসূদন কৃষ্ণ। কেন তুমি এই যুদ্ধ হতে দিলে? আসলে পাণ্ডবদের জন্য তুমি ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে কৌরবদের এই সর্বনাশ ঘটালে। শোন কেশব, অন্ধ স্বামীর সেবা করে আমি যে অলৌকিক শক্তি পেয়েছি তার ক্ষমতায় তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, আজ থেকে ছত্রিশ বছর পর আত্মীয়হীন, বন্ধুহীন, পুত্রহীন অবস্থায় অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে তোমার মৃত্যু হবে। তোমাদের যদুবংশের মা এবং বধুরা ঠিক এই বিধবাদের মতই মাটিতে লুটিয়ে কাঁদবে।'

কৃষ্ণ গান্ধারীর কথা শুনে মৃদু হাসলেন। গান্ধারীর দিকে তাঁর নীল পদ্মের পাপড়ির মত দুই চোখ মেলে বললেন, 'দেবী, আমি আমার নিয়তির কথা সবই জানি। আপনি অভিশাপে যে কথা উচ্চারণ করলেন আমার সে নিয়তি বহু আগেই ঠিক হয়ে আছে।'

কৃষ্ণের এই কথা শুনে পাণ্ডবেরা ভয়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু কৃষ্ণের সারা মুখে চাঁদের আলোর মত হাসি ছড়িয়ে রয়েছে।

কর্ণের জন্ম রহস্য প্রকাশ ও কুন্তীর শোক

যুধিষ্ঠিরের আদেশে পুরোহিত ধৌম্য, বিদুর ও সঞ্জয় বহু লোকজন নিয়ে চন্দন ও অগরু কাঠ, ঘি, সুগন্ধ তেল ও ধূপ ধুনা ইত্যাদি দিয়ে হাজার হাজার চিতা তৈরী করলেন। পাণ্ডবেরা সেই সব চিতায় শত্রু মিত্র সমস্ত বীরযোদ্ধাদের ও সৈন্যদের দাহ করলেন।

তারপর পঞ্চপাণ্ডব ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে রেখে গঙ্গানদীর তীরে গিয়ে বীরদের বিধবাদের সাথে তর্পন (মৃতের আত্মার শান্তির জন্য পূজা) করলেন।

হঠাৎ কুন্তী দেবী কান্নায় ফেটে পড়ে বললেন, 'আমার ছেলেরা শোন, অর্জুন যাকে হত্যা করেছে, তোমরা যাঁকে 'সূত পুত্র' ও 'রাধেয়' বলে ছোট চোখে দেখতে সেই বীর কর্ণ রাধার পুত্র 'রাধেয়' নয়, সে আমার ছেলে, কুন্তীর পুত্র কৌন্তেয়। কর্ণ তোমাদের সবচেয়ে বড় ভাই। সে সূর্যের আশীর্বাদে আমার পেটে জন্মেছিলো। তাকে অধিরথ ও রাধা শুধু পালন করেছে মাত্র।'

কর্ণের এই জন্ম বৃত্তান্ত শুনে পাণ্ডবেরা শোকে অধীর হলেন। যুধিষ্ঠির হাহাকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মা! যাঁর বীরত্বে আর শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের গৌরব আকাশ ছোঁয়া হতে পারতো, তাঁকে কেন আপনি গোপন রেখেছিলেন? আজ আমরা অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর ছেলের জন্য যে শোক পেয়েছি তার চেয়েও বেশী দুঃখে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে কর্ণের জন্য। হায়! তাকে যদি আমরা ভাই হিসাবে পেতাম তাহলে এই এই সর্বনাশা যুদ্ধ হতো না।

শান্তি পর্ব

যুধিষ্ঠিরের শোক

মৃত আত্মীয়দের তর্পনের পর পাণ্ডবেরা শোক পালনের জন্য আরও একমাস গঙ্গাতীরে রইলেন। এই সময়ে মহামুনি ব্যাস, দেবর্ষি নারদ এবং আরও বহু মহর্ষি ও দেবর্ষিরা এসে তাঁদের ধর্মের বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

গঙ্গার শান্ত তীর, যুদ্ধের কোলাহল নেই, মৃত্যু নেই, কলহ নেই। তবু যুধিষ্ঠিরের বুকের ভেতর সর্বক্ষণ শোকের আগুন জ্বলছে। যেদিন থেকে তিনি জানতে পেরেছেন কর্ণ তাঁদের বড় ভাই সেদিন থেকে তাঁর বুকের ভেতর দুঃখের ঝড় বইছে। তিনি সর্বক্ষণ এই ভেবে চোখের জল ফেলেন যে, কর্ণকে 'সূত বংশীয়', 'নীচ বংশীয়' বলে কত অপমান করেছেন। কর্ণকে যখন অর্জুন হত্যা করে তখন কি ভয়ানক আনন্দে তিনি ফেটে পড়েছিলেন, এই স্মৃতি তাঁকে যন্ত্রণা দেয়।

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের মনোকষ্টের কারণ বুঝতে পেরে তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, অনেক বুঝালেন।

কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বাবা, আমি এবং সূর্যদেব কর্ণকে অনেক অনুরোধ করেও তোমাদের ভাই বলে স্বীকার করাতে পারিনি। সে কখনই ক্ষত্রিয়ের গৌরবের লোভ করেনি।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মা, কর্ণের পরিচয় গোপন রেখে আপনি আমাদের সকলের দুঃখের কারণ ঘটিয়েছেন।'

তারপর যুধিষ্ঠির অভিশাপ দিলেন, আজ থেকে নারী জাতি কোন কথাই গোপন রাখতে পারবে না।

যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ডেকে বললেন, 'ভাই ধনঞ্জয়, এই যুদ্ধের আসল বীর এবং নায়ক তুমিই ছিলে। আমার অনুরোধ এই রাজ্য তুমি শাসন কর, আমি বনবাসে গিয়ে তপস্যায় জীবন কাটাবো বলে ঠিক করেছি।'

অর্জুন বিরক্ত হলেও হাসিমুখে বললেন, 'সারা পৃথিবী জয় করে এখন আপনি বনের ভেতর লুকিয়ে থাকতে চান। তার চেয়ে আপনি যজ্ঞ করুন, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও কাজ করুন।

ভীম রেগে উঠে বললেন, 'চমৎকার! আমাদের যুদ্ধের রক্তসাগর পার করিয়ে এখন বুঝি নিজে বনে গিয়ে শান্তিতে অলস জীবন কাটাতে চান?'

দ্রৌপদী নকুল-সহদেবও যুধিষ্ঠিরকে নানাভাবে বোঝালেন।

মহামুনি ব্যাসদেবের কাছে যুধিষ্ঠির চোখের জলে ভেসে বললেন, 'ভগবান, আমারই দোষে আমাদের পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় পড়ে আছেন, আমি মিথ্যা বলেছি বলে আমার গুরু দ্রোণ নিহত হয়েছেন, বড় ভাই কর্ণকে আমি হত্যা করিয়েছি, বালকবীর অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পাঁচটি তরুণ ছেলে আমার রাজ্যলাভের জন্যই প্রাণ দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ সৈন্য মরেছে, কত নিরীহজীবন নষ্ট হয়েছে। ঘরে ঘরে স্বামীহারা পুত্রহারা নারীদের কান্নার রোল উঠেছে। আমার চেয়ে

পাপী জগতে আর কে আছে ? ভগবান, অনুমতি করুন অনশনে আমি নিজের শরীরকে শেষ করি।'

ব্যাসদেব বললেন, 'ধর্ম পুত্র, তোমার উচিত পিতামহ ভীষ্মের কাছে গিয়ে উপদেশ নেওয়া। তবে তার আগে হস্তিনাপুরে গিয়ে রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়া দরকার, কারণ প্রজারা তোমারই আশায় পথ চেয়ে রয়েছে।'

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের কথায় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মুখে রেখে মহাধূমধামে হস্তিনাপুরে এলেন।

রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠির দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করলেন। তারপর খুশি মনে সোনার সিংহাসনে পূর্বদিকে মুখ করে বসলেন। তাঁর সামনে কৃষ্ণ ও সাত্যকি এবং দুই পাশে ভীম ও অর্জুন আসন নিলেন। মা কুন্তী তাঁর দুই ছোট ছেলে নকুল ও সহদেবকে নিয়ে সোনার নকসা আঁকা হাতির দাঁতের আসনে বসলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র জীবিত ছেলে যুযুৎসু ও সারথি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কাছে বসলেন।

এরপর কৃষ্ণের কথামত পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে বাঘের চামড়ায় ঢাকা একটি আসনে বসিয়ে অভিষেকের কাজ শুরু করলেন। বাসুদেব পাঞ্চজন্য শংখ থেকে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার মাথায় জল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করলেন, ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের মাথায় শান্তির জল ছিটিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মণেরা স্বস্তি ও জয়ধ্বনি করে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন।

ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করা হলো। নগরবাসী ও বিভিন্ন গ্রামবাসীরা আনন্দ ভরা মনে ঘরে ফিরে গেল। তারপর যুধিষ্ঠির ভীমকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করলেন। বিদুরকে মন্ত্রণা,

সঞ্জয়কে আয় ব্যয় দেখাশোনা ও নকুলকে সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। অর্জুনকে দিলেন শত্রু দমন ও দুষ্ট দমনের দায়িত্ব, সহদেব রইলেন রাজার রক্ষাকর্তা হয়ে।

সবশেষে যুধিষ্ঠির বললেন, 'রাজ্যের সব কাজই করা হবে আমাদের পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি ও আদেশ মত, পুরোহিত ধৌম্যও এক হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ (বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পণ্ডিত) পাবেন ধনরত্ন ও আশ্রয়। যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদের পরিবারগুলির সমস্ত দায়িত্ব আমিই নিলাম।'

এরপর মনে গভীর শান্তি নিয়ে যুধিষ্ঠির মাধবকে সঙ্গে করে ভীষ্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ভীষ্মের মৃত্যুর একটুক্ষণ আগে পর্যন্ত প্রতিদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নিয়ে তাঁর পাশে বসে উপদেশ শুনলেন। সে সময় দেবর্ষি নারদ, মহামুনি ব্যাসদেব ও ধৃতরাষ্ট্রও সেখানে বসে মহামানব ভীষ্মের অমৃত-বাণী শুনতেন।

অনুশাসন পর্ব

ভীষ্মের স্বর্গে গমন

মৃত্যুর কিছুদিন আগে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'প্রিয় যুধিষ্ঠির, তুমি আমার হৃদয়ের ধন, আমার উপদেশ তুমি এখন নগরে ফিরে যাও। প্রজাদের জন্য কল্যাণজনক কাজ কর, যজ্ঞ কর, দান ধ্যান করে তোমার মৃত আত্মীয় পরিজনদের আত্মার তৃপ্তি দান কর। সূর্যের উত্তরায়ন শুরু হলে আমার মৃত্যুর সময় হবে, তখন তুমি আমার পাশে থেকো।'

যুধিষ্ঠির পিতামহকে প্রণাম করে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং নানা রকম পুণ্যকাজ ও প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে মনের দুঃখের ভার কমালেন। তারপর সূর্যের উত্তরায়নের কাল (সূর্যের পথ যে সময়ে ক্রমশঃ উত্তর দিকে সরতে থাকে) শুরু হলে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে যাবার জন্য তৈরী হলেন। পিতামহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রচুর চন্দন ও অগরু কাঠ, ঘি, ফুলের মালা, রেশমের কাপড় ইত্যাদি কুরুক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী কুন্তী ও ভাইদের নিয়ে, পুরোহিতদের সামনে রেখে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ, বিদুর,

সাত্যকি ও যুযুৎসু ও তাঁদের সাথে গেলেন।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তাঁরা দেখলেন ব্যাসদেব, নারদ ও অন্যান্য দেবর্ষিরা ভীষ্মের কাছে বসে আছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে রাজারা এসেছেন ধর্মপ্রাণ বীর ভীষ্মকে শেষ বিদায় জানাতে।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রণাম করে বললেন, 'পিতামহ, আমি যুধিষ্ঠির, আপনার জন্য আগুন নিয়ে ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছি, আপনার শেষ যাত্রার সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রভু, চোখ মেলে একবার আমাদের সবাইকে দেখুন।'

ভীষ্ম চোখ মেলে সবাইকে দেখলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের হাত ধরে বললেন, 'তুমি বড় শুভ সময়ে এসেছো। আমি আটান্ন দিন এই তীক্ষ্ণ শর শয্যায় শুয়ে আছি, মনে হচ্ছে যেন একশো বছর কেটে গেছে। এখন মাঘ মাসের তিন ভাগ বাকী রয়েছে, শুক্ল পক্ষের সময় চলছে।'

ভীষ্ম ক্লান্ত হয়ে চুপ করলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে কাছে ডেকে বললেন, 'তুমি জ্ঞানী এবং ধার্মিক, তুমি কেন শোক করবে? পাণ্ডবেরা তোমার ছেলে, যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধর্মপুত্র, ন্যায়নিষ্ঠ ও পবিত্র। সে চিরদিন তোমাকে মেনে চলবে। তোমার ছেলেরা ছিলো পাপী, হিংসুক ও নির্বোধ তবু সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তারা স্বর্গে গেছে। তাদের জন্য শোক কোর না।'

তারপর ভীষ্ম কৃষ্ণকে বললেন, 'হে শংখ, চক্র গদাধর ভগবান, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাকে মুক্তি দাও ও পাণ্ডবদের রক্ষা করো। বাসুদেব, আমি দুর্যোধনকে বলেছিলাম, যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষে ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কিন্তু মূর্খ আমার কথা শোনেনি বলে আজ পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের সঙ্গে নিয়ে সে নিজেও মরেছে।

মাধব, আমি এখন এই শরে বেঁধা দেহ ত্যাগ করে চলে যাবো, তুমি আদেশ কর যেন পরম গতি লাভ করি।'

কৃষ্ণ বললেন, 'জাহ্নবী পুত্র ভীষ্ম, মৃত্যু এখন আপনার পায়ের তলে ভৃত্যের মত পড়ে আছে, আমি অনুমতি দিচ্ছি আপনি স্বর্গের যেখানে আপনার ভাই বসুরা আছেন সেই পুণ্যলোকে যাত্রা করুন। রাজর্ষি আপনি নিষ্পাপ, সূর্যের মত উজ্জ্বল ও তেজস্বী, আপনার যাত্রা শুভ হোক, সার্থক হোক।'

ভীষ্ম উপস্থিত সকলকে আশীর্বাদ করে চোখ বুজলেন। আস্তে আস্তে তাঁর দেহ থেকে সমস্ত ব্যথা দূর হলো, তাঁরপর তাঁর প্রাণ উল্কার মত আলো নিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হলো, স্বর্গীয় বাজনা ও সামগান শোনা গেলো, পৃথিবী সুগন্ধ বাতাসে ভরে গেলো।

ভীষ্মের স্বর্গ যাত্রার পর পাণ্ডবেরা বিদুরকে নিয়ে তাঁর জন্য চিতা তৈরী করে তাঁকে রাজকীয় সম্মানে দাহ করলেন। তারপর সকলে মিলে তাঁর তর্পণ করতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলে দেবীগঙ্গা জল থেকে উঠে এসে আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কৃষ্ণ, আমার ছেলে মহাজ্ঞানী ও বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে কেন নীচ শিখণ্ডীর হাতে মরতে হলো?'

কৃষ্ণ বললেন, 'দেবী জাহ্নবী, আপনার ছেলে শিখণ্ডীর হাতে মরেননি। ক্ষত্রিয় বীরের মত যুদ্ধ করে তিনি মহাবীর পার্থের হাতে আহত হয়েছিলেন, এরপর তিনি নিজের ইচ্ছায় স্বর্গে চলে গেছেন।'

গঙ্গাদেবী এই কথা শুনে হাসিমুখে জলের নীচে অদৃশ্য হলেন।

গঙ্গাচলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। পিতামহ ভীষ্মের নানা স্মৃতি তার মনকে তোলপাড় করতে লাগলো।

অশ্বমেধিক পর্ব

কৃষ্ণ ও ব্যাসের উপদেশ

যুধিষ্ঠিরের বালকের মত কান্না দেখে কৃষ্ণ বললেন, 'আপনি মহা-রথী এবং শ্রেষ্ঠ রাজা, এই অবুঝ কান্না আপনাকে মানায় না। এর চেয়ে মনকে শান্ত করে যজ্ঞ, পূজা এবং দান ধ্যান করুন, সেটাই আপনার জন্য উপযুক্ত কাজ।'

যুধিষ্ঠিরের মাথায় হাত রেখে ব্যাসদেব বললেন, 'তুমি তো চির-কাল ধীর স্থির, আজ এমন অধীর হলে কেন?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'প্রভু, পিতামহ ভীষ্ম যে আমারই জন্য আটান্ন দিন কাঁটার শয্যায় কাটিয়ে গেলেন একথা আমার বুকে কাঁটার মতই বিঁধছে। দাতা শ্রেষ্ঠ কর্ণ আমারই জন্য মরেছেন। এসব কথা যতই ভাবছি মনে হচ্ছে আমার মত পাপী আর কেউ নেই।'

ব্যাসদেব বললেন, 'নিজেকে যদি পাপী মনে কর তাহলে তপস্যা ও যজ্ঞ করে মনকে শান্ত কর। তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাপমুক্ত হও।'

যুধিষ্ঠির একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে

রাজারা পাপমুক্ত হন একথা আমি শুনেছি। কিন্তু এই মহাযুদ্ধে আর রাজ্যভার নেবার সময় দান দক্ষিণা পূজা ইত্যাদিতে আমার রাজকোষ শূন্য হয়ে গেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ করার বিরাট খরচের ব্যবস্থা আমি কি করে করবো?'

ব্যাসদেব উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, সব মহৎ কাজই সফল হবার পথ খুঁজে নেয়। তোমার রাজকোষও পূর্ণ হবে। বহুকাল আগে মহারাজা মরুও যে বিরাট পরিমাণ সোনা ও ধনরত্ন ব্রাহ্মণদের দিয়েছিলেন তার সবই হিমালয়ে রয়ে গেছে। তুমি সেই সোনা নিয়ে আসবার ব্যবস্থা কর।'

ব্যাসদেবের উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য তৈরী হতে লাগলেন। যুযুৎসুকে রাজ্যের ভার দিয়ে পুরোহিত ধৌম্য ও ভাইদের নিয়ে সোনা আনবার জন্য হিমালয়ে যাত্রা করলেন। তাঁদের সাথে গেলো বিরাট সৈন্যদল, মজুর ও বহু যানবাহন।

হিমালয়ের ঠিক জায়গাতে পৌঁছে যুধষ্ঠির তাঁবু ফেলবার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি বহু ফুল ও প্রসাদ দিয়ে মহেশ্বর শিবের পূজা করলেন। তারপর ধনদৌলতের দেবতা যক্ষরাজ ও কুবেরকে পূজা দিলেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে সৈনিক ও মজুরদের আদেশ দিলেন পর্বতের মাটি ও পাথর খুঁড়ে সোনা ইত্যাদি তুলতে।

কয়েকদিন ধরে প্রচুর সোনা ও ধনরত্ন তোলা হলো। সেইসব ধনরত্ন হাজার হাজার উট, হাতি, ঘোড়া, গাধা এবং গরু ও ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চাপিয়ে, পঞ্চপাণ্ডব রথে চড়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। ধনসম্পদের পরিমাণ এত বেশী ছিলো, বিশেষ করে সোনার ভার এত বেশী ছিলো যে দুই ক্রোশ চলার পরই যানবাহন গুলোকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে হচ্ছিল।

পরীক্ষিতের জন্ম

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় হলে কৃষ্ণ তাঁর ভাই বলরাম ও গদকে নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। তাঁদের সঙ্গে এলেন সুভদ্রা, কৃষ্ণের তিন ছেলে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও শাম্ব। সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরেরাও এলেন আমন্ত্রণ পেয়ে।

সেই সময়ে উত্তরা মৃত শিশু পরীক্ষিতকে প্রসব করলেন। উত্তরার ছেলে হয়েছে এই খবর শোনামাত্র রাজপুরীর মহিলারা উলুধ্বনি করলেন ও শাঁখ বাজাতে লাগলেন। কিন্তু একটুক্ষণ পরই সবাই দুঃখে চুপ করে গেলেন। কারণ সবাই জেনে গেলেন যে উত্তরা মৃত শিশু প্রসব করেছেন।

এই খবর পেয়ে কৃষ্ণ সাত্যকিকে নিয়ে রাজ অন্তঃপুরে গেলেন। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা তাঁকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

কুন্তী বললেন, 'বাসুদেব তুমিই আমাদের একমাত্র গতি। পাপী অশ্বত্থামার অস্ত্রের জন্য উত্তরা মৃতছেলে প্রসব করেছে, তোমার ভাগনে অভিমন্যুর শেষ চিহ্নটুকুও আজ মুছে গেলো। অথচ অভিমন্যু উত্তরাকে বলেছিলো তার ছেলে কৃষ্ণের কাছে অস্ত্র বিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র শিখে কৃষ্ণের মতই অসাধারণ পুরুষ হবে। কেশব, তুমি তার আকাঙ্খা পূর্ণ কর।'

সুভদ্রা ভাইকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মাধব, এই দেখো পার্থের নাতি মৃতদেহ নিয়ে পড়ে আছে, তুমি থাকতে যদি এই শিশু

প্রাণ ফিরে না পায় তাহলে কি উপকার হবে আমাদের তোমাকে দিয়ে ? জলভরা মেঘ যেমন করে শুকনো গাছকে বৃষ্টি ঝরিয়ে সজীব করে, তেমনি করে তুমিও এই মৃত শিশুকে বাঁচিয়ে তোল।'

কৃষ্ণ কুন্তী ও সুভদ্রাকে আশ্বাস দিয়ে সূতিকা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। রাজবধুর সূতিকা ঘর সুগন্ধ শাদা ফুলের মালায় সাজানো, চারদিকে জলভরা সোনার কলসে আমের পল্লব শোভা পাচ্ছে। ঘি, গাব কাঠের কয়লা, সর্ষে, নতুন তৈরী অস্ত্র, আগুন ইত্যাদি শুভ জিনিস রয়েছে চারদিকে। প্রসূতির কাছে ধাত্রী ও বৈদ্যরা বসে আছেন।

দ্রৌপদী উত্তরাকে ডেকে বললেন, 'কল্যাণী চেয়ে দেখ তোমার শ্বশুর পরম দেবতা মধুসূদন এসেছেন।'

উত্তরা চোখ মেলে উঠে বসলেন। মৃত ছেলেকে কোলে নিয়ে করুণ স্বরে বললেন, 'প্রভু আমার মনে বড় আশা ছিলো ছেলেকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করবো, ছেলের মুখ দেখে স্বামীর শোক ভুলবো কিন্তু সে আশা মিথ্যা হলে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ।'

কৃষ্ণ বললেন, 'কল্যাণী তোমার আশা আমি পূর্ণ করবো।'

তারপর শ্রীকৃষ্ণ মৃত শিশুকে বললেন, 'আমি যদি সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকি, যদি যুদ্ধে পরাজিত না হয়ে থাকি, যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের চিরদিন মেনে চলে থাকি তাহলে এই শিশু প্রাণ ফিরে পাক।'

সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, 'বাসুদেবের কথা শেষ হবার পরপরই মৃত শিশুর দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেলো। শিশুর রূপের আলোয় সূতিকা ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উত্তরা ছেলেকে কোলে নিয়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। বধূ ও মেয়েরা আনন্দে উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে হৈ চৈ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ জানালেন, রাজ্যময় নাচ-গান ও বাদ্যবাজনার ধূম লেগে গেলো।

কৃষ্ণ নতুন শিশুকে আশীর্বাদ করে তাকে বহু ধন সম্পদ উপহার দিলেন ও তার নামকরণ করলেন পরীক্ষিৎ।

পরীক্ষিতের বয়স একমাস হলে পাণ্ডবেরা হিমালয় থেকে ফিরে এলেন। শিশুর ফুলের মত রূপ দেখে পঞ্চপাণ্ডবের মন আনন্দে ভরে গেলো। অর্জুন শিশুকে কোলে নিয়ে আনন্দে চোখের জল ঝরাতে লাগলেন। এই শিশু যেন অভিমন্যুর ছবি হয়ে ফিরে এসেছে তাঁর কাছে।

যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে অর্জুনের যাত্রা

যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হবার পর ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ধর্মপুত্র, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বহু ধনরত্ন, রেশম বস্ত্র, বাছুরসহ গাভী ইত্যাদি দান কর। তাতে তোমার মন থেকে পাপের কালি মুছে যাবে।'

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, 'মাধব, তুমি আমার পরম গুরু, আমার ইচ্ছা এই যজ্ঞ আমার হয়ে তুমিই কর।'

কৃষ্ণ বললেন, 'তা হয় না মহারাজ। এ যজ্ঞ আপনারই যোগ্য, আমাকে আপনার সাহায্যকারী হিসেবে রাখুন।' যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথায় রাজী হলেন।

ব্যাসদেব বললেন, 'ধর্মপুত্র ঋষি পৈল, যাজ্ঞবল্ক্য ও আমি, আমরা তিনজন যজ্ঞের সব কাজ করবো। চৈত্র পুর্ণিমার পবিত্র রাত্রে তুমি যজ্ঞের জন্য দীক্ষা নেবে। তোমার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অশ্ব বিশেষজ্ঞকে

দিয়ে সবচেয়ে সুলক্ষণ যুক্ত ঘোড়াটিকে যজ্ঞের অশ্ব হিসাবে বেছে নাও। তারপর সেই অশ্ব মুক্ত হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে তোমার যশ ও গৌরব ছড়িয়ে দেবে। মহাবীর অর্জুন সেই ঘোড়াকে রক্ষা করে চলবেন। ভীমসেন ও নকুল সহদেব এখানে রাজ্য পরিচালনা ও যজ্ঞে যেসব অতিথি আসবেন তাঁদের দেখাশোনা করবেন। এক বছর পর অর্জুন সারা পৃথিবী ঘুরে যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে ফিরে এলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান শুরু হবে।'

ব্যাসের উপদেশ মত সমস্ত ব্যবস্থা করে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, 'কোন রাজার সাথে যুদ্ধ না হয় সেই চেষ্টা করবে এবং প্রতিটি রাজাকে আমার এই যজ্ঞে বিনীতভাবে নিমন্ত্রণ করবে। ভাই, মনে রেখো, আর যুদ্ধ নয়, রক্তপাত নয়। শান্তি আর ভালোবাসার জন্যই আমরা এই পবিত্র যজ্ঞের আয়োজন করেছি।'

চৈত্র পূর্ণিমার রাত্রে যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হয়ে সন্নাসীর বেশ পরলেন। রাজ্যের সবচেয়ে তেজী, বলবান, সাদা আর কালো রংয়ে মেশানো যজ্ঞের অশ্বটি ছেড়ে দেওয়া হলো, অর্জুন বকের মত ধবধবে সাদা একটি ঘোড়ায় চড়ে সেই ঘোড়ার পেছন পেছন চললেন। বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বীরও ঘোড়া এবং রথ নিয়ে অর্জুনের সাথে যাত্রা কয়লেন।

অর্জুন ও বভ্রুবাহন

অর্জুন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ত্রিগর্ত দেশে এলে সেখানকার রাজকুমারেরা যজ্ঞাশ্ব নেবার জন্য এলেন। ফলে তাদের সাথে অর্জুনের যুদ্ধ শুরু

হলো। যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাঁরা অর্জুনের কাছে ক্ষমা চেয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন। অর্জুন তাঁদের যজ্ঞের নিমন্ত্রণ জানিয়ে প্রাগ জ্যোতিষপুরে এলেন। প্রাগ জ্যোতিষপুরের মৃতরাজা ভগদত্তের ছেলে বজ্রদত্ত যজ্ঞের অশ্ব হরণ করলেন।

ঘোর যুদ্ধের পর বজ্রদত্ত পরাজিত হয়ে অর্জুনের কাছে ক্ষমা চাইলেন। অর্জুন তাঁকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করে অশ্বের সাথে সাথে সিন্ধু-দেশে এলেন।

সিন্ধুদেশের রাজারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়দ্রথের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু সব্যসাচীর যুদ্ধ কৌশলের কাছে তাঁরা অল্পক্ষণের মধ্যেই হেরে গেলেন।

রাজাদের পরাজয়ের কথা জানতে পেরে জয়দ্রথের ছেলে সুরথ আকস্মিক ভাবে মারা গেলেন। তখন জয়দ্রথের স্ত্রী দুঃশলা তাঁর বালক নাতিকে সঙ্গে করে অর্জুনের সামনে এলেন।

অর্জুন তাঁর বিধবা বোন দুঃশলাকে দেখে চোখের জলে ভেসে বললেন, 'দুঃশলা, তুমি কেন সুরথকে নিয়ে আমার কাছে এলে না, তাহলে তো আজ তুমি ছেলেকে হারাতে না।'

দুঃশলা তাঁর নাতিকে অর্জুনের পায়ের নীচে রেখে বললেন, 'পার্থ এই বালক তোমারও নাতি, তুমি জয়দ্রথ ও দুর্যোধনের পাপের কথা ভুলে গিয়ে একে দয়া কর।'

অর্জুন দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কল্যাণী, এ ছেলে আমার কাছে পরীক্ষিতের মতই আদরের ধন, তুমি একে রাজা হবার যোগ্য করে গড়ে তোল।'

এরপর যজ্ঞের অশ্ব ছুটতে ছুটতে অর্জুনের স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার দেশ মনিপুরে এলো। মনিপুরের রাজা বভ্রুবাহন তাঁর বাবা অর্জুন এসেছেন

শুনে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও মন্ত্রীদের নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন।

অর্জুন ছেলেকে দেখে খুশী হবার বদলে রেগে গেলেন এবং কঠোর ভাষায় বললেন, 'তোমার মা চিত্রাঙ্গদা আমাকে কথা দিয়েছিলেন তোমাকে দ্বিতীয় অর্জুন করে গড়ে তুলবেন। কিন্তু তুমি কেন কাপুরুষের মত হাত জোড় করে এলে? আমি তো মনিপুরে অতিথি হয়ে আসিনি, এসেছি রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে। তুমি যদি এই অশ্ব ধরতে এবং যুদ্ধে আমাকে আহ্বান জানাতে তাহলে আমি গৌরব বোধ করতাম।'

অর্জুনের কথার সাথে সাথে নাগরাজকন্যা উলুপী মাটি ভেদ করে উঠে বললেন, 'বাবা বভ্রুবাহন, আমি তোমার আর একজন মা উলুপী। তুমি তোমার মহাবীর বাবার সাথে যুদ্ধ কর, তাতে তিনি খুশি হবেন।'

তখন বভ্রুবাহন যুদ্ধের সাজে সেজে রথ ছুটিয়ে এসে যজ্ঞের অশ্ব ছিনিয়ে নিলেন। অর্জুন এবার খুশি হয়ে ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বভ্রুবাহনের শরের আঘাতে অর্জুন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বভ্রুবাহনও পিতাকে হত্যা করেছেন ভেবে শোকে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

খবর পেয়ে চিত্রাঙ্গদা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ছেলে ও স্বামীর অবস্থা দেখে উলুপীকে বললেন, 'নাগকন্যা, তুমি কি করে ছেলেকে দিয়ে স্বামীকে হত্যা করালে? আমি তোমার কাছে হাত জোড় করে অনুনয় করছি তুমি আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দাও, ছেলে নয়, স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা দাও।'

চিত্রাঙ্গদার কান্নায় বভ্রুবাহনের জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি অর্জুনকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে বললেন, 'আমি পিতাকে হত্যা

করেছি, এখন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।'

বভ্রুবাহনের সাথে সাথে চিত্রাঙ্গদাও আত্মহত্যার জন্য তৈরী হলেন।

তখন উলুপী অলৌকিক নাগমণি এনে বভ্রুবাহনের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই দিব্যমণির ছোঁয়ায় মৃতনাগেরা বেঁচে ওঠে। তুমি এই মণি পার্থের বুকের ওপর রাখো।'

বভ্রুবাহন অর্জুনের বুকের ওপর নাগমণি রাখতেই তিনি যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলেন। সামনে বীর ছেলেকে দেখে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর উলুপীকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'নাগ-কন্যা হঠাৎ তুমি এখানে কেন? আমাদের কি কোন অপরাধ হয়েছে?

উলুপী মিষ্টি হেসে বললেন, 'না ধনঞ্জয়, তোমাদের কোন অপরাধ হয়নি। তবে তুমি মহাভারত যুদ্ধে অধর্ম করে শিখণ্ডীর সাহায্যে জাহ্নবীর পুত্র ভীষ্মকে বধ করে যে পাপ করেছিলে তোমাকে সেই পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য জাহ্নবীর আদেশে আজ আমি ছেলের হাতে তোমার পরাজয় ঘটালাম। তোমাকে দেবরাজ ইন্দ্রও যুদ্ধে হারাতে পারেন না, কিন্তু ছেলে তো তোমারই অংশ তাই তার হাতে তোমার পরাজয় হয়েছে।'

অর্জুন উলুপীকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বভ্রুবাহনকে বললেন, আগামী চৈত্র পুর্ণিমায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। তুমি তোমার দুই মা ও মন্ত্রীদের নিয়ে যজ্ঞের নিমন্ত্রণে যেও।

বভ্রুবাহন অর্জুনকে সেই রাতটা মনিপুর রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু অর্জুনের বিশ্রাম নেবার সময়

নেই তিনি সবার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের দুধশাদা ঘোড়ায় চড়ে যজ্ঞের অশ্বের পেছনে ছুটলেন। এখনও তাঁকে আরও বহু পথ, বহু রাজ্য পার হতে হবে।

এরপর যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে অর্জুন মগধে এসে সেখানকার রাজা মেঘ সন্ধিকে পরাজিত করে যুদ্ধের নিমন্ত্রণ জানালেন এবং যজ্ঞের অশ্বের পেছনে পেছনে সমুদ্রের তীর দিয়ে বঙ্গ, পুণ্ড্র, কোশল ইত্যাদি দেশে গিয়ে সেখানকার ম্লেচ্ছদের যুদ্ধে পরাজিত করলেন।

অশ্ব এবার দক্ষিণের নানা দেশ ঘুরে চেদি রাজ্যে এলো। শিশুপালের ছেলে রাজা শরভ, কাশী, অঙ্গ, কোশল, কিরাত, ও তঙ্গন দেশের রাজারা অর্জুনকে মহাসম্মানের সাথে বরণ করে নিলেন। কিন্তু দশার্নের রাজা চিত্রাঙ্গদা ও নিষাদ রাজা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে পরাজিত হলেন।

অর্জুন আবার যজ্ঞের অশ্বের পেছনে পেছনে দক্ষিণ সমুদ্রের তীর ধরে চললেন এবং পথে দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মহিষক ও কোল্বগিরির বীরদের জয় করলেন। তারপর সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস রাজ্য পার হয়ে এলেন দ্বারকায়। যাদব রাজপুত্রেরা অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের রাজা উগ্রসেন ও কৃষ্ণের পিতা বসুদেব তাদের যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। তারপর সকলে একসাথে পার্থকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন।

পঞ্চনদ প্রদেশ পার হয়ে যজ্ঞের অশ্ব গান্ধার রাজ্যে এলো। অর্জুনদের চিরশত্রু শকুনির ছেলে তখন গান্ধারের রাজা। তিনি বহু সৈন্য নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। অর্জুনের শরের আঘাতে রাজার মাথার উষ্ণীষ উড়ে গেলে রাজা ভয়ে পালাতে লাগলেন। লক্ষ লক্ষ গান্ধার সৈন্য মরতে লাগলো। তখন গান্ধার রাজমাতা

(শকুনির স্ত্রী) ছেলেকে নিয়ে বহু মূল্যবান উপহার সহ অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

অর্জুন রাজাকে ক্ষমা করে তাঁর মা এবং রাজপুরীর সবাইকে আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় অশ্বমেধ যজ্ঞে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। তারপর তিনি যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ

মাঘ মাস। চাঁদের দ্বাদশী তিথির শুভলগ্নে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাইদের ডেকে পাঠালেন।

ভীম, নকুল ও সহদেব এলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, 'খবর পেয়েছি অল্পদিনের মধ্যেই অর্জুন ফিরে আসছেন। তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের অনুরোধ জানাও, যাতে তাঁরা যজ্ঞের জন্য জায়গা ঠিক করেন।'

প্রায় এক বছর পর যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে পৃথিবী জয় করে অর্জুন ফিরে আসছেন খবর পেয়ে সকলে খুশি হলেন। দ্রৌপদী অধীর আগ্রহে ধনঞ্জয়ের জন্য পথ চেয়ে রইলেন।

কয়েক ক্রোশ জায়গাকে যজ্ঞের জন্য ঠিক করা হলে রাজ-স্থপতিরা কয়েকশো প্রাসাদ, বাড়ী, চমৎকার সব পাথরের স্তম্ভ, তোরণ ও চওড়া রাস্তা ইত্যাদি তৈরী করে এক অপূর্ব সুন্দর পুরী সৃষ্টি করলেন।

বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত রাজারা তাঁদের রানীকে নিয়ে এলেন। তাঁদের সঙ্গে এলো হাতি, ঘোড়া, রাজ্যের অমাত্য ও

মন্ত্রীরা। এইসব রাজা ও রাজপুরুষদের থাকবার জন্য চমৎকার সব প্রাসাদ দেওয়া হলো এবং তাঁদের সবরকম আরাম আয়েসের ব্যবস্থাও করা হলো।

আমন্ত্রিত রাজারা নানারকম আমোদ-প্রমোদে মেতে রইলেন। চারদিকে ফুলে ভরা উপবন, উপবনে নানারকম সুন্দর সব জীবজন্তু আর রঙিন পাখির মেলা। প্রতিদিন কয়েক লক্ষ ব্রাহ্মণকে মহাসমারোহে খাওয়ানো চলছে। এইসব দেখে রাজারা রীতিমত অবাক হচ্ছেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'অর্জুন দ্বারকা থেকে দূতের মুখে খবর পাঠিয়েছেন যে, আমন্ত্রিত রাজা ও ব্রাহ্মণদের জন্য যথাসম্ভব সুন্দর ও রাজসিক ব্যবস্থা করতে যাতে তাঁরা আনন্দিত হন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মাধব আমি শুনেছি অর্জুন যেখানে গেছেন সেখানেই তাঁকে রাজাদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না, ধনঞ্জয় এত সৎ ও ধর্মপ্রাণ তবু কেন তাঁকে চিরকাল যুদ্ধের কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে?'

কৃষ্ণ দ্রৌপদীর দিকে হাসিভরা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ফালগুনি পুরুষ সিংহ আর তাঁর পায়ের গুলি বেশী শক্ত বলেই বোধহয় তাঁকে এত ভ্রমণ করতে হয় আর যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু আমার মনে হয় এটা শুভ লক্ষণই।'

কৃষ্ণের কথা শুনে সবাই হাসলেন এবং অনেকদিন পর হালকা কথাবার্তা ও হাসি রহস্যে কিছুটা সময় কাটালেন।

পরদিন অর্জুন যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। তোরণে তোরণে নহবৎ বাজতে লাগলো। অর্জুন একে একে ভাইদের ও কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন।

সেই দিনই মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন তাঁর দুই মা চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। অর্জুনের তরুণ ও রূপবান ছেলে বভ্রুবাহনকে দেখে পাণ্ডবেরা সবাই খুশি হলেন। বভ্রুবাহন গুরুজনদের প্রণাম করে তাঁর মায়েদের নিয়ে রাজ অন্তঃপুরে গিয়ে কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, ও সুভদ্রার সাথে দেখা করলেন। চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীকে তাঁরা খুব আদরের সাথে কাছে টেনে নিলেন।

কৃষ্ণ বভ্রুবাহনকে কুরুবংশের রাজপুত্রের যোগ্য চারটি তেজী কালো ঘোড়ার টানা মহামূল্যবান রথ উপহার দিলেন, যুধিষ্ঠির দিলেন বহু ধনরত্ন।

নির্দিষ্ট দিনে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'তুমি যজ্ঞ আরম্ভ কর এবং এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের তিনগুণ ধনসম্পদ দক্ষিণা দাও তাতে তোমার তিন অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হবে আর মন থেকে আত্মীয় হত্যার পাপের দুঃখ মুছে যাবে।'

এরপর ঋত্বিক ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের কাজ শুরু করলেন। বেল, খয়ের, পলাশ প্রভৃতি গাছের কাঠ দিয়ে শতশত যূপকাষ্ঠ (যে কাঠের যন্ত্রে পশু বলি দেওয়া হয়) তৈরী করা হলো। এছাড়াও শোভাবৃদ্ধির জন্য বহু সোনা ও রূপোর যূপ বসানো হলো। ত্রিভুজ আকারের বিশাল যজ্ঞ বেদীর চার জায়গায় আগুনের কুণ্ড তৈরী করার জন্য চন্দন অগরু প্রভৃতি সুগন্ধ কাঠ রাখা হলো।

ঋত্বিকদের আদেশে তিনশো পশু পাখি যূপকাষ্ঠে আটকানো হলো, সেই সঙ্গে যজ্ঞের ঘোড়াটিকেও যূপকাষ্ঠে আটকানো হলো।

সমস্ত পশুকে আগুনে উৎসর্গ করার পর যজ্ঞের ঘোড়টিকে ব্রাহ্মণেরা বধ করলেন এবং দ্রৌপদীকে সেই অশ্বের কাছে বসালেন। এরপর ব্রাহ্মণেরা সেই অশ্বের চর্বিগুলো আগুনে ফেলে পঞ্চপাণ্ডবকে

চর্বি পোড়া ধোঁয়ার ঘ্রাণ নিতে বললেন এবং অশ্বের শরীরের অংশগুলো আগুনে ফেলে দিলেন।

যজ্ঞশেষ হবার পর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের একহাজার কোটি স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিলেন এবং ব্যাসদেবকে দক্ষিণা দিলেন সমগ্র পৃথিবী।

ব্যাসদেব হাসিমুখে বললেন, 'মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা ধনরত্ন চায় তুমি পৃথিবীর বদলে আমাকে ধন দাও।'

যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে বললেন, 'ভগবান, অর্জুন আমাকে পৃথিবী জয় করে দিয়েছেন, আমি আপনাকে তাই দান করেছি। আপনি ইচ্ছা করলে তা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। এই পৃথিবী এখন ব্রাহ্মণের জন্য উৎসর্গীকৃত সম্পদ। আমি এখন বনবাসী হব, আমার এতে কোন অধিকার নেই।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে সবার মন শ্রদ্ধা ও আনন্দে ভরে গেল। আকাশ থেকে দেবতারা সাধুবাদ দিলেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁর জয়ধ্বনি করলেন।

ব্যাসদেব বললেন, 'তা হয় না রাজা, তুমি আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দাও আমি পৃথিবী ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

কৃষ্ণের উপদেশ মত যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে আগের চেয়ে কোটি কোটি গুণ সোনা দান করলেন। ব্যাস সেসবই ব্রাহ্মণদের দান করে দিলেন। যজ্ঞ ভূমির অন্যান্য সোনার জিনিষপত্র অলংকার, সোনার তোরণ, যুপ ইত্যাদি যা রইলো সবই সাধারণ লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো।

ব্রাহ্মণেরা তুষ্ট হয়ে বিদায় নিলেন। ব্যাসদেব যা ধনসম্পদ পেয়েছিলেন সবই কুন্তীকে উপহার দিলেন।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের সাথে নিয়ে অতিথি রাজাদের বহু উপহার

দিলেন। রাজারা ধনরত্ন হাতি ঘোড়া ইত্যাদি উপহার পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

এর পর যুধিষ্ঠির দুঃশলার বালক নাতিকে সিন্ধুর রাজা বলে ঘোষণা করে তাকেও বহু ধনরত্ন উপহার দিলেন।

কৃষ্ণ বলরাম এবং বৃষ্ণি বংশের বীরেরা আনন্দের সাথে দ্বারকায় ফিরে গেলেন। কৃষ্ণের অভাবে পাণ্ডবেরা মনমরা হয়ে পড়লেন, হস্তিনাপুরের উৎসবের আলোকমালা যেন ম্লান হয়ে গেলো।

আশ্রমবাসিক পর্ব

যুধিষ্ঠিরের উদারতা

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ের পর পাণ্ডবেরা ছত্রিশ বছর রাজ্যশাসন করেছিলেন। প্রথম পনেরো বছর তাঁরা রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ মত চলতেন।

মহামতি বিদুর দেশের ধর্ম ও আইন বিষয়ক কাজ কর্ম দেখতেন বলে রাজ্য থেকে অনাচার প্রায় লোপ পেয়েছিলো। যুধিষ্ঠিরের অধীনস্থ রাজারা তাঁর খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন।

ওদিকে রাজ অন্তঃপুরে কুন্তী দেবীর উপদেশ মত দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উলুপী ও অন্যান্য পাণ্ডব বধুরা সবসময় গান্ধারীর সেবা করে, তাঁর কাছে কাছে থেকে দুঃখ ভুলিয়ে রাখতেন।

যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইদের বলে দিয়েছিলেন, 'তোমরা এমন কিছু কোর না যাতে পুত্রহীন অন্ধরাজা মনে দুঃখ পান।'

পাণ্ডবেরা তাঁর কথা মত চললেও ভীম কখনই ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর অন্যায় অবিচারের জন্য ক্ষমা করতে পারলেন না।

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের বধূদের ব্যবহারে এত খুশি ছিলেন যে প্রতিদিন তাঁদের কল্যাণের জন্য পূজা দিতেন এবং নিজেদের মধ্যে প্রায়ই এই কথা বলতেন যে আপন ছেলেদের কাছে থেকেও কখনও তাঁরা এত ভক্তি, সেবা ও আনন্দ পাননি।

পনেরো বছর পরম শান্তির মধ্যে দিয়ে কেটে গেলো। কিন্তু ভীমসেনের বুকের আগুন নিবলো না। সামনাসামনি ধৃতরাষ্ট্রের সাথে কোন অপমানজনক ব্যবহার না করলেও আড়াল থেকে নানাভাবে এবং অন্যদের দিয়ে বৃদ্ধ রাজার খারাপ লাগবার মত কাজ করতেন।

একদিন আড়াল থেকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র শুনলেন, ভীম বলছেন, 'আমার শক্তি এবং গদার জোরেই মূর্খ দুর্যোধন সহ ধৃতরাষ্ট্রের একশো ছেলে যুদ্ধে নিহত হয়েছে।'

ভীমের এই কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দু'জনেই নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনের কথা কাউকে না বলে তাঁর আত্মীয় পরিজনদের জানালেন,'আমি ভুলতে পারি না যে আমার দুর্বুদ্ধির জন্যই কুরু বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা, বিশেষ করে যুধিষ্ঠির দুঃখ পাবে বলে আমি কাউকে বলিনি যে, পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি সারাদিনে মাত্র একবার সামান্য একটু খাবার খাই, আমি ও গান্ধারী রাত্রিতে কুশের (খড় জাতীয় তৃণ) বিছানায় শুয়ে সারারাত দেবতার নাম জপ করি।'

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, 'বাবা! তোমার কাছ থেকে আমরা যে সুখ ও সম্মান পেয়েছি তার তুলনা হয় না। কিন্তু আমার ও গান্ধারীর এখন উচিত ঘর ত্যাগ করে বনে গিয়ে তপস্যায় জীবন

কাটানো। তুমি আমাদের সেই অনুমতি দাও।'

যুধিষ্ঠির হাতজোড় করে বললেন, 'কুরুরাজ আপনি আমার পিতা এবং প্রভু। আপনি যদি বনে গিয়ে দুঃখে জীবনপাত করেন তাহলে আমার রাজ্য দিয়ে কি হবে? তারচেয়ে আপনার হাতে রাজ্যের ভার তুলে দিয়ে আমিই বনে চলে যাই।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

যুধিষ্ঠির নিজ হাতে সেবা করে বৃদ্ধ রাজার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তাঁকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। গান্ধারী ও অন্যান্য রাজ-বধুরা তাঁকে যত্ন করে খাওয়ালেন ও সেবা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে ব্যাসদেবের কাছে গিয়ে তাঁর উপদেশ চাইলেন।

ব্যাসদেব বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জন্য বনে গিয়ে তপস্যায় জীবন কাটানোই শ্রেয়, তুমি তাঁদের বাধা দিও না।'

এরপর ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছায় যুধিষ্ঠির রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের সমবেত হবার ব্যবস্থা করলেন। নানা দেশ থেকে রাজারা, বেদজ্ঞ ও স্নাতক ব্রাহ্মণেরা এবং সাধারণ প্রজারা এসে জড় হলেন।

ধৃতরাষ্ট্র সকলকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনারা আমাকে ও গান্ধারীকে বনবাসী হবার অনুমতি দিন। আমরা দুজনেই বার্ধক্য ও পুত্রশোকে ভেঙ্গে পড়েছি, এখন তপস্যার মধ্যে মৃত্যুই আমাদের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক।'

প্রিয় প্রজাবৃন্দ, 'আমি দীর্ঘদিন আপনাদের সেবা করেছি, যদি আমি কোন ত্রুটি করে থাকি সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ছেলে দুর্যোধন যত মন্দই হোন প্রজাদের জন্য তাঁর অগাধ মমতা ছিলো। তাঁকেও আপনারা ক্ষমা করুন।

আপনাদের রাজা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আমি বিদায় প্রার্থনা করছি।

ধৃতরাষ্ট্রের করুণ ভাষণ শুনে প্রজারা কাঁদতে লাগলেন। শাম্ব নামে একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহারাজ আপনি ও আপনার ছেলেরা কখনও আমাদের ওপর কোন অবিচার করেননি। দুর্যোধন ছিলেন আমাদের জন্য পিতৃতুল্য রাজা। কুরুবংশ ধ্বংস হবার জন্য দৈবকে দায়ী করুন। নিয়তির হাতে মানুষ পুতুল মাত্র। কাজেই দুর্যোধন কিংবা কর্ণকে দোষ দেওয়া অর্থহীন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাদের চিরদিনই প্রিয়, তিনি আপনারই যোগ্য সন্তান। হে রাজা, আপনি আমাদের বিদায় প্রণাম গ্রহণ করুন।'

শাম্বের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মনে শান্তি নেমে এলো।

ধৃতরাষ্ট্রের বন যাত্রা

পরদিন সকালে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ধর্মরাজ, ধৃতরাষ্ট্র আগামী কার্তিক পূর্ণিমার দিন বনযাত্রা করবেন বলে ঠিক করেছেন। যাবার আগে তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ এবং তাঁর শতপুত্রের শ্রাদ্ধ করতে চান, এ ছাড়াও তাঁর যত আত্মীয় পরিজন মারা গেছেন সবারই মৃত আত্মার শান্তির জন্য দান ধ্যান করতে চান। এজন্য তিনি আপনাদের কাছে কিছু অর্থ চেয়েছেন।'

যুধিষ্ঠির খুব আনন্দের সাথে অর্থ দিতে চাইলেন, অর্জুনও রাজী হলেন। কিন্তু ভীমসেন ঘোর অমত জানালেন।

অর্জুন তাঁকে খুব কোমলভাবে বললেন, 'আমাদের জ্যেষ্ঠ তাত (জ্যাঠা) এই রাজ্যের ধন সম্পদ সুখ আরাম সব ছেড়ে চিরদিনের জন্য বনে চলে যাচ্ছেন। তাঁর সামান্য ইচ্ছা যদি আমরা পূরণ না করি তাতে আমাদেরই দুর্নাম হবে।'

ভীম রেগে উঠে বললেন, 'ধনঞ্জয়, তোমার ঐ সাধু সন্ন্যাসীর মত কথাবার্তাগুলো শুনতেই ভালো। তবে আমি বলছি, দ্রোণাচার্য ভীষ্ম ও অন্যান্য আত্মীয়দের শ্রাদ্ধ আমরাই করবো। কর্ণের শ্রাদ্ধ মা কুন্তী করবেন। কিন্তু দুর্যোধন ও তাঁর ভাইদের শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ দেওয়াতে আমার আপত্তি আছে। তাঁর পাপিষ্ঠ ছেলেদের পরলোকে কষ্ট পাওয়াই উচিত। ফাল্গুনি, তুমি কি অতীতের সব অপমান ভুলে গেছো? সেই দ্যূতসভায় অন্ধরাজা যখন বার বার লোভীর মত জিজ্ঞাসা করছিলেন, "কি জিতলাম? আমরা কি জিতলাম?" সে কথা তোমাদের মন থেকে মুছে গেলেও আমি ভুলতে পারি না।'

যুধিষ্ঠির ভীমকে শান্ত করে বিদুরকে বললেন, 'আপনি কুরুরাজকে বলবেন, তাঁর যা অর্থ লাগে তা আমার নিজের কোষ থেকে দেবো। আসলে বনবাসের সময় মহাবলী ভীমসেন আমাদের সকলের সেবা ও রক্ষার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন, বনে যে আমরা সুখে শান্তিতে ছিলাম সে তাঁরই দান। কাজেই তাঁর মানসিক অবস্থা এমন রুক্ষ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, আপনারা দয়া করে কিছু মনে করবেন না।'

যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের দেওয়া অর্থে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর শতপুত্র ও আত্মীয়-দের শ্রাদ্ধ ও দানধ্যান করলেন। তারপর কার্তিক পূর্ণিমার দিন পূজা ও যজ্ঞ করে অগ্নিহোত্র (যজ্ঞের আগুন) সামনে রেখে বনে যাত্রা করলেন।

যুধিষ্ঠির শোকে কাতর হয়ে পড়লেন। পঞ্চপাণ্ডব, বিদুর, সঞ্জয়,

কৃপাচার্য, ধৌম্য, যুযুৎসু ইত্যাদি জলভরা চোখে তাঁদের সাথে সাথে চলতে লাগলেন। কুন্তীদেবী গান্ধারীকে নিয়ে চলেছেন, পেছনে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা এবং উলুপীও কাঁদতে কাঁদতে চললেন। এই করুণ দৃশ্যে নগরবাসীদের চোখে জল এলো।

বিদুর ও সঞ্জয় আগে থেকেই ঠিক করেছিলেন যে তাঁরাও বনবাসী হবেন। সেজন্য ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'তোমরা এবার নগরে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নাও, এই দুই পুণ্যবান আমাদের সাথে রয়েছেন, এঁরাই আমাদের পথ চলতে সাহায্য করবেন।'

তখন কুন্তী গান্ধারীকে আঁকড়ে ধরে বললেন, 'ছেলেরা শোন, আমিও বনবাসী হব বলে ঠিক করেছি। বনে আমি আমার এই বড় বোন গান্ধারী ও গুরুজন ধৃতরাষ্ট্রের সেবা ও তপস্যা করে জীবন কাটিয়ে দেবো।'

যুধিষ্ঠির অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু কুন্তী আর সংসারে ফিরতে রাজী হলেন না। তখন ভীম রাগে দুঃখে কেঁদে উঠে বললেন, 'মা, আমাদের ফেলে বনে যাবার কথাই যদি আপনার মনে ছিলো তাহলে আমাদের দিয়ে এই মহাযুদ্ধ করিয়ে এত রক্তক্ষয়, এত আত্মীয় পরিজনকে বধ করালেন কেন? কেন আমাদের যুদ্ধে প্রেরণা যোগালেন?'

কুন্তী চোখের জলে ভেসে বললেন, 'ছেলেরা আমার, আমি যা করেছি সবই তোমাদের হারানো গৌরব যাতে উদ্ধার হয় সেজন্য করেছি। আমিও ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের মা, এটা আমার কর্তব্য ছিলো। স্বামীর রাজত্ব কালে আমি সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা পেয়েছি, ছেলের রাজত্বকালে আমার কপালে রাজমাতার গৌরব জ্বলজ্বল করছে। বাবা যুধিষ্ঠির, তুমি ধর্মজ্ঞ, তুমি বুঝবে আমি কেন তপস্যায় জীবন শেষ

করতে চাই। বিলাসী জীবনে আমার আর রুচি নেই, যেখানে তোমাদের বাবা পাণ্ডু রয়েছেন আমি তপস্যায় প্রাণ দিয়ে সেখানে যেতে চাই। তুমি ভাইদের নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। সহদেব আমার জন্য বড় বেশী দুর্বল তাকে তুমি দেখো, আর তোমাদের স্ত্রী দ্রৌপদী লক্ষীদেবীর মতই বুদ্ধিমতী ও গুণী, তাঁকে যেন কখনও দুঃখ দিও না।'

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কুন্তীকে ছেলেদের সাথে রাজ্যে ফিরে যাবার জন্য বহু অনুরোধ করলেন। কিন্তু কুন্তী গান্ধারীকে ধরে চলতেই থাকলেন। তখন দ্রৌপদী ও অন্য বধুরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে পাণ্ডবদের সাথে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

অনেক পথ চলার পর ধৃতরাষ্ট্রেরা ভাগীরথী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। তখন হেমন্তের সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমেছে। দিনশেষের সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে বিদুর ও সঞ্জয় নদীতীরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর জন্য কুশতৃণের বিছানা তৈরী করে দিলেন।

নদীর তীরের নির্মল বাতাসে বহুদিন পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর চোখে শান্তির ঘুম নেমে এলো।

ভোরের সূর্য ওঠার সময় জেগে উঠে তাঁরা পূজা অর্চনা করে উত্তর দিকে যাত্রা করে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁদের রাজর্ষি শতযূপের সাথে দেখা হলো। শতযূপ ছিলেন কেকয় দেশের রাজা। বৃদ্ধ বয়সে ছেলেকে রাজ্যের ভার দিয়ে তিনি তপস্যায় জীবন কাটাচ্ছেন।

ধৃতরাষ্ট্রেরা শতযূপের সঙ্গে ব্যাসদেবের আশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নিয়ে গাছের বাকল এবং হরিণের চামড়া পরলেন। তারপর শতযূপের আশ্রমে কঠোর তপস্যায় ডুবে গেলেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ, পর্বত ও ব্যাসদেব শতযূপের আশ্রমে

এলেন। নারদ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, ব্যাসদেবের দয়ায় আপনার ও গান্ধারীর তপস্যা সার্থক হবে ও আপনারা স্বর্গে যাবেন। কুন্তীও তাঁর স্বামী পাণ্ডুর কাছে ইন্দ্রলোকে যাবেন। সঞ্জয় স্বর্গলোকে যাবেন, আর ধর্মমতি বিদুর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দেহে মিশে যাবেন।

এইসব ভবিষ্যতবাণী করে ব্যাসদেব ও নারদ চলে গেলেন।

ওদিকে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর জন্য সবারই খুব মন খারাপ। বিশেষ করে কুন্তীর জন্য পঞ্চপাণ্ডবেরা এত বেশী মুষড়ে পড়লেন যে কোন কাজেই মন বসাতে পারলেন না। সপ্তাহখানেক পরে পাঁচ ভাই ঠিক করলেন যে বনে গিয়ে সবাইকে দেখে আসবেন। দ্রৌপদী ও অন্যসব বধুরাও সঙ্গে যেতে চাইলেন।

রথ, হাতি, ঘোড়া, পালকি সব সাজানো হলো। কৃপাচার্যের তত্ত্বাবধানে সৈন্যদল তৈরী হলো। তারপর শুভলগ্নে যুধিষ্ঠির ও অর্জুন রথে, ভীম হাতির পিঠে, নকুল ও সহদেব ঘোড়ায় চড়ে এবং রাজ-বধুরা পালকিতে করে যাত্রা করলেন। কৃপাচার্যের নেতৃত্বে সৈন্যদল-ও চললো। শুধু যুযুৎসু ও ধৌম্য রাজধানী রক্ষার জন্য হস্তিনাপুরে রয়ে গেলো।

পাণ্ডবেরা আশ্রমের কাছে এসে অন্যান্য তাপসদের কাছে ধৃতরা-ষ্ট্রের খোঁজ করে জানলেন তাঁরা সবাই যমুনায় স্নান করতে গেছেন।

পাণ্ডবেরা দ্রুত পায়ে যমুনার দিকে চললেন, কিছুদূর যেতেই দেখলেন কুন্তীর সাহায্যে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আসছেন। তাঁদের সবার হাতেই জল ভরা কলস। সহদেব চীৎকার করে কেঁদে উঠে কুন্তীর পায়ে আছড়ে পড়লেন। অন্য সবাই ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীকে প্রণাম করে তাঁদের জলভরা কলস বয়ে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন। কুন্তী সহদেবকে ছোট শিশুর মত আদর করে বোঝাতে লাগলেন।

হস্তিনাপুর থেকে পাণ্ডবেরা এসেছেন শুনে নানা জায়গা থেকে তাপসেরা তাঁদের দেখতে এলেন।

সঞ্জয় তাঁদের সবাইকে এইভাবে পরিচিত করে দিলেন।—'ঐ যে সিংহের মত সবল অথচ ক্ষমাশীল পুরুষ উনি রাজা যুধিষ্ঠির। এই পাকা সোনার মত গায়ের রং আর বিশাল দেহ যার ইনি বৃকোদর ভীমসেন, এঁর পাশে শ্যামল দেহ, অপরূপ মুখ আর চঞ্চল চোখ পুরুষ ইনিই সব্যসাচী অর্জুন। আর মা কুন্তীর দুই পাশে যে দু'জন রূপবান যুবা দাঁড়িয়ে ওঁরাই নকুল ও সহদেব।'

এরপর সঞ্জয় রাজবধুদের পরিচিতি তুলে ধরলেন, 'এই নীল পদ্মের মত গায়ের রং আর কালো চোখ লক্ষী প্রতিমার মত নারীই হচ্ছেন দ্রুপদ রাজকন্যা কৃষ্ণা। পাশে চাঁদের আলোর মত রং নিয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের বোন সুভদ্রা। এই স্বর্ণলতার মত নারী নাগরাজ কন্যা উলুপী, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে শিশির ভেজা মধুক ফুলের মত লাবণ্যময়ী নারী মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। এঁরা অর্জুনের স্ত্রী।

আর ইনি, যাঁর গায়ের রং কচিপাতার মত লাবণ্যময় ইনি ভীমসেনের স্ত্রী কালী। এই চাঁপাফুলের মত রং ও রূপ যাঁর ইনি রাজা শল্যের বোন ও সহদেবের স্ত্রী। আর ঐ দুর্বার মত কোমল সবুজ যার রং ও কোমল সৌন্দর্য উনি নকুলের স্ত্রী করেনুমতী।

আর এই অপ্সরার মত রূপবতী তরুণী ইনি মহাবীর অভিমন্যুর বিধবা পত্নী উত্তরা, এঁর দু'চোখে এখনও অশ্রু লেগে আছে। চেয়ে দেখুন ঐ শ্বেতপদ্মের মত শাদা কাপড় পরা, যাঁদের শরীরে কোন অলংকার নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, এঁরা ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অনাথা বিধবা।'

তাপসেরা বিদায় নেবার পর ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবেরা কথাবার্তা বলতে

লাগলেন। যুধিষ্ঠির বিদুরকে খুঁজলেন, কারণ তাঁকে এপর্যন্তও দেখা যায়নি। ধৃতরাষ্ট্র জানালেন বিদুর খাওয়া ও কথা বন্ধ করে গভীর বনে তপস্যা করছেন, তিনি একফোঁটা জল পর্যন্ত পান করেন না।

যুধিষ্ঠির গভীর বনে গিয়ে দেখলেন বিদুরের দেহ শুকিয়ে গেছে, পরনে কোন কাপড় নেই, মাথায় জটা এবং মুখে বীটা (বীটা এক-টুকরো কাঠ, এতে বোঝা যায় এই সাধক কথা ও খাওয়া বন্ধ করে-ছেন)।

যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'ধর্মমতি বিদুর, আমি আপনার আদরের যুধিষ্ঠির, আপনাকে দেখতে এসেছি।'

বিদুর একটি গাছে ঠেস দিয়ে পলকহীন চোখে যুধিষ্ঠিরকে দেখতে লাগলেন। তপস্যার বলে তিনি আপন আত্মা ও তেজ নিয়ে যুধিষ্ঠি-রের শরীরের ভেতর মিশে গেলেন এবং তাঁর প্রাণহীন শরীর অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যুধিষ্ঠির অনুভব করলেন তাঁর শরীরের বল বহুগুণ বেড়ে গেছে। তখন তাঁর মনে পড়লো ব্যাসদেব একদিন বলে-ছিলেন বিদুর ও যুধিষ্ঠির দু'জনেই ধর্মের অংশ।

আশ্রমে ফিরে যুধিষ্ঠির এই ঘটনার বিবরণ দিলে সবাই চমৎকৃত হয়ে গেলেন। বিদুরের দেহের সৎকার করার বিষয়ে কথা উঠলে ব্যাসদেব বললেন, 'বিদুর সর্বশ্রেষ্ঠ দেহে মিশে গেছেন, তাঁর দেহের সৎকার করার প্রয়োজন নেই।'

মৃত যোদ্ধাদের সমাবেশ

পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে একমাস খুব শান্তিতে কাটালেন। এর-মধ্যে একদিন ব্যাসদেব, মহর্ষি নারদ, পর্বত, দেবল এবং গন্ধরাজ চিত্র-সেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

নানা কথাবার্তার পর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'তোমরা যে কি শোকের আগুনে সর্বক্ষণ জ্বলে মরছো তা আমি বুঝতে পারি। তোমার মনে যদি কোন ইচ্ছা থাকে তাহলে বলো, নিশ্চয়ই আমি তপস্যার বলে তা পূর্ণ করবো।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'পিতা, আপনার ও মহর্ষিদের সাথে থাকতে পেরে আমি ধন্য। কিন্তু যে দুর্বুদ্ধি হতভাগ্য দুর্যোধনের জন্য কুরুবংশ ধ্বংস হলো, বহু পাণ্ডববীর ও বহু রাজা এবং সৈন্য নিহত হলেন তার জন্য কেন আমার বুক ফেটে যায়? কেন তাকে কাছে পেতে ইচ্ছা করে?'

গান্ধারী হাতজোড় করে বললেন, 'প্রভু একবার কি আমরা আপনার দয়ায় আমাদের ছেলে ও নাতীদের দেখতে পাই না?'

ব্যাসদেব দেখলেন, কুন্তী তাঁর দিকে করুণ চোখে চেয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, 'কল্যাণী, তোমার কি বাসনা বল?'

কুন্তী চোখভরা জল নিয়ে মাথা নীচু করে বললেন, 'ভগবান আপনি আমার শ্বশুর, আমার দেবতার দেবতা। আমি বালিকা বয়সে লজ্জায় যে শিশুকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম তার জন্য আমার বুকের ভেতর সর্বক্ষণ আগুনের শিখা জ্বলছে, একবার তাকে দেখতে চাই।'

ব্যাস বললেন, 'কল্যাণী তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তোমার কোন পাপ নেই, আদিত্যদেব সূর্যের আশিসে তোমার কোন কলংক নেই। কর্ণকে তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।'

তারপর ব্যাসদেব সবাইকে বললেন, 'আজ গোধূলী লগ্নে তোমরা সবাই ভাগীরথী নদী তীরে চল। সেখানে একমনে স্তব করবে, তারপর রাত্রিবেলা স্বপ্নের মত তোমাদের নিহত আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে পাবে।'

বিকেল বেলায় ধৃতরাষ্ট্র সকলের সাথে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। সকলে পবিত্র মনে গঙ্গাতীরে বসে অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হলো, রাত্রির আকাশে অজস্র তারা ফুটে উঠলো, সেই তারার ছায়া নদীর বুকে আলোর ফুল হয়ে জ্বলতে লাগলো। এমন সময়ে মহামুনি ব্যাসদেব ভাগীরথীর পবিত্র জলে নেমে মৃত কৌরব ও পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আহ্বান করলেন।

সেই আহ্বানে নদীর বুক তোলপাড় করে উঠে এলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, বিরাট রাজা দ্রুপদ এবং তাদের ছেলেরা, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন সহ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র। উঠে এলেন শকুনি, জরাসন্ধের ছেলে সহদেব, ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, শল্য, বৃষসেন, দুর্যোধনের ছেলে লক্ষণ, দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে এবং আরও বহু নিহত বীরেরা। তাঁরা দিব্যশরীর নিয়ে সৈন্য সামন্ত শুদ্ধ উঠে এলেন। বেঁচে থাকতে যার যেমন সাজসজ্জা ও বাহন ছিলো সে সবই দেখা গেলো। আকাশ থেকে অপ্সরা ও গন্ধর্বরা স্তবগান গাইতে লাগলেন। ব্যাসদেবের দয়ায় দিব্য চক্ষু পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র দু'চোখ ভরে তাঁর ছেলেদের দেখতে লাগলেন।

সকলে যেন স্বপ্নের পৃথিবীতে আপনজনদের সাথে মিলন উৎসবে মেতে উঠলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী কর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরে শান্তির সুধায় যেন ডুবে গেলেন। কুরু ও পাণ্ডবেরা হিংসা দ্বেষ সব ভুলে পবিত্র আনন্দে পরস্পরকে নিয়ে সুখী হলেন। মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের করুণায় সেই রাত্রে গঙ্গাতীর যেন অপরূপ স্বর্গ হয়ে উঠলো। ফুলের গন্ধমাখা নির্মল বাতাস বইতে লাগলো। কারুর মনে শোক, দুঃখ, ভয় কিছুই রইলো না।

অতি ভোরে, আকাশে তখনও শুকতারা জ্বলছে, পুব আকাশে লেগেছে সোনার আভা, ব্যাসদেব সেই মৃত্যু থেকে জেগে ওঠা যোদ্ধাদের ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। চোখের পলকে তাঁরা রথ, ধ্বজ ও অস্ত্রশস্ত্র শুদ্ধ গঙ্গার বুকে নেমে নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন।

ব্যাসদেব ক্ষত্রিয় বিধবাদের বললেন, 'তোমরা যদি স্বামীর কাছে যেতে চাও তাহলে এই মুহূর্তে ভাগীরথীর জলে ডুব দাও।' তখনই পতিব্রতা নারীরা জলে নেমে স্বামীর সাথে মিলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মহাভারত কাহিনীতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের মতে, যিনি এই প্রিয় মিলনের অপূর্ব কাহিনী শোনেন এবং অন্যকে শোনান তিনি ইহলোকে যশ এবং পরলোকে স্বর্গলাভ করেন।

এই ঘটনার দীর্ঘদিন পর অভিমন্যুর নাতি অর্থাৎ পরীক্ষিতের ছেলে জনমেজয় ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে এই কাহিনী শুনে প্রশ্ন করেছিলেন, 'যাঁদের মৃত্যু হয়েছিলো তাঁরা কি করে সশরীরে আত্মীয়দের কাছে ফিরে এলেন?'

ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন উত্তর দিয়েছিলেন, 'মহারাজ, ব্যাসদেবের তপস্যার বলেই তা সম্ভব হয়েছিলো। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র জীবনে কখনও তাঁর পুত্রদের দেখেননি, কিন্তু সেই রাত্রিতে ব্যাসদের দয়ায় তিনিও তাঁদের দেখতে পেয়েছিলেন।

জনমেজয় বললেন, 'আমিও মহামুনি ব্যাসের দয়ায় আমার মৃত পিতাকে দেখতে ইচ্ছা করি। প্রভু ব্যাস আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করুন।'

জনমেজয় এই কথা বললে ব্যাসের তপস্যার বলে পরীক্ষিৎ আগের রূপ ও পোষাকে এসে ছেলেকে দেখা দিলেন।

জনমেজয় পিতাকে দেখতে পেয়ে ধন্য হলেন এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে ব্যাসদেবকে শতসহস্র প্রণাম জানালেন।

ব্যাসের শিষ্য ঋষি বৈশম্পায়ন বললেন, 'রাজা জনমেজয়, তুমি ধর্মপ্রাণ এবং প্রতিদিন মহাভারতের পুণ্যকাহিনী শোন বলেই তোমার অসীম পুণ্য লাভ হয়েছে ও তুমি ব্যাসদেবের করুণা পেয়েছো।'

পাণ্ডবদের বিদায়

সেই অলৌকিক রাত্রি শেষে সকলে গঙ্গাতীর থেকে আশ্রমে ফিরে আসার পর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'পুত্র, তুমি এখন পাণ্ডবদের রাজ্যে ফিরে গিয়ে তাঁদের প্রজা পালন করতে বলো।'

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্যে ফিরে যেতে বললে যুধিষ্ঠির তাঁর পা ছুঁয়ে বললেন, 'পিতা আপনি আমাকে যেতে বলবেন না। আমার

ভাইরা ফিরে গিয়ে রাজ্য চালাবেন, আমি এই আশ্রমে থেকে আপনাদের সেবা করবো।'

সহদেবও কুন্তীকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বললেন, 'তোমরা এখানে থাকলে আমাদের মায়া বাড়বে, তপস্যা থেকে মন সরে যাবে। তোমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে যাও, আমাদেরও শেষ কর্তব্য করতে দাও।'

তখন যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

দুই বছর কেটে গেলো। একদিন দেবর্ষি নারদ হস্তিনাপুরে এলেন। পঞ্চপাণ্ডবদের বললেন, 'আমি গঙ্গাতীর ও অন্যান্য তীর্থ ঘুরে তোমাদের কাছে এসেছি।'

যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'ভগবান, আমাদের বাবা মায়েরা কেমন আছেন? তাঁদের সাথে কি আপনার দেখা হয়েছে?'

নারদ বললেন, 'সে অনেক কথা। তোমরা হস্তিনাপুরে চলে আসার পর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীকে নিয়ে সঞ্জয়ের সাহায্যে গঙ্গাদ্বারে গেলেন। সেখানে ধৃতরাষ্ট্র মুখে বীটা (কাঠের টুকরো) দিয়ে কথা ও আহার ত্যাগ করে তপস্যা করতে লাগলেন। গান্ধারী শুধুমাত্র জলপান করে, কুন্তী একমাস পর সামান্য খাবার খেয়ে এবং সঞ্জয় পাঁচদিন পর আহার করে তপস্যা করতে লাগলেন। ছয় মাস নদীর তীরে এভাবে কাটাবার পর তাঁরা গভীর বনে গিয়ে ঢুকলেন। সেই সময় হঠাৎ বনে দাবানল জ্বলে উঠলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই আগুন ভয়ংকর ভাবে ছড়িয়ে পড়ে বনের পশুপাখি পুড়িয়ে মারতে লাগলো। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী উপবাসে থেকে এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁদের পালাবার শক্তিটুকুও ছিলো না। শুধু সঞ্জয়ই সবল ছিলেন।

তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, 'তুমি পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাও। আমরা এই আগুনেই জীবন বিসর্জন দেবো।'

তাঁরা তিনজন সেই জ্বলন্ত বনে ধ্যানে বসলেন এবং পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। সঞ্জয় গঙ্গাতীরে গিয়ে তাপসদের কাছে সব ঘটনা জানিয়ে হিমালয় পর্বতে তপস্যা করতে চলে গেলেন।'

নারদের কথা শুনে পাণ্ডবেরা হাহাকার করে মাটিতে আছড়ে পড়লেন। নারদ তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'শান্ত হও, তোমাদের গুরুজনেরা তপস্যার মধ্যে প্রাণ দিয়ে স্বর্গে গেছেন, তাদের জন্য শোক কোর না।'

পাণ্ডবেরা তবু নিজেদের ধিক্কার দিয়ে বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, 'হায় অর্জুন, তুমি খাণ্ডবদাহ করে অগ্নিদেবকে খুশী করেছিলে, অথচ সেই অগ্নিই আমাদের মাকে পুড়িয়ে মারলেন। ধৃতরাষ্ট্র চিরদিন যজ্ঞের অগ্নিহোত্রকে পূজা করেছেন, তাঁর কেন যজ্ঞের আগুনে মৃত্যু না হয়ে বৃথা আগুনে মরতে হলো?'

নারদ বললেন, 'ধর্মপুত্র, তুমি ধীর স্থির, তোমার এই শোকের কান্না শোভা পায় না। শান্ত হও। তোমাদের পিতা মাতারা বৃথা আগুনে পুড়ে মরেননি। তাঁরা বনে ঢোকার আগে যে যজ্ঞ করেছিলেন তারই আগুন বাতাসে উড়ে গিয়ে বনে দাবানলের সৃষ্টি করেছিলো। তোমাদের পুণ্যবান পিতামাতারা যজ্ঞের সেই পবিত্র আগুনেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এখন শোক বন্ধ কর, ভাইদের নিয়ে মৃত গুরুজনদের তর্পন কর।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদেরও যুযুৎসুকে নিয়ে মৃত গুরুজনদের তর্পন করলেন। রাজবধুরাও তাঁদের সাথে তর্পন ও শোক পালন করলেন।

বারোদিন পর পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের গুরুজনদের শ্রাদ্ধ করে ব্রাহ্মণদের দান দক্ষিণা দিলেন এবং মৃতদের হাড় সেই বন থেকে আনিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন।

মৌষল পর্ব

শাম্বের মুষলপ্রসব ও দ্বারকায় অশুভ লক্ষণ

যাদবেরা অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত ছিলেন। শাখাগুলোর নাম ছিলো এই রকম—অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি ও কুকুর। কৃষ্ণ হলেন বৃষ্ণি বংশীয়। তবে যাদবদের সমস্ত শাখাই তাঁর বশ ছিলো, সবাই তাঁকে দেবতা বলে মানতো।

কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের রাজলাভের পর ছত্রিশ বছর ধরে বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে নানারকম দুর্নীতি এসে ঢোকে এবং তাঁরা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে মরছিলেন। তাঁরা দেবতা ও ব্রাহ্মণ-দের ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে নানারকম নির্লজ্জ ব্যবহার ও কুকাজ করতে সংকোচ করতেন না।

এর মধ্যে একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় এলেন। তাঁরা যাদবদের এইসব অধঃপতনের খবর পেয়েই এসেছি-লেন যাতে উপদেশ দিয়ে তাদের সুপথে আনতে পারেন।

ঋষিদের আসবার খবর পেয়ে কৃষ্ণের সৎভাই বীর সারণ ও আরও

কয়েকজন বৃষ্ণি বীর মিলে এক কুবুদ্ধি বের করলেন।

তাঁরা কৃষ্ণের ছেলে শাম্বকে মেয়ের সাজে সাজিয়ে মুনিদের সামনে এনে বললেন, 'এই নারী যাদব বীর বভ্রুর স্ত্রী, ইনি পুত্রসন্তান চান। আপনারা বলুন, এঁর ছেলে হবে না মেয়ে?'

বৃষ্ণি বীরদের এই নীচ ঠাট্টা দেখে মুনিরা ভীষণ রেগে বললেন, 'কৃষ্ণের এই অপদার্থ ছেলে একটা বিকট লোহার মুষল (গদা) প্রসব করবে। তোমরা ভয়ানক নীচ, অশিষ্ট ও কুৎসিত স্বভাবের হয়েছো। সেই মুষলের ক্ষমতায় বলরাম ও কৃষ্ণ ছাড়া যদু বংশের সবাই ধ্বংস হবে। হলায়ুধ বলরামকে সমুদ্রে আত্মহত্যা করতে হবে, জরা নামে একজন ব্যাধ কৃষ্ণকে তাঁর মৃত্যুর আগে শর দিয়ে আহত করবে।'

এরপর মুনিরা খুবই দুঃখের সাথে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁদের অভিশাপের কথা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

কৃষ্ণ তখন বৃষ্ণিবংশীয়দের ডেকে বললেন, 'নিয়তি! নিয়তির কবলে পড়েছো তোমরা। মুনিদের অভিশাপ তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, সেজন্য তৈরী হও।'

বৃষ্ণিরা আশা করেছিলেন, 'কৃষ্ণ মুনিদের অভিশাপ থেকে তাঁদের রক্ষা করবেন। কিন্তু এখন কৃষ্ণের চোখে আগুনের ফুলকি জ্বলছে, তাঁর কপালে বিষাদের কালিমা এবং ক্লান্ত শরীর টেনে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যাওয়া দেখে ভয়ে তাঁরা কাঁপতে লাগলেন।

পরদিন সত্যিই শাম্ব একটি লোহার মুষল প্রসব করলেন। বৃষ্ণি রাজা উগ্রসেন সেই মুষলকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।

বলরাম, কৃষ্ণ ও উগ্রসেনের আদেশে দ্বারকায় ঘোষণা করে দেওয়া হলো, আজ থেকে দ্বারকা নগরীতে মদ তৈরী এবং মদ খাওয়া

নিষেধ। যে এই নিয়ম অমান্য করবে তাকে জীবন্ত শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে।

বৃষ্ণি ও অন্ধকেরা ভয় পেয়ে সাবধান হলেন কিন্তু নগরীর লোকেরা প্রায়ই একজন বিকট চেহারার পুরুষকে দেখতে পেলো। সেই ভীষণ কালো রং বিশাল পুরুষের মাথায় কোন চুল নেই, সে হঠাৎ করে কোন বাড়ীতে দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যেতো। যাদবেরা বহু তীর বল্লম ইত্যাদি ছুঁড়েও কখনও তাকে আহত করতে পারতেন না।

দ্বারকায় নানারকম অশুভ লক্ষণ দেখা দিলো। যাদবেরা আবার মদ খেতে শুরু করলো এবং নানারকম পাপকাজ করতে লাগলো। এর মধ্যে একদিন চাঁদের ত্রয়োদশী তিথিতে অমাবস্যা হলো। এতে কৃষ্ণ হতাশ হয়ে যাদবদের বললেন, 'কুরুক্ষেত্রে ভারত যুদ্ধ হবার সময় একবার এইরকম ত্রয়োদশী তিথিতে অমাবস্যা হয়েছিলো, এ ভয়ংকর অশুভ লক্ষণ, আমাদের সর্বনাশ ঘটতে আর দেরী নেই। তোমরা যদি বাঁচতে চাও তাহলে সমুদ্র তীরে প্রভাস তীর্থে চলে যাও।'

দ্বারকায় অশুভ শক্তির উৎপাত আরও বেড়ে গেলো। গভীর রাতে ভীষণ কালো প্রেতিনীর মত দেখতে সব মেয়েরা এসে যাদব-বধুদের গলার মঙ্গল সুতো ছিঁড়ে, হাতের শাঁখা ভেঙ্গে একাকার করতো, তাঁদের কপালের সিঁদুর পর্যন্ত মুছে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো। বিকট চেহারার রাক্ষসেরা হঠাৎ করে এসে যাদব-বীরদের অস্ত্র, কবচ, কুণ্ডল আর ধ্বজ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতো।

হঠাৎ একদিন বাসুদেব কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র সবার চোখের সামনে আকাশে মিলিয়ে গেলো, তাঁর দিব্যরথ ঘোড়াসহ সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেলো।

অপ্সরারা বলরাম ও কৃষ্ণের ধ্বজ ছিনিয়ে নিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, 'যাদবেরা, প্রভাস তীর্থে চলে যাও।'

যাদবদের বিনাশ

বৃষ্ণি ও অন্ধকেরা তাঁদের সব ধর্মজ্ঞান হারিয়ে প্রচুর খাবার, মদ ও মাংস নিয়ে সপরিবারে প্রভাসে চলে গেলেন। সেখানে তাঁরা নিজেদের বংশ মর্যাদা ও সম্মানের কথা ভুলে সর্বক্ষণ নীচ জাতীয় লোক ও মেয়েদের সাথে নোংরা আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকতেন আর দিন-রাত নিজেদের মধ্যে বিশ্রী ঝগড়াঝাটি করতেন।

ভোজবংশীয় প্রধান সাত্যকি একদিন মাতাল অবস্থায় কৃতবর্মাকে বললেন, 'তুমি অশ্বত্থামার সাথে মিলে ঘুমন্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের হত্যা করেছিলে, তার জন্য একদিন যাদবেরা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।'

কৃতবর্মাও ভীষণ রেগে সাত্যকিকে আজেবাজে কথা বলে অপমান করলেন।

দেখতে দেখতে ঝগড়া ভীষণ রূপ নিলো। সাত্যকি খড়্গের আঘাতে কৃতবর্মাকে হত্যা করলেন এবং সামনে যাকেই পেলেন সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলেন।

সাত্যকির এই পাগলের মত কাণ্ড দেখে ভোজ ও অন্ধকেরা হাতের কাছে যা পেলেন তাই দিয়ে তাঁকে মারতে লাগলেন।

কৃষ্ণের ছেলে প্রদ্যুম্ন সাত্যকিকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলেন। ছেলেকে নিহত হতে দেখে কৃষ্ণ মাটি থেকে একমুঠো ছন ঘাস তুলে নিলেন এবং সেগুলো চোখের নিমেষে ভয়ংকর মুষলে পরিণত হলো। কৃষ্ণ সেই মুষলের আঘাতে সামনে যাকে পেলেন তাকেই বধ কর-

লেন। অলৌকিক ভাবে সেই মাঠের সমস্ত তৃণই মুষল হয়ে গেলো, সেগুলো দিয়ে যাদবেরা পাগলের মত একে অন্যকে হত্যা করতে লাগলেন। মাতাল ছেলে বাবাকে, মাতাল ভাই ভাইকে মেরে শেষ করলেন। কৃষ্ণের চোখের সামনে প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ গদ ইত্যাদি যাদব বীরেরা নিহত হলেন।

সারথি দারুক ও বভ্রু হাত জোড় করে বললেন, 'ভগবান এবার চলুন বলরামের কাছে যাই। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

বলরাম ও কৃষ্ণের মৃত্যু

কৃষ্ণ দেখলেন বলরাম এক নির্জন জায়গায় গাছের তলে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি দারুককে বললেন, 'তুমি এক্ষুনি হস্তিনাপুরে গিয়ে দ্বারকার সমস্ত ঘটনা পাণ্ডবদের জানাও এবং অর্জুনকে এখানে নিয়ে এসো।'

বভ্রুকে কৃষ্ণ নির্দেশ দিলেন নগরীতে গিয়ে মেয়েদের ও শিশুদের রক্ষা করতে। বভ্রু যাত্রা করার মুহূর্তেই এক ব্যাধের হাতে নিহত হলেন। তখন কৃষ্ণ বলরামের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন, আমি মেয়েদের ও শিশুদের রক্ষার ব্যবস্থা করে আসছি।'

নগরীতে গিয়ে কৃষ্ণ তাঁর পিতা বাসুদেবকে বললেন, ধনঞ্জয় না আসা পর্যন্ত আপনি নারীদের ও শিশুদের রক্ষা করবেন। বনে বলরাম অপেক্ষা করছেন, আমি তাঁর সাথে তপস্যায় জীবন কাটাবো।

প্রভাসতীর্থে যে নরহত্যা আমি দেখেছি তাতে জীবনে আমার কোন আকর্ষণ নেই।'

বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন বলরাম স্থির হয়ে বসে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটি দুধশাদা সহস্র ফণা রক্তমুখ মহানাগ বের হয়ে সাগরে প্রবেশ করছেন এবং সাগর, নদী, চাঁদ, সূর্য, পাতালরাজ বাসুকী সহ সমস্ত নাগেরা এই মহানাগের স্তব গান গাইছেন।

বলরামের মৃত্যুর এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে কৃষ্ণ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাটিতে বসে গান্ধারীর অভিশাপের কথা স্মরণ করলেন।

বাসুদেব অনুভব করলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় হয়ে এসেছে। তিনি মাটিতে শুয়ে ধ্যানস্থ হলেন। দূর থেকে তাঁকে হরিণ মনে করে এক ব্যাধ তীর ছুঁড়লে সেই তীর তাঁর নীলপদ্মের মত পায়ের তলায় বিঁধে গেলো। ব্যাধ কাছে এসে হলুদ রং কাপড় পরা কৃষ্ণকে চিনতে পেরে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো। কৃষ্ণ হাসি মুখে ব্যাধকে ক্ষমা করলেন।

তারপর মাধব তাঁর সুনীল সাগরের মত, নীল বিদ্যুতের মত রূপের আলোয় আকাশকে অপরূপ করে মহাশূন্যে চলে গেলেন।

স্বর্গলোক ও ইন্দ্রলোক এই মহাঈশ্বরের বন্দনা গাইতে লাগলো। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে মহা আনন্দে স্বাগত জানালেন।

অর্জুনের দ্বারকায় গমন

দারুকের সাথে দ্বারকায় এসে অর্জুন বসুদেবের সাথে দেখা করলেন। বৃদ্ধ রাজা বসুদেব অর্জুনকে বললেন, 'কৃষ্ণ আমাকে বলে গিয়েছেন, অর্জুন এসে শিশু ও নারীদের ভার নেবেন এবং আমাদের সবার পারলৌকিক কাজ করবেন। তিনি দ্বারকা থেকে চলে যাবার সাথে সাথে এই নগরী সমুদ্রের জলে তলিয়ে যাবে।'

অর্জুন বললেন, 'মামা আমি ও কৃষ্ণ দুই দেহে এক প্রাণ। কৃষ্ণকে ছাড়া আমি বেঁচে থাকার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। ওদিকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁর মৃত্যুর সময় এসেছে বলে মনে করছেন। আমি দ্বারকায় থাকতে পারবো না। এখানকার নারী ও শিশুদের নিয়ে আমি ইন্দ্রপ্রস্থে যাবো, সেখানেই তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেবো।'

অর্জুনকে দেখে কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী, দ্বারকার মেয়ে ও শিশুরা কাঁদতে লাগলো। তিনি তাদের সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা খুঁজে পেলেন না।

পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণের পিতা বসুদেব মারা গেলেন। তাঁর স্ত্রী দেবকী, ভদ্রা, মদিরা ও রোহিনী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিলেন। অর্জুন সকলের শ্রাদ্ধ ও তর্পন করলেন, কৃষ্ণ ও বলরামের দেহ তুলে এনে সংকার করলেন।

এক সপ্তাহ পর অর্জুন কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী, নাতি, বজ্র, বহু

নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিয়ে যাত্রা করলেন। তিনি দ্বারকা ছেড়ে চলে যাবার সাথে সাথে সমুদ্র দ্বারকাকে গ্রাস করে নিলো।

কিছুদিন চলার পর তাঁরা পঞ্চনদের কাছে এক শস্য সবুজ দেশে এলেন। সেখানে আভীর জাতির দস্যুরা তাঁদের আক্রমণ করে মেয়েদের ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলো।

অর্জুন ভীষণ হুংকারে তাদের সাবধান করে দিয়ে ধনুকে শর লাগাতে গেলেন কিন্তু গাণ্ডীব ধনু যেন তাঁর কাছে ভীষণ ভারী বলে মনে হলো, তিনি কোন রকম দিব্যাস্ত্রের কথাও মনে করতে পারলেন না। তাঁর সাথের সৈন্যেরাও মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। ম্লেচ্ছ দস্যুরা অবাধে লুঠতরাজ করে অনেক মেয়েকে ধরে নিয়ে চলে গেলো।

অর্জুন নিজের ভাগ্যের খেলা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং অবশিষ্ট নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। তারপর সবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে বাস করবার সুবন্দোবস্ত করলেন এবং কৃষ্ণের নাতি বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপদ দিলেন।

কৃষ্ণের পিতৃব্য (কাকা) অক্রূরের স্ত্রীরা সন্ন্যাস ধর্ম নিলেন। কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিনী, শৈব্যা, হৈমবতী ও জাম্ববতী আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। সত্যভামা ও অন্যান্য পত্নীরা হিমালয়ের ওপারে কলাপ গ্রামে গিয়ে তপস্যায় জীবন কাটাতে লাগলেন।

অর্জুন সমস্ত দায়িত্ব শেষ করে ব্যাসের আশ্রমে এলেন। ব্যাসদেব তাঁকে দেখে বললেন, 'ধনঞ্জয় তোমার এ অবস্থা কেন? মনে হচ্ছে তুমি সর্বহারা হয়েছো অথবা ভীষণ কোন পাপ করে সেজন্য অনুতাপে পুড়ে মরছো?'

অর্জুন ব্যাসদেবের কাছে দ্বারকার সমস্ত ঘটনা, কৃষ্ণ ও বলরামের

মৃত্যু, দস্যুদের হাতে তাঁর পরাজয়ের বর্ণনা দিলেন। তারপর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'প্রভু, সেই শ্যামল দূর্বাদলের মত অপরূপ পুরুষ কৃষ্ণকে না দেখে আমি কি করে বাঁচবো? আপনি বলে দিন এখন আমার কি কর্তব্য?'

ব্যাসদেব বললেন, 'পার্থ, কৃষ্ণ জানতেন এই-ই হবে তাঁদের পরিণতি। তাই নীরব থেকে তিনি ভাগ্যের খেলা দেখেছেন। তারপর এই পৃথিবীর সব পাপ ও গ্লানি পেছনে ফেলে নিজের জায়গায় চলে গেছেন। তাঁর জন্য তুমি শোক কোর না। সব্যসাচী, তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের যা কর্তব্য ছিলো সবই তোমরা পালন করেছো। তোমাদেরও এখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় হয়েছে। তোমার আর শক্তি ব্যবহারের দরকার নেই বলেই তোমার অস্ত্ররা নিজের জায়গায় ফিরে গেছে।

ব্যাসদেবের উপদেশ বয়ে নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুরে এলেন এবং ভাইদের কাছে সব কথা বললেন।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব

মহাপ্রস্থানের পথে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী

াদবদের ধ্বংসের বর্ণনা শুনে ধর্মরাজ দুঃখিত হয়ে বললেন, 'কাল ! কালই নিয়তি হয়ে সবার চরম পরিণতি এনে দেয়। আমিও কালের ডাক শুনতে পাচ্ছি। তোমরা নিজেদের কর্তব্য ঠিক কর।'

ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই বললেন, 'ধর্মরাজ, আপনার পথই আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ পথ।'

দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের পথকেই বেছে নিলেন।

যুধিষ্ঠির বালক পরীক্ষিৎকে রাজপদে অভিষিক্ত করে যুযুৎসুর ওপর াজ্য চালাবার ভার দিলেন। তারপর অর্জুনের স্ত্রী ও অভিমন্যুর মা ৃভদ্রাকে বললেন, 'কল্যাণী তোমার নাতি কুরুরাজা হিসাবে এই াজসিংহাসনে থাকবেন। কৃপাচার্য পরীক্ষিৎকে যাবতীয় শিক্ষা দান রবেন। আর কৃষ্ণের নাতি বজ্রকে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপদ য়েছে। বজ্রই যাদবদের একমাত্র বংশধর হিসাবে যে সব যাদব নারী, দ্ধ এবং শিশুরা রয়েছে তাদের পালন করবেন। সুভদ্রা, তুমি এদের

সবার মা হয়ে রক্ষা করবে, তোমার ওপর সেই ভার দিয়ে আমরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করবো।'

তারপর যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের নিয়ে বসুদেব, কৃষ্ণ ও বলরামের শ্রাদ্ধ করলেন। সেই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে নারদ, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহামুনিরা এলেন। পাণ্ডবেরা তাঁদের উপযুক্ত পূজা দিলেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনরত্ন দান করে প্রজাদের কাছে মহাপ্রস্থানের ইচ্ছা জানালেন।

প্রজারা সেই কথা শুনে হাহাকার করতে লাগলেন এবং কেউ কেউ আকুল কান্নায় তাঁদের নিষেধ করতে লাগলেন। কিন্তু ধর্মরাজ ও পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের সংকল্প ত্যাগ করলেন না।

পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী তাঁদের রাজবেশ ও গহনাপত্র খুলে ফেলে গাছের বাকল পরলেন এবং যজ্ঞ করলেন। তারপর তাঁরা চিরদিনের জন্য ঘর সংসার, রাজ্য, সুখ, সম্পদ, আত্মীয় পরিজনকে পেছনে ফেলে যাত্রা করলেন।

তাঁরা চলে যাবার পর নাগকন্যা উলুপী গঙ্গায় নেমে গেলেন, চিত্রাঙ্গদা ফিরে গেলেন মনিপুর রাজ্যে। সুভদ্রা, উত্তরা ও অন্যসব পাণ্ডব বধুরা পরীক্ষিৎকে নিয়ে হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে রইলেন।

উপবাসে ক্লান্ত শরীরে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী পূর্ব দিকে চলেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন একটি কুকুরও তাঁদের সাথে সাথে চলেছে। অর্জুন মায়ায় পড়ে তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও দুই অক্ষয় তূণ ফেলে আসতে পারেননি বলে সেগুলো বয়ে নিয়ে চলেছেন। লৌহিত্য সাগরের তীরে উপস্থিত হলে অগ্নিদেব তাঁদের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অর্জুন শোন, খাণ্ডব দাহন ও ভারত যুদ্ধের জন্যই আমি বরুণের কাছ থেকে তোমাকে এই গাণ্ডীব ধনু ও তূণ এনে দিয়েছিলাম।

তোমার আর এসবে দরকার নেই, তুমি বরুণকে তাঁর ধনু ও তূণ ফিরিয়ে দাও। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রও চলে গেছে। ঠিক সময়ে তিনি আবার তা ফিরে পাবেন, তুমিও ঠিক সময়ে তোমার দিব্যাস্ত্রগুলো ফিরে পাবে।

অগ্নিদেবের কথা শুনে অর্জুন গাণ্ডীব ধনু ও দুই অক্ষয় তূণ সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন, অগ্নিদেবও মিলিয়ে গেলেন।

পাণ্ডবেরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার ইচ্ছায় প্রথমে দক্ষিণ দিকে চললেন। তারপর লবণ সমুদ্রের তীর ধরে পশ্চিমে এলেন এবং সাগরে ডোবা দ্বারকাপুরী হয়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে উত্তরে যাত্রা করলেন।

দ্রৌপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু

পাণ্ডবেরা হিমালয় পার হয়ে ধ্যানের মধ্যে পথ চলতে লাগলেন। যেতে যেতে হঠাৎ দ্রৌপদী ধ্যান ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'কৃষ্ণা তো ছিলেন লক্ষ্মী স্বরূপা ও পবিত্র, তিনি কেন মাটিতে পড়ে মারা গেলেন?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'কৃষ্ণা আমাদের পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে অর্জুনকেই ইনি সবচেয়ে বেশী ভাল বাসতেন, এখন তারই ফল পেয়েছেন।'

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর দিকে নজর না দিয়ে নির্বিকার ভাবে চলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর সহদেব মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। ভীম বললেন, আমাদের এই ভাই বড় সরল আর সেবা পরায়ণ ছিলেন, তবে কেন এঁর এই দশা হলো ?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'সহদেব মনে মনে নিজেকে সবচেয়ে জ্ঞানী বলে মনে করতেন, সেজন্য এঁর চাপা অহংকার ছিলো।'

যুধিষ্ঠির আবার চলতে লাগলেন। হঠাৎ নকুল ধ্যান ভেঙ্গে পড়ে গেলেন।

ভীম বললেন, 'নকুল আমাদের সবচেয়ে অনুগত ভাই, তিনি গুরুজনকে মান্য করতেন, তাঁর রূপও দেবতার মতো। তাকে কেন এভাবে মরতে হলো ?'

যুধিষ্ঠির চলতে চলতে বললেন, 'তাঁর চরিত্রে একটি দোষই ছিলো তা হচ্ছে তাঁর রূপের জন্য অহংকার।'

দ্রৌপদী ও নকুল সহদেবের পরিণাম দেখে অর্জুন শোকে মগ্ন হয়ে পথ চলছিলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। পাণ্ডব ব্যাঘ্র সব্যসাচীকে এমন অসহায় ভাবে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভীম অবাক হয়ে বললেন, অর্জুন ছিলেন শ্বেত পদ্মের মত নির্মল চরিত্রের, তাঁকে কেন এভাবে মরতে হলো ?

যুধিষ্ঠির পলকের জন্য অর্জুনকে দেখে চলতে চলতে বললেন, 'অর্জুন শক্তির গর্ব করতেন, তিনি স্পর্ধার সাথে অন্য ধনুর্ধরকে ছোট চোখে দেখতেন, কোন মহান পুরুষের এমন করা অনুচিত।'

এরপর ভীম পড়ে গেলেন এবং কাতর হয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ, আমি আপনার চিরদিন সেবা করেছি ও আপনার বড় প্রিয় ছিলাম, আমার কেন এই অবস্থা হলো ?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'বৃকোদর, তুমি অন্যের কথা চিন্তা না করে

নিজেই সব খাবার খেয়ে ফেলতে এবং সব সময় নিজের শক্তি নিয়ে অহংকার করতে. এজন্যই তোমার পতন হয়েছে।'

যুধিষ্ঠির ভীমকে পেছনে ফেলে ধ্যানমগ্ন হয়ে চলতে লাগলেন। কুকুটিরও তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গ যাত্রা

হঠাৎ আকাশে অপরূপ আলোর বন্যা বয়ে গেলো। স্বর্গীয় সুরের ঝংকারে বাতাস কাঁপিয়ে ইন্দ্রদেব রথ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'ধর্মরাজ, এই রথে উঠুন।'

যুধিষ্ঠির শোকার্ত হয়ে বললেন, 'দেবরাজ, আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাইরা এবং লক্ষ্মী স্বরূপা স্ত্রী দ্রৌপদী পথে পড়ে আছেন, আমি তাঁদের ফেলে কি করে যাবো? আপনি তাঁদেরও নিয়ে চলুন।'

ইন্দ্র বললেন, 'ভরত শ্রেষ্ঠ, শোক কোর না, তাঁরা দেহত্যাগ করে আগেই স্বর্গে চলে গেছেন। তুমি সশরীরে স্বর্গে গিয়ে সেখানে তাঁদের দেখতে পাবে। কিন্তু তোমার সাথে এই কুকুর কেন?'

যুধিষ্ঠির বললেন, এই কুকুর আমার প্রিয় ভক্ত, আমি একেও স্বর্গে নিয়ে যেতে চাই।

ইন্দ্র বললেন, তা হয় না, কুকুর নিয়ে কেউ স্বর্গে যেতে পারে না, কুকুর অপবিত্র। তুমি প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাইদের ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে নিজের কর্মের ফলে স্বর্গলোক লাভ করেছো, আমার সমান অমরত্ব, ঐশ্বর্য ও সিদ্ধিলাভ করেছো, এখন এই কুকুরকে কেন ত্যাগ

করতে পারছো না ?

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মহেন্দ্র, ভক্তকে ত্যাগ করলে ব্রাহ্মণ হত্যা, নারী হত্যা ও বন্ধু হত্যার সমান পাপ হয়। আমি স্বর্গ ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু এই ভক্তকে ত্যাগ করতে পারবো না। তাছাড়া আমার ভাইদের ও স্ত্রীকে আমি মৃত অবস্থায় ত্যাগ করেছি। তাঁরা বেঁচে থাকলে কখনই ত্যাগ করতাম না।'

তখন কুকুর রূপী ভগবান ধর্ম নিজের রূপ ধারণ করে বললেন, 'যুধিষ্ঠির তুমি প্রকৃত ধর্মপুত্রের স্বভাব পেয়েছো। একবার দ্বৈতবনে আমি তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম। তুমি সেখানেও ভীম অর্জুনের বদলে নকুলের জীবন চেয়েছিলে যাতে তোমার মা কুন্তীর মত বিমাতা মাদ্রীরও একটি ছেলে বেঁচে থাকে। পুত্র, স্বর্গেও তোমার সাথে তুলনা করা যায় এমন কেউ নেই, কারণ ভক্ত কুকুরের জন্য তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের রথকে ত্যাগ করতে চেয়েছো। ভরত শ্রেষ্ঠ, তুমি সশরীরে স্বর্গে গিয়ে প্রমাণ করবে তোমার তুল্য সত্যিই কেউ নেই। কারণ এর আগে কেউ সশরীরে স্বর্গে যায়নি।'

তারপর ধর্ম ও ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে দিব্যরথে তুলে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। দেবর্ষি নারদ মহাআনন্দে ঘোষণা করলেন, 'যে রাজর্ষিরা এই স্বর্গে আছেন, তাঁদের সকলের কীর্তিকে যুধিষ্ঠির ম্লান করে দিয়েছেন। এর আগে কেউ সশীরে স্বর্গে আসবার গৌরব বা পুণ্য অর্জন করতে পারেননি।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'দেবরাজ, আমি এখানে থাকতে চাই না, যেখানে আমার ভাইরা আছেন আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।'

ইন্দ্র বললেন, 'রাজা তুমি তোমার পুণ্যের ফলে এখানে এসেছো, কিন্তু তোমার ভাইরা এখানে আসবার অধিকার পাননি। এ শুধু

দেবর্ষি ও মহর্ষিদের জায়গা।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'দেবরাজ, ভালো মন্দ যাই হোক, যেখানে আমার ভাইরা আছেন, আমার গুণবতী স্ত্রী আছেন, আমি সেখানেই যেতে চাই। স্বর্গের এই সুখ, এই পবিত্র আলো আর পারিজাত ফুলের সুবাস কোনটাই আমার ভালো লাগবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাঁদের কাছে পাবো।'

ইন্দ্র বললেন, 'সেজন্য যদি আপনাকে কোন ভীষণ কষ্টে পড়তে হয় তা সহ্য করতে রাজী আছেন?'

যুধিষ্ঠির জানালেন, তিনি তাঁর প্রিয়জনদের নিয়ে আগুনের কুণ্ডে থাকলেও সুখে থাকবেন।

স্বর্গারোহণ পর্ব

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন

যুধিষ্ঠির অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, সূর্যের মত জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে দুর্যোধন স্বর্গের এক সুন্দর জায়গায় দেবতাদের সঙ্গে বসে রয়েছেন।

ধর্মরাজ ভীষণ রেগে বললেন, 'হোক স্বর্গ অথবা দেবলোক, আমি পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের সঙ্গে বাস করবো না।'

নারদ হাসিমুখে বললেন, 'মহারাজ, এমন কথা বলো না। স্বর্গে শত্রু মিত্রের মধ্যে কোন ভেদ নেই। এখানে দুর্যোধন মহা সম্মানিত পুরুষ। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করে বীরের মরণ লাভ করেছেন, তিনি প্রজাদের জন্য আদর্শ রাজা ছিলেন। ধর্মপুত্র, তুমি আগের কথা ভুলে একে ভাই বলে ভালোবাসার সাথে গ্রহণ কর।'

যুধিষ্ঠির বললেন, দেবর্ষি, যার জন্য পৃথিবী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কোটি কোটি সৈন্য ও রাজাদের রক্তে পৃথিবীতে প্লাবন বয়ে গেছে, সেই পাপী দুর্যোধনের যদি এই সুখ স্বর্গে বাস হয় তাহলে আমার ধর্মপ্রাণ ভাইরা কোথায়? বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু এঁরা

কোথায় স্থান পেয়েছেন? তাঁরা যদি এখানে না থাকেন, আমিও থাকবো না। আমার প্রিয়জনেরা যেখানে আছেন সেখানেই আমার স্বর্গ।'

দেবতারা এক দেবদূতকে আদেশ দিলেন, 'যুধিষ্ঠিরকে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাছে নিয়ে যাও।'

দেবদূত এক ভয়ংকর পথ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে চললো। সেই পথ অন্ধকার, দুর্গন্ধময়, চারদিকে পাপীদের দেহের নানা অংশ পচে গলে বিকট অবস্থা হয়েছে, ভীষণ চেহারার সব হিংস্র পশুপাখি ও পিশাচেরা গলিত মৃতদেহ নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে। চারদিকে আগুন লকলক করছে, নদীর বুকে গরম জল ফুটছে ও সেই জল থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। চারদিক থেকে পাপীদের কান্না ও যন্ত্রণার চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

যুধিষ্ঠির বললেন, 'এই পথ দিয়ে আমাকে আর কতদূর যেতে হবে? আমার ভাইরা কোথায়? এখানে আমার অসহ্য লাগছে।'

তাঁর কথা শুনে কারা যেন করুণস্বরে বলে উঠলো, 'হে ধর্মপুত্র, দয়া করে আর একটুক্ষণ এখানে থাকুন। আপনি আসাতে এখানে সুগন্ধ ও পবিত্র বাতাস বইছে, আপনাকে দেখে আমাদের যন্ত্রণা মুছে গেছে।'

যুধিষ্ঠির এই করুণ অনুরোধ শুনে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কে? কেন এখানে আছেন?'

অমনি চারদিক থেকে উত্তর এলো, 'আমি কর্ণ, আমি ভীম, আমি অর্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি অভিমন্যু, আমি দ্রৌপদী, আমরা দ্রৌপদী পুত্র।'

যুধিষ্ঠির শিউরে উঠলেন। একি মায়া না নিয়তি! কোন পাপের

ফলে আমার পুণ্যবান সুহৃদেরা এই ভয়ংকর জায়গায় যন্ত্রণা ভোগ করছেন? তিনি দুঃখে অধীর হলেন এবং কঠোর ভাষায় দেবদূতকে বললেন, 'তোমার দেবতাদের গিয়ে বলো, আমি এখানেই থাকতে চাই। আমার দুঃখী ভাইরা আমাকে পেয়ে সুখী হয়েছেন, এতেই আমার সুখ, এতেই আমি স্বর্গ পেয়েছি।'

দেবদূত ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে যুধিষ্ঠিরের কথা জানালেন। কিছুক্ষণ পরই দেবরাজ ইন্দ্র, দেবতারা ও ধর্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। সংগে সংগে সব অন্ধকার আলোর বন্যায় ধুয়ে গেলো। নরকের ভয়াবহ দৃশ্য মুছে গিয়ে চারদিক সুন্দর হয়ে উঠলো, সুবাসিত বাতাস বইতে লাগলো।

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, 'ধর্মরাজ রাগ কোর না। সব রাজাকেই নরক দেখতে হয়। তুমি দ্রোণকে অশ্বত্থামার মৃত্যু হয়েছে বলে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে যে পাপ করেছিলে সেজন্য তোমাকে ছলনা করে নরকের দৃশ্য ও তোমার আত্মীয়দের নরক যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়ে কষ্ট দিয়েছি। আসলে এ সবই মায়ার খেলা। তোমার আত্মীয়েরা সবাই স্বর্গে সুখ ও সম্মানের সাথে রয়েছেন। তুমি পৃথিবীতে বহু দুঃখ কষ্ট পেয়েও চির ধৈর্যশীল ছিলে। এখন সব দুঃখ ভুলে আমার সাথে স্বর্গের পবিত্র আনন্দে বাস কর।'

ধর্ম বললেন, 'পুত্র, তোমাকে এই নিয়ে আমি তিনবার পরীক্ষা করে দেখলাম তোমাকে আদর্শ থেকে নড়ানোর শক্তি কোন দেবতা অথবা মানুষের নেই। তোমরা কেউই নরকবাসের যোগ্য নও। এতক্ষণ যা দেখলে সবই ইন্দ্রের ছলনা।'

এরপর যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গায় স্নান করে মানুষের দেহ ত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করলেন। তারপর যেখানে তাঁর ভাইরা, দ্রৌপদী

ও ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা রয়েছেন সেখানে গিয়ে দেখলেন সকলে সবাই রাগ, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষ ভুলে পবিত্র আনন্দে ডুবে রয়েছেন।

পরম সুখের সাথে যুধিষ্ঠির দেখলেন, গোবিন্দ তাঁর রূপের আলোয় উজ্জ্বল নীলকমলের মত বসে আছেন, অর্জুন তাঁর সেবা করছেন। তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে দেখে অভিবাদন করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির দেখলেন বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ সূর্যের মত দীপ্তি নিয়ে দেবতাদের সাথে বসে, ভীমসেন, নকুল, সহদেবও তাঁর সাথে আনন্দে রয়েছেন।

ইন্দ্রের সাথে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে যুধিষ্ঠির পদ্মফুলের সুবাস পেলেন। দেখলেন শ্বেতপদ্মের মালায় সেজে দ্রৌপদী তাঁর দিকে চেয়ে মধুর হাসছেন।

ইন্দ্র বললেন, 'এই যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণা, ইনি যজ্ঞের আগুন থেকে সৃষ্টি লক্ষ্মী দেবী। মহাদেব এঁকে তোমাদের জীবনে সুখ শান্তি এনে দেবার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। আর এই পাঁচজন গন্ধর্ব এঁরা তোমাদের ছেলে হিসেবে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্মেছিলেন।

আর এই যে গন্ধর্বরাজ ইনিই অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র। সামনে এই তারার মত উজ্জ্বল আলো নিয়ে যে দেবতারা রয়েছেন এঁরা অভিমন্যু, সাত্যকি এবং তোমাদের বীর যোদ্ধাদল। রাজা এই দেখো, তোমাদের পিতা পাণ্ডু এবং মা কুন্তী ও মাদ্রী, আর তোর দেবতা শ্রেষ্ঠ বসুদের মধ্যে ভীষ্ম এবং দেবগুরু বৃহস্পতির পাশে রয়েছেন তোমাদের আচার্য দ্রোণ।'

যুধিষ্ঠির তাঁর সমস্ত প্রিয়জনদের স্বর্গের মনোরম পরিবেশে দেখে সুখে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ইন্দ্রের সাথে বাস করতে লাগলেন।

মহাভারত মাহাত্ম্য

মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের কাছে পরীক্ষিতের ছেলে রাজা জনমেজয় প্রতিদিন মহাভারতের পুণ্য কথা শুনতেন।

স্বর্গারোহণ পর্ব শোনার পর জনমেজয় বৈশম্পায়নকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'প্রভু, আপনি যে মহৎপাণ্ডব পুরুষদের কথা বললেন তাঁরা কতকাল স্বর্গে বাস করেছিলেন?'

বৈশম্পায়ন বললেন, 'আমি সর্বজ্ঞানী ব্যাসদেবের কাছে শুনেছি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃতবর্মা, ধৃতরাষ্ট্র স্বর্গের কুবেরলোকে, পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রী ইন্দ্রলোকে এবং অভিমন্যু চন্দ্রলোকে অনন্ত কাল রয়েছেন। বাসুদেব কৃষ্ণ নারায়ণের সাথে মিশে গেছেন। তাঁর ষোল হাজার স্ত্রী অপ্সরা হয়ে তাঁর সেবা করছেন। ঘটোৎকচ দেবলোকে আছেন।'

রাজা জনমেজয় তক্ষশিলায় এক মহাযজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞ যতদিন চলেছিলো ততদিন পর্যন্ত তিনি বৈশম্পায়নের কাছে মহাভারতের অমৃত কথা শুনতেন। যজ্ঞ শেষ হবার পর জনমেজয় ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনরত্ন দক্ষিণা দিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন।

মহাভারতের মাহাত্ম্য এমনই যে এই ইতিহাস যিনি অন্যকে পড়ে শোনান তিনি পাপ থেকে মুক্ত হন, যিনি শোনেন তিনিও পাপ মুক্ত হন। যিনি পিতামাতার শ্রাদ্ধের সময় এর কিছু অংশও ব্রাহ্মণদের পড়ে শোনান তাঁর পিতামাতা স্বর্গলাভ করেন।

অষ্টাদশ বা আঠারো পর্বে গাঁথা এই ভারত কথায় ভরতবংশীয়দের

মহৎ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে এবং মহত্ত্ব ও গৌরবের জন্য এই বলা হয় মহাভারত।

হিন্দু পুরান রচয়িতা এবং বেদ সাহিত্যের সমুদ্রে যিনি রাজ সেই মহাঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই মহাভারত।

মহাভারত রচনা করতে ব্যাসের সময় লেগেছিলো তিন বছর। মহাভারতে যে ঘটনা ও বর্ণনা আছে তা অন্য গ্রন্থে থাকতে পারে, কিন্তু যা এতে নেই তা কোথাও থাকা সম্ভব নয়। এই ইতিহাসের অন্য নাম 'জয়' কারণ কোন জয়লাভের কামনায় যদি এই গ্রন্থ কেউ পড়েন অথবা এর পাঠ শোনেন তাতে তাঁর জয় হবেই।

যাঁর ঘরে পবিত্র মহাভারত থাকে জীবনে তাঁর পরাজয় ঘটে না। সূর্যের আলোকছটায় যেমন অন্ধকার দূর হয়ে যায় তেমনি মহাভারতের অমৃত কথা শুনলে কিংবা পড়লে দেহ ও মনের সমস্ত পাপের কালিমা দূর হয়, জীবন পবিত্র আলোকের ঝরণাধারায় ধুয়ে নির্মল ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিশোর ক্লাসিক-২৬

কিশোরদের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

কিশোর মহাভারত

মকবুলা মনজুর